পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী

"পরিচয়ের" আদর্শ প্রথম সংখ্যার মুখপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রাবণ হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে "পরিচয়" বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সডাক ৪।০, প্রতি সংখ্যা ১৷৵, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"পরিচয়ে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার।

প্রাপ্ত রচনা প্রকাশের, বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

ঠিকানা ও ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপন পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার "পরিচয়",
রুম নং ১৭, ষ্টিফেন হাউস,
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৩৯

পরিচয়

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ

২

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদের আলোচনা করিতেছিলাম। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছিলাম যে, পরমাত্মা (ব্রহ্ম) অংশী—আর প্রত্যগাত্মা (Monad) তাঁহার অংশ—পরমাত্মা চিদাকাশ, প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩

এই অংশ (চিৎকণ প্রত্যগাত্মা) চিদ্‌ঘন পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যাবহারিক ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য দহরকোশরূপ 'হৃদ্যাকাশময়' দেহ গ্রহণ করতঃ 'দেহী' হন।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ—শ্বেত, ৩।১৮
দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা, হংসঃ পরমাত্মা লেলায়তে চলতি বহিঃ বিষয়গ্রহণায়
—শঙ্কর

আমরা আরও দেখিয়াছিলাম, চিন্মাত্র 'দেহী' জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ ব্যঞ্জিত করিবার জন্য ত্রিবিধ শরীর গ্রহণ করেন। তখন (বেদান্ত-পরিভাষায়) তাঁহার নাম হয়—প্রাজ্ঞ আত্মা, তৈজস আত্মা ও শারীর আত্মা। স্থূলভুক্ স্থূল-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'শারীর', সূক্ষ্মভুক্ সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'তৈজস', এবং আনন্দভুক্ কারণশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'প্রাজ্ঞ'।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

অতএব এ সম্পর্কে শরীরই মূলাধার।

মৃত্যু ও উৎক্রান্তি

'শরীর' অর্থে যাহা শীর্ণ হয়, জীর্ণ হয়। শরীর জীর্ণ হইলে জীব কি করে? বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় (গীতা)—জীর্ণ বাসের মত সেই জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে। এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

স যত্রায়ম্ অণিমানং ন্যেতি জরয়া বা উপতপতা বা অণিমানং নিগচ্ছতি, তদ্ যথা আম্রং বা উদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে, এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ
—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'এই শরীর যখন জরাবশতঃ শীর্ণ হয় বা ব্যাধি জন্য জীর্ণ হয়, তখন (পক্ক) আম্র বা ডুমুর বা অশ্বত্থ ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ (জীব) এই সমুদায় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হয়' এবং 'ভারাক্রান্ত শকট যেমন সশব্দে গমন করে, তেমনি "শারীর আত্মা" উর্দ্ধশ্বাসী হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করে।'

তদ্ যথা অনঃ সুসমাহিতম্ উৎসর্জৎ যায়াৎ, এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন যাতি, যত্রৈতদ্ উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩৫

ইহাকেই বলে মৃত্যু।—কিন্তু দেহই মরে, দেহী (জীব) মরে না—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে। All of me does not die.

জীব দেহ ছাড়িয়া গেলে, জীবাপেত শরীর স্ফীত হইয়া, আধ্মাত (inflated) হইয়া, সাপের খোলসের মত পড়িয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়,

স উচ্ছ্বয়তি আধ্মায়তি আধ্মাতো মৃতঃ শেতে—বৃহ, ২।৩।১১

তদ্ যথা অহি-নির্ব্বয়নী (সর্প-নির্মোক) বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবমেব ইদং শরীরং শেতে—বৃহ, ৪।৪।৭

কিন্তু জীব ? অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব (বৃহ, ৪।৪।৭)—সে যে অমৃত, সে প্রাণ, সে ব্রহ্ম, সে তেজঃ—সে তো শরীর নহে !

মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়শক্তির কি অবস্থা ঘটে ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, তাহারা এতদিন বহির্মুখ ছিল, এখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ হয়—স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে (বৃহ ৪।৪।১)।

'তখন আত্মা যেন সংমোহ প্রাপ্ত হয় এবং এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়শক্তি) তাহার অভিমুখে সমাগত হইয়া হৃদয়ে সম্ভৃত হয়।'

স যত্রায়ম্ আত্মা অবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেতি, অথ এনম্ ইমে প্রাণা অভিসমায়ন্তি। স এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেব অন্ববক্রামতি—বৃহ, ৪।৪।১ *

সুতরাং তখন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়া যায়।

একীভবতি ন পশ্যতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন রসয়তে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বদতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন শৃণোতি ইত্যাহুঃ,

* আর্ত্তভাগের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই বলিয়াছেন—যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উৎ অস্মাৎ প্রাণা ক্রামন্তি আহো নেতি ? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—বৃহ, ৩।২।১১। কারণ, প্রাণ-সমূহ যখন পুরুষে সমবেত হয়, তখন তাহাদের স্বতন্ত্র উৎক্রমণ হইবে কিরূপে ?

একীভবতি ন মনুতে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন স্পৃশতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বিজানাতি ইত্যাহুঃ—বৃহ, ৪।৪।২

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মার সহিত একীভূত হওয়ায়, দর্শন শ্রবণ স্পর্শন বচন স্বাদন ঘ্রাণন মনন বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার স্থগিত হইয়া যায়।

কৌষীতকী-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,

যত্রৈতৎ পুরুষ আর্ত্তো মরিষ্যন্ অবল্যং ন্যেত্য মোহং ন্যেতি, তদাহুঃ উদক্রমীৎ চিত্তং, ন পশ্যতি, ন শৃণোতি, ন বাচা বদতি। অথাস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি ; তদা এনং বাক্ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি ইত্যাদি—৩।৩-৪

এ ঘটনা আমাদের সুপরিচিত, কারণ প্রতি রাত্রে নিদ্রাকালে এইরূপই ঘটে ; তখনও সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মায় উপসংহৃত হয়।

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তঃ অভূৎ, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় * * তানি যদা গৃহ্লাতি অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম। তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি, গৃহীতা বাক্, গৃহীতং চক্ষুঃ, গৃহীতং শ্রোত্রং, গৃহীতং মনঃ—বৃহ, ২।১।১৭

অর্থাৎ নিদ্রার সময়, বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞান দ্বারা প্রাণ-সমূহের বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। তখন ঘ্রাণ গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, মনঃ গৃহীত হয়।

ছান্দোগ্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,

স যদা স্বপিতি, প্রাণমেব বাক্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ ; প্রাণো হ্যেব এতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্ক্তে—৪।৩।৩

ইহা সুপ্তির বর্ণনা। জাগ্রত হইলে কি হয় ?

স যদা প্রতিবুধ্যতে অস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিতিষ্ঠন্তে
—কৌষীতকী, ৩।৩

—'তখন ইন্দ্রিয়-শক্তিসকল স্ব-স্ব আয়তনে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়'। বৃহদারণ্যক এই কথাই বলিয়াছেন—অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা ব্যুচ্চরন্তি—২।১।২০

কিন্তু আমরা মৃত্যুর কথা বলিতেছিলাম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, রাজার প্রত্যাগমনের কালে সূত, গ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতি যেমন তাঁহার চৌদিকে সমবেত হয়, তেমনি অন্তকালে ইন্দ্রিয়শক্তি (প্রাণসমূহ) আত্মাতে সম্ভৃত হয়।

তদ্ যথা রাজানং প্রয়িযাসন্তম্ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ অভিসমায়ন্তি, এবমেব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩৮

তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত হয় এবং সেই দীপ্তিতে আত্মা শরীর হইতে চক্ষুঃদ্বারে, মূর্দ্ধাদ্বারে, বা অন্য দ্বারে উৎক্রমণ করেন। ইহাকেই বলে 'উৎক্রান্তি'।*

* স যাবৎ অস্মাৎ শরীরাৎ অনুৎক্রান্তো ভবতি, তাবৎ জানাতি—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৪

তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রমতি, চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৪।২

বলা বাহুল্য, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, দেহের নাশে দেহীর নাশ হয় না। উৎক্রান্ত জীবের সঙ্গে কি গমন করে? তম্ উৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি * * তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ—বৃহ, ৪।৪।২—'উৎক্রান্ত জীবের অনুগমন করে—তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি (যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশিত ছিল) আর বিদ্যা ও কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা'। পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থে ইহজন্মে সঞ্চিত সংস্কার বা 'বাসনা' (traces, vestiges) —বুদ্ধদেব যাহাকে 'সঙ্খার' বলিয়াছেন—অনেক জাতি সঙ্খারং (জন্মেজন্মে সঞ্চিত সংস্কার)। সাংখ্য মত ইহার অনুবর্ত্তী।

তথা অশেষসংস্কারাধারত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ২।৪২

ঐ অশেষ সংস্কারের আধার বলিয়াই জীবের চিত্ত Tabula Rasa নহে; উহা 'অসংখ্যেয় বাসনাভিঃ চিত্রম্ (যোগসূত্র, ৪।২৩)।

সংস্কার ছাড়া আর কি সঙ্গে যায়? বিদ্যা-কর্ম্মণী। বিদ্যা অর্থে ইহজন্মে উপার্জ্জিত জ্ঞান (Knowledge) আর কর্ম্ম—Work।

এই কর্ম্মের উপর যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষ 'ঝোক' দিয়াছেন। আর্ত্তভাগ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—মৃত পুরুষ কোথায় থাকে?—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন্ 'হে সোম্য! সজনে ইহা আলোচ্য নহে—উঠিয়া আইস, নির্জ্জনে আলাপ করিব।'

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াংচক্রাতে, তৌ হ যদ্ উচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদ্ উচতুঃ, অথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ—বৃহ, ৩।২।১৩

'তাঁহারা নিভৃতে যে আলাপ করিলেন, তাহা 'কর্ম্ম' সম্বন্ধে, তাঁহারা যাহার প্রশংসা করিলেন তাহা 'কর্ম্মের'ই।'

এ কর্ম্ম কেবল চেষ্টনা (Action) মাত্র নহে—ভাবনা (Thought), কামনা (Desire), ও চেষ্টনা (Action) সমস্তই। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন,

অথো খলু আহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদ্ অভিসম্পদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

'পুরুষকে "কামময়" বলে। সে যেমন কামনাযুক্ত হয়, সেইমত তাহার ভাবনা (ক্রতু) হয়; যেমন ভাবনাযুক্ত হয়, সে সেইমত কর্ম্ম করে। সে যেমন কর্ম্ম করে, তাহার অনুরূপ ফল পায়।'

কারণ, পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩ —'লোকে পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, এবং পাপ কর্ম্মের ফলে পাপী হয়।'

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যেপ্রকার কার্য্য করে, আচরণ করে, সে সেই প্রকার হয়; সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়; পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, পাপের ফলে পাপী হয়।'

সুকৃত দুষ্কৃতের ইহাই সাধারণ ফল—As you sow, so shall you reap।

জীবের পরলোকগতি

ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া জীব পরলোকে গমন করে; সেখানে 'আবসতে'র (environment) অনুযায়ী, তাহার নবতর কল্যাণতর রূপ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন,

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ 'যেমন জোঁক একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেইমত এই আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়া, অচেতন করাইয়া, অন্য দেহ গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেই মত এই আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্ব্বলোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী, কিম্বা অন্য লোকের উপযোগী শরীর।'

এই যে জীব উৎক্রান্তির পর উচ্চাবচ ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করতঃ সেই সেই লোকের উপযোগী রূপ গ্রহণ করে, সেই তারতম্যের হেতু কি? হেতু 'যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ (কঠ, ৫।৭)—যাহার যেমন কর্ম্ম, যাহার যেমন বিদ্যা।—এতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্ (কৌষী, ১।২)। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'বিদ্যাকর্ম্মণী পূর্ব্ব প্রজ্ঞাচ'। এই তরতম্যের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বৃহদারণ্যক অন্যত্র সাধারণভাবে বলিয়াছেন—কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া দেবলোকঃ। ইহারই উপর পিতৃযান ও দেবযানের ভেদ প্রতিষ্ঠিত (গীতা যাহাকে কৃষ্ণা ও শুক্লা গতি বলিয়াছেন এবং যাহার সবিশেষ বিবরণ বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে)। কিন্তু বর্ত্তমানে এ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, যাহার যেমন অধিকার, তাহার সেইরূপ গতি হয়। যে নিম্নলোকের অধিকারী—যাহাকে অধঃত্রিলোকী বলা

হয় (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) সে নিম্নলোকে যায়—আর যে উচ্চলোকের অধিকারী—যাহাকে ঊর্দ্ধত্রিলোকী বলা হয় (মহর্লোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক) সে উচ্চলোকে যায়। সেইজন্য কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ ও বিদ্যয়া দেবলোকঃ।—আর যিনি উচ্চতম অধিকারী—মুণ্ডক যাঁহাকে 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিয়ম—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্
তং তং লোকং জয়তে তান্ চ কামান্।—মুণ্ডক ৩।১।১০

জীবের জন্মান্তর

এই সকল লোকে জীবের স্থিতি কি চিরস্থায়ী? যাজ্ঞবল্ক্য Eternal Heaven বা Hell স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥—বৃহ, ৪।৪।৬

'ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ভোগ দ্বারা অন্ত বা অবসান হইলে, জীব পরলোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আসে—কর্ম্মণে—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য।' এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

এবমেবায়ং পুরুষঃ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য
পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি প্রাণায়—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'জীব এই দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া (পরলোকে ফলভোগের পর) বিলোম গতিতে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আইসে 'প্রাণায়'—নূতন প্রাণলাভ করিবার নিমিত্ত।' ছান্দোগ্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা (৫।১০।৫) অর্থাৎ জীবের তাবৎ পরলোকে স্থিতি, যাবৎ না কর্ম্মের ক্ষয় হয়—তার পর জন্মান্তর। কিন্তু (যাজ্ঞবল্ক্য বলেন) এ সমস্তই সকাম ব্যক্তির পক্ষে ইতি নু কাময়মানঃ (৪।৪।৬); পরন্তু যে নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম? ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ॥—বৃহ, ৪।৪।১২

যিনি পরমাত্মার সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোঽহং ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি কিসের ইচ্ছায় কোন কামনায় এই শরীরে সন্তপ্ত হইবেন?

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের শেষ কথা জীবের অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির বিবরণ। ঐ বিবরণ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ আরও

উজ্জ্বল হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এই তিন অবস্থাকে অন্ত বা স্থান বলিয়াছেন।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ—ইদং চ পরলোকস্থানং চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি ইদং চ পরলোকস্থানং চ—বৃহ, ৪।৩।৯

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি—কঠ, ২।৪

জীবের জাগ্রৎ অবস্থা

জীবের জাগ্রৎ অবস্থা আমাদের সুপরিচিত। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ইহাকে Brain Consciousness বলে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সহযোগে শব্দাদি স্থূল বিষয়ের উপভোগ হয়। 'সর্ব্বসার'-উপনিষদ্ ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

মন আদি চতুর্দ্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈঃ আদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদা উপলভতে তদ্ আত্মনো জাগরণম্। That is, 'when it enjoys the world of 'material' objects.' কৈবল্য উপনিষদের ভাষায়, স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা, শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রী-অন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি—১২। 'জীব মায়ামোহিত হইয়া শরীর গ্রহণ করতঃ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং জাগ্রৎ অবস্থায় স্ত্রী-অন্ন-পানাদি বিচিত্র ভোগ দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করে।'

এ অবস্থায় জীব 'প্রবুদ্ধ' থাকে—সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্যের পরিভাষায় ইহার নাম 'বুদ্ধান্ত'। স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩।১৭। মাণ্ডুক্য-উপনিষদ্ ইহাকে 'জাগরিত-স্থান' বলিয়াছেন। জাগরিত-স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ * * স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। জাগ্রৎ অবস্থায় জীবের সংজ্ঞা 'বৈশ্বানর', যেহেতু বিশ্ব নরের স্থূলভোগ অভিন্ন ('Perhaps because all men in their waking hours have a world in common')।

জীবের স্বপ্নাবস্থা

জীব সুপ্ত হইলে, জাগরণের সময়ে অনুভূত ইহলোক অতিক্রম করে।

স হি স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকম্ অতিক্রামতি—বৃহ, ৪।৩।৭

এই অবস্থা যাজ্ঞবল্ক্যের স্বপ্নান্ত বা স্বপ্নস্থান। জীব বুদ্ধান্ত হইতে স্বপ্নান্তে এবং স্বপ্নান্ত হইতে বুদ্ধান্তে সঞ্চরণ করে—জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নাবস্থায় এবং স্বপ্ন হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় গতাগতি করে—alternates between waking and dreaming।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব। * * * স বা এষ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নান্তায় এব—বৃহ, ৪।৩।১৬, ১৭

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যে জীবের এই গতি ও আগতি যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসংচরতি পূর্ব্বং চ অপরং চ, এবমেবায়ং পুরুষ এতৌ উভৌ অন্তৌ অনুসংচরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ—বৃহ, ৪।৩।১৮

'মহামৎস্য যেমন নদীর ঐ পার ও এই পার উভয় পারেই সংচরণ করে, তেমনি এই পুরুষ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত এই উভয় অবস্থাতেই বিচরণ করে।'

সর্ব্বসার-উপনিষৎ স্বপ্নাবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

তদ্বাসনাসহিতৈঃ চতুঃকরণৈঃ (অর্থাৎ মনঃ বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার) শব্দাভ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্ শব্দাদীন্ যদা উপলভতে তদ্ আত্মনঃ স্বপ্নম্। 'যে অবস্থায় স্থূল-ইন্দ্রিয় ব্যতীত তাহাদিগের 'বাসনা' (সংস্কার) মাত্র গ্রহণ করিয়া* জীব, মনঃ বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের অভাবেও বাসনাময় শব্দাদি উপভোগ করে, তাহাই জীবের স্বপ্নাবস্থা।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই মনোজ্ঞতর ভাষায় বলিয়াছেন—

ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্র আনন্দা মুদঃ প্রমুদঃ ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্তো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে। স হি কর্ত্তা। —বৃহ, ৪।৩।১০

'সে অবস্থায় রথ নাই, রথের বাহন নাই, পথ নাই—অথচ রথ, রথের বাহন, পথ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় আনন্দ মোদ প্রমোদ কিছুই নাই—অথচ আনন্দ মোদ প্রমোদ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় তড়াগ পুষ্করিণী নদী কিছুই নাই—অথচ তড়াগ পুষ্করিণী নদী সৃষ্টি করে। তিনিই কারক (কর্ত্তা)।'

এ সমুদায়ই বাসনার সৃষ্টি, কামনার রচনা। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ—কঠ, ৫।৮

স তত্র পর্য্যেতি—জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩

'সে সেখানে যথেচ্ছ বিহরণ করে—ভোজন করে, ক্রীড়া করে, রমণ করে—স্ত্রীদিগের সহিত, যানের সহিত, জ্ঞাতিদিগের সহিত—শরীররূপ উপসর্গের কথা বিস্মৃত হইয়া।'

ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচম্ ঈয়মানো
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো
জক্ষদ্ উতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্ ॥—বৃহ ৪।৩।১৩

* স্বপ্নের সময় স্থূল দশেন্দ্রিয় মনে একীভূত হয়। তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনসি একীভবতি। সেই জন্য নিদ্রাবস্থায় তাহাদের ব্যাপার স্তম্ভিত থাকে। তেন তর্হি এষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে—স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে—প্রশ্ন, ৪।২

'স্বপ্নাবস্থায় এই দেব (জীব) 'উচ্চাবচ'* প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ রূপ সৃষ্টি করে—কখন রমণীর সহিত আমোদ করে, কখন ভোজন করে, কখন বা ভয় দর্শন করে।' এই ভয় দর্শনের কথার উল্লেখ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি (বৃহ, ৪।৩।২০)

'স্বপ্নে জীব মনে করে, যেন কেহ তাহাকে হত্যা করিতেছে, যেন বন্দী করিতেছে, যেন হস্তী তাহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে, যেন সে গর্ত্তে পতিত হইতেছে।' ছান্দোগ্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

ঘ্নন্তি ত্বিব এনং, বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি অপি রোদিতীব—৮।১০।২

'যেন কে হত্যা করে, যেন বিদ্রুত হয়, যেন অপ্রিয়ভোগী হয়, যেন রোদন করে।

এই 'ইব' (যেন—As it were) লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ স্বপ্ন মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র—যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ (গৌড়পাদ)। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্যে বলিয়াছেন :—

তথা বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, বিদ্রাবয়ন্তি ইব, তথা চ পুত্রাদিমরণনিমিত্তং অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি। অপি চ স্বয়মপি রোদিতি ইব। ননু অপ্রিয়ং বেত্তি এব কথং বেত্তা ইব ইতি? উচ্যতে নামৃতাভয়ত্ব বচনানুপপত্তে ; 'ধ্যায়তি ইব' ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।

শঙ্কর এ স্থলে শ্রুতি বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি উদ্ধৃত করিলেন—'ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব'—'যেন ধ্যান করে, যেন ক্রীড়া করে।'

অনেক সময় স্বপ্ন জাগ্রতেরই ছায়া মাত্র—যদেব জাগ্রদ্ ভয়ং পশ্যতি, তদ্ অত্র অবিদ্যয়া মন্যতে (বৃহ, ৪।৩।২০)।

অথো খলু আহুঃ জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি—যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইতি (বৃহ, ৪।৩।১৪)—'কেহ কেহ বলেন—এই (স্বপ্নদেশ) জাগরিতদেশই। (জীব) জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখে, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই দেখে।'

কিন্তু আবার অনেক সময় জাগ্রৎ অবস্থায় অননুভূত বিষয়েরও স্বপ্নে অনুভূতি হয়।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্ অনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টম্ অনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থম্ অনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি। দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ, শ্রুতং চ অশ্রুতং চ, অনুভূতং চ অননুভূতং চ, সৎ চ অসৎ চ, সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি—প্রশ্ন, ৪।৬

'এই অবস্থায় সেই দেব মহিমা (বৈচিত্র্য) অনুভব করে। পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় আবার দর্শন করে, পূর্ব্বশ্রুতবিষয় আবার শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে অনুভূত বিষয় আবার অনুভব করে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ—সমস্ত হইয়া সমস্ত দর্শন করে।'

স্বপ্নাবস্থায় জীব কোথায় অবস্থান করে? কখনও ইন্দ্রিয়গণকে

* এই উচ্চাবচের কথা (অবচ = নিম্ন বা অধঃ)—আমরা অন্যত্রও শুনিতে পাই :—স যত্রৈতৎ স্বপ্নায়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবতি উতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি।—বৃহ, ২।১।১৮

স্ববশে রাখিয়া শরীরের অভ্যন্তরেই বিচরণ করে—

স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেত এবমেব এষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে—বৃহ, ২।১।১৮

আবার কখন বা সূক্ষ্ম উপাধির সহযোগে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে কামনার বস্তু, সেখানে উপনীত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—তং নায়তং বোধয়েৎ—'সুপ্তকে সহসা প্রবুদ্ধ করা উচিত নয়।' কেন? দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যম্ এষ ন প্রতিপদ্যতে (৪।৩।১৪)—কারণ, '(ঐ স্থলে) জীব যদি দেহে ঠিক্ প্রত্যাগমন না করে, তবে দুশ্চিকিৎস্য হয়।' আরও

প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়ং
বহিঃ কুলায়াদ্ অমৃতঃ চরিত্বা।
স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামং
হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ॥—বৃহ, ৪।৩।১২

'সেই অমৃত (জীব) এই অবর কুলায় (শরীররূপ নীড়কে) প্রাণের দ্বারা রক্ষা করতঃ নিজ কুলায়ের বহির্দ্দেশে গমন করিয়া যেখানে কামনার বস্তু, সেই হিরণ্ময় পুরুষ একহংস সেখানে বিচরণ করেন।'

'প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়ম্'*—সেই জন্য 'কানি অস্মিন্ জাগ্রতি? সুপ্তির সময় কে জাগরিত থাকে?' ইহার উত্তরে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'প্রাণাগ্নয় এব অস্মিন্ পুরে জাগ্রতি (প্রশ্ন, ৪।৩)—এই পুরে প্রাণাগ্নিই জাগ্রৎ থাকে।'

এই স্বপ্নাবস্থ জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডুক্য বলিতেছেন—

স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ * * * প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয় পাদঃ।

স্বপ্নাবস্থায় জীবের সংজ্ঞা 'তৈজস' কেন? বোধ হয় স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষের যে তেজঃ (স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা—বৃহ, ৪।৩।৯) সেই তেজঃ দ্বারা উজ্জ্বলিত হয় বলিয়া।

পাশ্চাত্য New Psychology-র (মনোবিজ্ঞানের নূতন ধারার) সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা দেখিবেন, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে—বিশেষতঃ নিদ্রা ও স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদিগের অভিনব সিদ্ধান্তের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। †

---

* এই প্রাণ Vitalistদিগের Life Force বা জীবন শক্তি। অধ্যাপক হ্যারিশ, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এই জীবনশক্তি Physical Forces বা ভৌতিকশক্তি হইতে ভিন্ন জাতীয়।

† এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অধুনা আবিষ্কৃত Subliminal Consciousnessকে বিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। Each of us is only a partial incarnation of a larger self × × Besides the consciousness of the ordinary field (অর্থাৎ Brain consciousness) there is a consciousness existing beyond the field—that is extra-marjinally and outside of the primary consciousness × × There are uprushes into the ordinary consciousness of energies originating in the subliminal parts of the mind. See James's Varieties of Religious Experiences pp 233 & 234

জীবের সুষুপ্তি অবস্থা

সুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন তাহাকে সুষুপ্তি বলে। সে অবস্থায় কি হয়? অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, তদা ন কস্যচন বেদ—বৃহ, ২।১।১৯ 'যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয়, তখন কোনকিছু জানে না।' এই অবস্থার বর্ণন করিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

তদ্ যথা অস্মিন্ আকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায় এব ধ্রিয়তে, এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি—বৃহ, ৪।৩।১৯

'যেমন শ্যেন বা বাজপক্ষী ঐ আকাশে বিহরণ করতঃ শ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় সংকুচিত করতঃ নিজ নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি এই পুরুষ সেই অন্তের প্রতি ধাবিত হন, সেখানে সুপ্ত হইয়া কোনও কামনা করেন না, কোনও স্বপ্ন দর্শন করেন না।'

সর্ব্বসার-উপনিষদে এ অবস্থার বর্ণনা এইরূপ—

চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্ বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন্ নোপলভতে তদ্ আত্মনঃ সুষুপ্তম্। 'যখন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের উপরমের (quiescence) ফলে বিশেষবিজ্ঞানের অভাববশতঃ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি হয় না—তাহাই আত্মার সুষুপ্তি।'

এই সুষুপ্তি-অবস্থাস্থিত জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডুক্য বলিয়াছেন—

সুষুপ্তস্থান একীভূত প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সুষুপ্তি অবস্থায় জীব বিষয়-বিগমে একীভূত হয়—তখন তাহার সংজ্ঞা প্রাজ্ঞ, যেহেতু সে তখন প্রজ্ঞানঘন, বিপশ্চিৎ † (all-knowing)। অতএব জীবের তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। কিন্তু তাহা হইলেও জীব এক, তিন নহে—তিনে এক—Unity in Trinity।

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু—ব্রহ্মবিন্দু, ১১

ঐ সুষুপ্তিকে যাজ্ঞবল্ক্য 'সংপ্রসাদ' বলিয়াছেন।

স বা এষ এতস্মিন্ সংপ্রসাদে রত্বা চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩

ছান্দোগ্যে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

তৎ যত্রৈতৎ সুপ্ত সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি—৮।১১।১ ও ৮।৬।৩

এমন কি ছান্দোগ্য এই সংপ্রসন্ন-অবস্থাস্থিত জীবের নাম দিয়াছেন 'সংপ্রসাদ'।

অথ য এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪, ৮।১২।৩

'সংপ্রসাদ' এ অবস্থাস্থ জীবের সার্থক নাম, কারণ, (যাজ্ঞবল্ক্যের

---

† ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

ভাষায়) তীর্ণোহি তদা সর্ব্বান্ লোকান্ হৃদয়স্থ ভবতি (বৃহ ৪।৩।২২)—তখন জীব হৃদয়ের সমুদায় শোক উত্তীর্ণ হয়।

সুষুপ্তিতে জীবের 'স্থান'

সুষুপ্তির সময় জীব কোথায় অবস্থান করে? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

তা বা অস্য এতা হিতা নাম নাড্যঃ, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ তাবতা অণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা—বৃহ, ৪।৩।২০

'ইহার হিতা নামক নাড়ীসমূহ আছে, যাহারা সহস্র ভাগে বিভক্ত কেশের তুল্য এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ, লোহিতে পূর্ণ।' অন্যত্র বৃহদারণ্যক এই হিতা নাড়ীর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভি প্রতিষ্ঠন্তে। তাভিঃ প্রত্যপসৃত্য পুরীততি শেতে—বৃহ, ২।১।১৯

'হিতা নামক যে ৭২০০০ নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ (Pericardium)-অভিমুখে নির্গত হইয়াছে, ঐ নাড়ী বাহিয়া (জীব) পুরীততে শয়ন করে।' এই নাড়ী কি স্থূল শরীরের শিরা বা ধমনী এবং 'পুরীতৎ' কি স্থূল Pericardium? ছান্দোগ্যের বিবরণ হইতে এই অন্ধকারে আলোকপাত হয়। ছান্দোগ্য বলেন :—

তা বা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাঃ পিঙ্গলস্য অণিম্নঃ তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষ শুক্লঃ এষ নীলঃ এষ পীতঃ এষ লোহিতঃ × × × এতা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ × × অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ—ছান্দোগ্য, ৮।৬।১২

'এই যে হৃদয়ের নাড়ী (বৃহদারণ্যক যাহাকে 'হিতা' নাম দিয়াছেন), তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত অণিমায় (essence এ) পূর্ণ। ঐ যে আদিত্য, তাহা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত। সেই আদিত্য রশ্মি আদিত্য হইতে প্রসৃত হইয়া এই সকল ('হিতা') নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়।'

সুষুপ্তির সময় জীব যখন সংহত, সংপ্রসন্ন হয়, তখন সে ঐ সকল নাড়ীতে প্রবেশ করে।

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি—ছান্দোগ্য ৮।৬।৩

কৌষীতকী ঐ 'হিতা' নাড়ীর বর্ণন করিয়া (হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যঃ হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতন্বন্তি) এবং তাহারা সহস্রধা বিপাটিত কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, একথা বলিয়া বলিতেছেন—

তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কশ্চন পশ্যতি—৪।১৯

'জীব সুষুপ্ত হইয়া স্বপ্নের ব্যতীত হইলে ঐ সকল নাড়ীতে বিশ্রান্ত হয়।' তখন কি হয়?

তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি, তেজসা হি তদা সংপন্নো ভবতি—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৩

'সে অবস্থায় কোন পাপ (evil) তাহাকে স্পর্শ করে না। সে তখন তেজের সহিত সংপন্ন হয়।' প্রশ্ন-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স যদা তেজসা অভিভূতো ভবতি, অথ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি—৪।৬

'সে যখন তেজঃ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন সেই দেব স্বপ্ন দর্শন করে না।' এই 'তেজঃ' কি? শঙ্কর বলেন—সেই আদিত্যরশ্মি, যাহা হিতা নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়।

সৌরেণ পিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্ব্বতঃ অভিভূতো ভবতি (৪।৬ প্রশ্ন ভাষ্য)

যদা এবং সুপ্তঃ, সৌরেণ তেজসা হি নাড্যন্তর্গতেন সর্ব্বতঃ সংপন্নো ব্যাপ্তো ভবতি—(৮।৬।৩ ছান্দোগ্য ভাষ্য)।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকের উক্তি স্মরণীয়।

যত্র এষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ × × য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—২।১।১৭

অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ (আত্মা) অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ, সেই আকাশে শয়িত হন। (এই 'আকাশ' কি? এ কথার আমরা গত বারে আলোচনা করিয়াছি।) অতএব হিতা নাড়ী যে স্থূল শরীরের ধমনী বা শিরা নহে এবং পুরীতৎ যে মাংসপেশী Pericardium নহে—ইহা একরূপ নিঃসংশয়।

তুরীয়ে জীবের ব্রহ্ম-সাযুজ্য

সুষুপ্তি যখন নিবিড়তর হয়, সে অবস্থার বর্ণন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ, ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

'যেমন প্রিয়া রমণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য-অন্তর কিছুরই জ্ঞান থাকে না, তেমনি এই পুরুষ 'প্রাজ্ঞ' আত্মা * কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানেন না।'

আমরা দেখিয়াছি, প্রথমতঃ জাগ্রৎ, দ্বিতীয় স্বপ্ন, এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নের উপর তৃতীয় অবস্থা সুষুপ্তি। সাধারণ সুষুপ্তি হইতে এই নিবিড়তর

* যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন, আমাদের 'শারীর' আত্মা (Corporeal self) ঐ 'প্রাজ্ঞ' আত্মা কর্ত্তৃক অন্বারূঢ়—এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ (বৃহ, ৪।৩।৩৫)। ইহার সহিত কৌষীতকী, ৪।১৯ তুলনীয়। তদ্, যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ × × এবমেব এষ প্রজ্ঞ আত্মা ইদং শারীরম্ আত্মানম্ অনুপ্রবিষ্ট আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ।

সুষুপ্তির প্রভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোন কোন উপনিষদ্ ইহাকে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা বলিয়াছেন।

অবস্থাত্রয় ভাবাভাবসাক্ষী * * নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যুচ্যতে।—সর্ব্বসার

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং * * প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে—মাণ্ডূক্য

নৃসিংহ-উত্তরতাপনীতে এই চারি অবস্থার নাম—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। মৈত্রায়ণ উপনিষদ্ এই চারি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

চাক্ষুষঃ স্বপ্নচারী চ সুপ্তঃ সুপ্তাৎ পরশ্চ যঃ।
ভেদাশ্চৈতেঽস্য চত্বারঃ তেভ্যঃ তুর্য্যং মহত্তরম্॥

'জীবের অবস্থার এই চারি ভেদ—চাক্ষুষ (শারীর বা জাগ্রৎ), স্বপ্নচারী, সুষুপ্ত এবং সুষুপ্তের পর। ইহার মধ্যে তুর্য্য বা চতুর্থই মহত্তর।' কেন মহত্তর? ইহার উত্তরে মৈত্রায়ণ বলেন—ত্রিম্বেকপাৎ চরেদ্ ব্রহ্ম, ত্রিপাৎ চরতি উত্তরে—কারণ, 'প্রথম তিন অবস্থায় ব্রহ্মের একপাদ (one quarter) মাত্র প্রকাশিত কিন্তু এই তুরীয়ে তিন পাদ'।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে জীব প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হওয়াতে বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না। অর্থাৎ সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হইয়া আত্মার একাকার অনুভূতি হয়।

অস্মিন্ প্রাণে † এব একধা ভবতি—কৌষী, ৩।৩

কারণ, তখন—

সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি—স্বম্ অপীতো ভবতি। তস্মাৎ এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১

'প্রগাঢ় নিদ্রায় জীব 'সতে'র সহিত (Pure Being-এর সহিত) একীভূত হয়, 'স্ব'তে অপীত (স্থিত) হয়। সেইজন্য লোকে বলে 'স্বপিতি'।'

এই কথার সমর্থন করিয়া ছান্দোগ্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'সেই সম্প্রসাদ (সুষুপ্ত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে (ব্রহ্মে) উপসন্ন হইয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হয়।' ইহাই পতঞ্জলির যোগ—তদা (অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তি নিরোধে) দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্।

† এই প্রাণ Vitalist এর Life নহে—ইহা অজর অমৃত 'প্রজ্ঞ' আত্মা—স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ (কৌষী, ১।৮)

ঐ অবস্থার বিবরণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস (পঞ্চম জাতি) অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

অর্থাৎ তখন সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—All distinctions are obliterated—ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্ব্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

'ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করে আমিই এই বিশ্ব। ইহাই তাহার পরম অবস্থা। অর্থাৎ (অধ্যাপক ডয়সনের ভাষায়),

'It is the condition of deep sleep, in which a man knows himself to be one with the universe, and is therefore *without objects to contemplate* and consequently *without individual* consciousness.'

এ অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িকভাবে অদ্বৈতে অবস্থিতি হয়।* যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। ন হি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ। যদ্ বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে। নহি রসয়তুঃ রসয়তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ রসয়েৎ। যদ্ বৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি। নহি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ বদেৎ। যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃন্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি। ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ শৃণুয়াৎ। যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে। ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত। যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি। নহি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ। যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন

*The transition is described from the dream consciousness to the consciousness of deep sleep—from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all whereby subject and object become one.—Deussen p 142

বিজানাতি। ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

'ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না—দর্শন সত্ত্বেও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না বটে, কারণ উহা অবিনাশী—কিন্তু যখন বিভিন্ন দ্বিতীয় থাকে না, তখন কি দর্শন করিবেন?

'ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না—আঘ্রাণ সত্ত্বেও আঘ্রাণ করেন না। ঘ্রাতার ঘ্রাণ বিলুপ্ত হয় না বটে, কারণ উহা অবিনাশী—কিন্তু যখন বিভিন্ন দ্বিতীয় থাকে না তখন কি আঘ্রাণ করিবেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু দর্শন ও ঘ্রাণ নহে—রসন, বচন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, বিচারণ প্রভৃতি প্রত্যেক বৃত্তি ও ব্যাপার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ একই উপদেশ। আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ—প্রশ্ন, ৪।৯

কিন্তু সেই গভীর সুষুপ্তিতে—যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটীর ভেদ তিরোহিত হইয়া একাকার অবস্থা হয়—তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, স্পর্শন করিবে, রসন করিবে, ঘ্রাণন করিবে, মনন করিবে, বিচারণ করিবে?

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে স্থলে যেন অন্য থাকে সেই স্থলেই একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে ঘ্রাণন করে, একে অপরকে স্বাদন করে, একে অপরকে বচন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে স্পর্শন করে, একে অপরকে বিচারণ করে।'

তাই যাজ্ঞবল্ক্য ঐ নিবিড়-সুষুপ্ত জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি (৪।৩।৩২)—He becomes the pure objectless knowing Subject।

সর্ব্বসার-উপনিষদ্ এ অবস্থার বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

অবস্থাত্রয়ভাবাভাবসাক্ষী স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যাচক্ষতে। অর্থাৎ 'the spiritual substance undifferentiated, set free from all existing things subsists alone by itself—as a ...'

মাণ্ডূক্য-উপনিষদের বর্ণনা আরও গভীর—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে—মাণ্ডূক্য, ৭

'(সে অবস্থায়) প্রজ্ঞা বহির্মুখও নহে, অন্তর্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে; (তখন) আত্মা প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন—তিনি অ-দৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষ্য, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য—একাত্মপ্রত্যয়সার (founded solely on the assurance of its own self) প্রপঞ্চাতীত (effacing the entire universe), শান্ত, শিব, অ-দ্বৈত। তাঁহাকে চতুর্থ (তুরীয়) বলা হয়।'

এই গভীর সুষুপ্তি বা তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্মের সহিত জীবের যে সাময়িক একীভাব হয়—সতা তদা সংপন্নো ভবতি—যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট ইহাকেই 'ব্রহ্মলোক' বলিয়াছেন।

এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্ ইতি হৈনম্ অনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন যে, এ স্থলে ব্রহ্মলোক অর্থে ব্রহ্মের লোক (ব্রহ্মণঃ লোকঃ) নহে—ব্রহ্ম এব লোকঃ। ছান্দোগ্যের ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে আমরা ইহারই সমর্থন পাই। প্রজাপতি বলিলেন, ঐ যে 'সমস্ত, সংপ্রসন্ন' জীব—উনিই আত্মা, উনিই অমৃত অভয় ব্রহ্ম—এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি—ছা, ৮।১১।১।

অন্যত্র ছান্দোগ্য ঐ 'সংপ্রসন্ন' জীবের অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।—৮।৩।২

'যেমন ক্ষেত্রে নিহিত হিরণ্যনিধির (hidden treasure) উপর প্রতিদিন সঞ্চরণ করিলেও অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান জানে না, তেমনি এই সমস্ত প্রজা (creatures) প্রতিদিন (সুষুপ্তিতে) 'ব্রহ্মলোকে' প্রবেশ করিলেও ব্রহ্মলোকের সন্ধান পায় না। কারণ, তাহারা অনৃত-প্রত্যূঢ় (অবিদ্যামোহিত)।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, গভীর সুষুপ্তিতে জীবের এই 'সংপ্রসন্ন' অবস্থাই তাঁহার অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয় রূপ—তাঁহার ছন্দাতীত পাপাতীত ভয়াতীত রূপ—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম—(বৃহ, ৪।৩।২১)

—তাঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম, শোকাতীত রূপ—

তদ্ বা অস্য এতৎ আপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্—(বৃহ, ৪।৩।২১)। সুতরাং উহাই জীবের পরমা গতি, পরম সম্পৎ, পরম লোক, পরম আনন্দ—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষাস্য পরমো লোকঃ, এষোস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ—বৃহদারণ্যক অন্যত্রও (২।১।১৯) বলিয়াছেন,

—অতিঘ্নীম্ (acme) আনন্দস্য গত্বা × × এষ এতৎ শেতে। সেই জন্য সুষুপ্তিভঙ্গে জীব প্রবুদ্ধ হইয়া বলে—'সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সং ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্—সুখে সুপ্ত ছিলাম—কিছুই জানিতাম না।' সুষুপ্তির অবস্থা (আমরা জানিয়াছি) is 'existence as subject without object'—বিষয়-বিবর্জ্জিত বিষয়ীর স্থিতি।

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, তদা ন কস্যচন বেদ—বৃহ, ২।১।১৯

অধিকন্তু, অথ তদা অস্মিন্ শরীরে সুখং ভবতি - প্রশ্ন, ৪।৮

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোভিভূতঃ সুখরূপম্ এতি—কৈবল্য, ১৩

'সুষুপ্তির সময় সমস্ত বিলীন হইলে জীব 'অভাবে'-স্থিত হইয়া সুখ অনুভব করে।' বলা বাহুল্য, এ সুখ বিষয়সংস্পর্শজ-বৃত্তিজাত সুখ নহে—ইহা আনন্দ—আনন্দং নন্দনাতীতম্—ইহা আনন্দময় জীবের স্বরূপে অবস্থান।

কিন্তু এই সুষুপ্তিতে প্রত্যগাত্মার সহিত (with the eternal knowing Subject) জীবের যে সংযোগ হয়, তাহা সাময়িক মাত্র—সে সংযোগ অস্থায়ী (a transient union)। যাজ্ঞবল্ক্য ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

স বা এষ সংপ্রসাদে রত্বা চরিত্বা × × পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নায় এব—বৃহ, ৪।৩।১৫

যেমন স্বপ্নস্থান হইতে সুষুপ্তি-স্থানে সঞ্চরণ করিয়াছিল, জীব তেমনি আবার সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নে অবতরণ করে এবং তথা হইতে জাগ্রতে। অতএব এ যোগ 'প্রভবাপ্যয়ৌ'—ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেই জন্য জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহা বাহ্য, পরে কহ আর'। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদের তুঙ্গতম ভূমিতে আরোহণ করিয়া মোক্ষতত্ত্ব বিবৃত করিলেন। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সুস্থিত, স্থায়ী ও চিরন্তন হয় (becomes fixed, established and permanent)। আগামী বারে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ মোক্ষবাদের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ

১

সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনায়ই পারিভাষিক শব্দগুলির একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে এবং আলোচনার আগাগোড়া সর্ব্বত্রই ওই নির্দ্দিষ্ট অর্থটিকে বজায় রাখা চাই। পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ যদি নির্দ্দিষ্ট এবং সর্ব্বত্র সমান না থাকে তবে অনেক সময়ই অর্থবিভ্রাট ঘটা সম্ভব। মাঘের "পরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধটি প'ড়ে পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে কিছু সংশয় থেকে যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। উক্ত প্রবন্ধে তিনি 'যুক্ত অক্ষর,' 'যুগ্মধ্বনি,' 'যুগ্মস্বর' এবং 'যুগ্মবর্ণ'—এই চারটি শব্দকেই একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমি কিন্তু এ শব্দ চারটিকে এক অর্থে ব্যবহার করিনে। যুক্তাক্ষর এবং যুগ্মবর্ণ এক হ'তে পারে; কিন্তু যুক্তাক্ষর এবং যুগ্মধ্বনি এক জিনিষ নয়। যেমন 'প্রতি' শব্দের 'প্র' যুক্তাক্ষর বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি নয়। 'ছন্দ' শব্দের 'ন্দ'-কে যুক্তাক্ষর বল্‌ব কিন্তু যুগ্মধ্বনি বল্‌ব না। 'ছন্দ' শব্দে যে যুগ্মধ্বনি আছে সেটা আমার পরিভাষায় 'ন্দ'-এর মধ্যে নয়, 'ছন্'-এর মধ্যে; 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্' যুগ্মধ্বনি, 'দ' অযুগ্ম ধ্বনি। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি; এ স্থলে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যুগ্মধ্বনি এবং যুগ্মস্বরও সম্পূর্ণরূপে এক জিনিষ নয়। যুগ্মস্বরমাত্রকেই যুগ্মধ্বনি বল্‌তে পারি; কিন্তু যুগ্মধ্বনিমাত্রকেই যুগ্মস্বর বল্‌তে পারিনে। পূর্ব্বোক্ত 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্' যুগ্মধ্বনি বটে, কিন্তু যুগ্মস্বর নয়। যে-সব যুগ্মধ্বনির অন্তর্গত আশ্রেতা ও আশ্রিত উভয়েই স্বরবর্ণ, সে-সব যুগ্মধ্বনিকেই যুগ্মস্বর বা diphthong বলেছি। যেমন অই্, আই্, অউ্, আউ্, ইউ্, এউ্, অও্, আও্, এও্ ইত্যাদি যুগ্মধ্বনিগুলিকে যুগ্মস্বরও বল্‌তে পারি; কেননা এখানে অ, আ, ই, এ এই আশ্রেতা ধ্বনিগুলিও স্বর এবং ই্, উ্, ও্ এই আশ্রিত ধ্বনিগুলিও স্বর।

ছন্দের আলোচনায় আমি 'অক্ষর' শব্দটিকে বর্জ্জন কর্‌তে চাই। কারণ ছন্দ তো অক্ষর নিয়ে কারবার করে না; অক্ষর যে-ধ্বনির প্রতীক ছন্দের কারবার সেই ধ্বনিটাকে নিয়ে, অক্ষরটাকে নিয়ে নয়। তাছাড়া ভারতবর্ষীয় লিপিপদ্ধতিতে অক্ষরগুলি সব সময় যথার্থরূপে ধ্বনির প্রতি-নিধিত্বও করে না। কারণ একেকটি অযুক্ত অক্ষর অনেক সময়ই একেকটি অযুগ্মধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিনিধি হ'লেও, একেকটি যুক্তাক্ষরকে তেমনও একেকটি যুগ্মধ্বনির প্রতিনিধি বলা যায় না। যেমন 'প্রতি'

শব্দের 'প্র' এবং 'ছন্দ' শব্দের 'ন্দ' যুক্তাক্ষর বটে, কিন্তু যুগ্মধ্বনি নয়। পক্ষান্তরে 'ছন্দ' শব্দের 'ছন্'-কে যুগ্মধ্বনি বল্‌ব, কিন্তু যুক্তাক্ষর বলা যায় না। এজন্যে আমি বিশেষভাবে যুক্তাক্ষর, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি শব্দকে ছন্দের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করার পক্ষপাতী। আর এজন্যেই সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায়ও আমি সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রকারদের থেকে একটু পৃথক্ প্রণালী অবলম্বন কর্‌তে চাই। যেমন, 'কশ্চিৎকান্তা' কথাটাকে সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র-মতে বিশ্লেষণ করা হয় এ ভাবে—ক-শ্চি-ৎকা-ন্তা; কারণ সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে সংযুক্তাক্ষর কথাটার ব্যবহার আছে, যুগ্মধ্বনি কথার ব্যবহার নেই। কিন্তু আমি ওই জিনিষটাকে বিশ্লেষণ কর্‌তে চাই এভাবে—কশ্‌-চিৎ-কান্‌-তা; কারণ আমি যুক্তাক্ষর কথাটি ব্যবহারের বিরোধী এবং যুগ্মধ্বনি শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। পূর্ব্বেই বলেছি 'অক্ষর' শব্দটিকেই ছন্দের আলোচনায় ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দটা এত বেশি প্রচলিত হ'য়ে গেছে যে ও-শব্দটাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা কঠিন। যাহোক্, বাংলা ছন্দের আলোচনায় ও-শব্দটাকে যদি ব্যবহার কর্‌তেই হয় তবে এই শব্দটার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সব সময়ই সচেতন থাকা প্রয়োজন। অক্ষর শব্দটার তিনটি অর্থ আছে। এর বৈয়াকরণিক অর্থ বর্ণমালার বর্ণ অর্থাৎ letter। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে অক্ষর শব্দে একেকটি পূর্ণ ধ্বনি বা syllable বোঝায়। কিন্তু বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দের অর্থের স্থিরতা নেই; বাংলা ছন্দে অক্ষর শব্দ দ্বারা কখনও letter, কখনও syliable বোঝায়। যেমন—বিদ্যুৎ, মহৎ শব্দ বাংলা ছন্দে তিন অক্ষরের শব্দ; প্রথম দুটি অক্ষরে দুটি সিলেব্‌ল্ (বি, দ্যু এবং ম, হ) বোঝাচ্ছে, কিন্তু তৃতীয় অক্ষরটি একটি letter (খণ্ড-ৎ) বোঝাচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে ও-দুটি দুই অক্ষর অর্থাৎ দুই সিলেব্‌ল্-এর বেশি মর্য্যাদা পাবে না, যদিও 'মাত্রা' হিসেবে বিদ্যুৎ শব্দে চার মাত্রা এবং মহৎ শব্দে তিন মাত্রা। তেম্‌নি পুণ্যবান্, শক্তিমান্ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ছন্দে তিন অক্ষর ব'লে গণ্য হ'লেও বাংলা ছন্দে এগুলি চার অক্ষরের শব্দ ব'লেই গৃহীত হয়; কারণ হসন্ত ন্-কেও বাংলা ছন্দের প্রচলিত হিসাবে এক অক্ষর ব'লেই ধরা হয়। বাংলার প্রচলিত অর্থে 'মুষ্কিল' শব্দে তিন অক্ষর বটে; কিন্তু যদি লিখি 'মুষ্‌কিল' তা হ'লে চার অক্ষর ব'লে ধরা হবে। যাহোক্, অক্ষর শব্দের পারিভাষিক অর্থ নিয়ে এস্থলে আর অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

ছন্দের আলোচনায় 'মাত্রা' কথাটির ব্যবহার সম্বন্ধেও একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ সঙ্গীতের পরিভাষায় মাত্রা শব্দটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রা কথাটি অবিকল সে-অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

সঙ্গীতে সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বদাই ধ্বনি-পরিমাণ (quantity) নিখুঁতভাবে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হয়, অর্থাৎ সঙ্গীত জিনিষটা সর্ব্বদাই quantitative বা মাত্রিক; কাজেই সঙ্গীতে ধ্বনি-পরিমাণের unit বা ব্যষ্টিও সর্ব্বদাই quantitative। আর ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-র যে unit তারই পারিভাষিক নাম 'মাত্রা'। সুতরাং সঙ্গীতের unit বা ব্যষ্টিকে সর্ব্বদাই 'মাত্রা' বলা চলে। কিন্তু ছন্দ আর সঙ্গীত এক জিনিষ নয়। ছন্দমাত্রই মুখ্যত ধ্বনি-পরিমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ সমস্ত ছন্দই quantitative নয়। এমন অনেক ছন্দ আছে যা গৌণত quantitative হ'লেও ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity যার মুখ্য বা মূল কথা নয়। ইংরেজি ছন্দগুলি আসলে quantitative বা মাত্রাধর্ম্মী কি না এ বিষয়ে ছন্দোবিৎ-মহলে প্রচুর তর্ক হ'য়ে গেছে। এস্থলে ইংরেজী ছন্দের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অবান্তর। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সংস্কৃত ছন্দ-মাত্রই মূলে quantitative বা মাত্রিক নয়, এবিষয়ে সমস্ত সংস্কৃত ছন্দোবিৎ-রাই একমত। ছন্দ-শাস্ত্রকার গঙ্গাদাস সংস্কৃত ছন্দগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥—ছন্দোমঞ্জরী, ১।৪

এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে-ছন্দগুলি 'জাতি' শ্রেণীর অন্তর্গত শুধু সেগুলিই 'মাত্রাকৃত' বা quantitative, আর যে-ছন্দগুলি অক্ষর অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-সংখ্যাত সেগুলি মুখ্যত মাত্রাকৃত বা quantitative নয়, একথা বলাই উক্ত ছন্দ-শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়। অন্যান্য ছন্দ-শাস্ত্রকাররাও এ বিষয়ে গঙ্গাদাসের সঙ্গে একমত। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখা দরকার যে, 'জাতি' ছন্দগুলি 'মাত্রাকৃত' ব'লে ছন্দ-শাস্ত্রে এগুলিকে অনেক সময় 'মাত্রাবৃত্ত' নামেও অভিহিত করা হয়; আর অক্ষর-সংখ্যাত 'বৃত্ত' ছন্দ-গুলিকেও ওই একই কারণে অক্ষরবৃত্ত বা 'বর্ণবৃত্ত নামও দেওয়া হ'য়ে থাকে। যাহোক্, আমরা দেখ্‌লুম যে, সংস্কৃত ছন্দোবিৎদের মতে একমাত্র জাতি বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দগুলিই মাত্রাকৃত অর্থাৎ quantitative; এসব ছন্দের unit বা একক হচ্ছে 'মাত্রা'। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দগুলি মাত্রাকৃত বা quantitative নয়; কারণ এসব ছন্দের unit মাত্রা নয়, এসব ছন্দের unit হচ্ছে 'অক্ষর'।

'মাত্রা' ও 'অক্ষর' এ দুটি পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ দিলে বিষয়টা অনেকের পক্ষে সহজ হবে। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের 'অক্ষর' আর ইংরেজি সিলেব্‌ল একই জিনিষ, ওশাস্ত্রে অক্ষর বল্‌তে ব্যাকরণের

বর্ণ অর্থাৎ letter বা হরফ বোঝায় না। আর 'মাত্রা' শব্দকে অর্থাৎ ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-র unit-কে ইংরেজিতে বল্‌তে পারি metrical moment বা instant। কোলব্রুক সাহেবও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের আলোচনায় মাত্রা কথার ইংরেজি প্রতিশব্দরূপে moment এবং instant শব্দ ব্যবহার করেছেন (Colebrooke's Miscellaneous Essays, vol. II, pp. 62-166)। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রা কথার প্রতিশব্দরূপে স্থলবিশেষে 'কলা' কথাটিও ব্যবহৃত হয়। এই 'কলা'-কে ইংরেজিতে metrical digit বল্‌তে পারি। ছন্দ-পরিভাষার 'মাত্রা' বা 'কলা'র আরেকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে *mora* (A. B Keith's History of Sanskrit Literature, ১৮৩ ও ৪১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। Metrical moment, instant বা digit শব্দের পরিবর্ত্তে *mora* কথাটি ব্যবহার করাই সুবিধে। সুতরাং আমাদের আলোচনায় সংস্কৃত মাত্রা বা কলা কথার প্রতিশব্দরূপে *mora* কথাটিই ব্যবহার কর্‌ব।

২

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ উপলক্ষে সংস্কৃত ছন্দের শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করার সার্থকতা আছে। এস্থলে সে-বিষয়ে সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রের বিখ্যাত টীকাকার হলায়ুধ সমস্ত সংস্কৃত ছন্দকে গণচ্ছন্দ, মাত্রাচ্ছন্দ ও অক্ষরচ্ছন্দ এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন (ছন্দঃসূত্রম্—৪।১১ টীকা)। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কেদারভট্ট (বৃত্তরত্নাকর-প্রণেতা), গঙ্গাদাস (ছন্দোমঞ্জরী-প্রণেতা) প্রভৃতি ছন্দোবিৎরা সংস্কৃত ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত (বা জাতি) এবং অক্ষরবৃত্ত এই দুটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; গণচ্ছন্দগুলিও আসলে মাত্রাকৃত বা quantitative ব'লে তাঁরা এ ছন্দগুলিকেও মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দের অন্তর্গত ব'লেই গণ্য করেছেন।

কিন্তু আমার মনে হয় এই দুরকম শ্রেণীবিভাগের কোনোটিই নির্দ্দোষ নয়। আমার বিবেচনায় সমস্ত সংস্কৃত ছন্দকে মাত্রিক, আক্ষরিক এবং অক্ষরমাত্রিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করাই সঙ্গত। যে-সমস্ত ছন্দ শুধু ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-র উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে বলা যায় মাত্রিক অর্থাৎ quantitative ছন্দ; যথা বৈতালীয়, ঔপচ্ছন্দসিক, মাত্রাসমক, আর্য্যা ইত্যাদি। যে-সমস্ত ছন্দ শুধু অক্ষর বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে বলা যায় আক্ষরিক অর্থাৎ syllabic ছন্দ; যথা—অনুষ্টুপ্ শ্লোক। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি সমস্ত বৈদিক ছন্দই এই আক্ষরিক বা syllabic শ্রেণীর অন্তর্গত; শুন্‌তে পাই অবেস্তার

সমস্ত ছন্দই নাকি সম্পূর্ণরূপে আক্ষরিক প্রকৃতির। আর যে-সমস্ত সংস্কৃত ছন্দে যুগপৎ অক্ষরসংখ্যা এবং ধ্বনি-পরিমাণ (syllable and quantity) সুনির্দ্দিষ্ট থাকে সে-সব ছন্দকে অক্ষরমাত্রিক (syllabic-quantitative) নামে অভিহিত করা যায়। যে সমস্ত লৌকিক ছন্দকে শাস্ত্রকাররা বৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত নামে অভিহিত ক'রে থাকেন, একমাত্র অনুষ্টুপ্ শ্লোক ছাড়া সে সমস্ত ছন্দই আসলে এই অক্ষরমাত্রিক শ্রেণীর অন্তর্গত; ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি সমস্ত সুপরিচিত ছন্দই আসলে অক্ষরমাত্রিক, একথা সংস্কৃত কাব্যপাঠককে বলাই নিষ্প্রয়োজন। আর বৈদিক ছন্দগুলি আক্ষরিক (syllabic) বটে কিন্তু অক্ষরমাত্রিক নয়, আশা করি একথাও বলা বাহুল্য।

এবার অক্ষর (syllable) ও ধ্বনি-পরিমাণ (quantity), এই দুই তত্ত্বকে অবলম্বন ক'রে বাংলা ছন্দগুলিকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় তা দেখা যাক্। পূর্ব্বেই বলেছি যে বাংলায় অক্ষর বল্‌তে হরফ বা letter বোঝায়, সিলেব্‌ল্ বোঝায় না। তাই বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি সিলেব্‌ল্ কথার প্রতিশব্দ হিসেবে কোথাও ধ্বনি (যথা—যুগ্মধ্বনি, অযুগ্ম-ধ্বনি) এবং কোথাও স্বর (যথা—স্বরবৃত্ত, স্বরমাত্রিক) এ শব্দদুটি ব্যবহার করেছি, কারণ সিলেব্‌ল্-এর অন্তরের তত্ত্বই হচ্ছে একটি স্বর বা ধ্বনির অস্তিত্ব। কাজেই দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় যাকে বলা হয় 'অক্ষর' বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি তাকেই বলেছি 'স্বর'। সুতরাং সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত এবং বাংলা স্বরবৃত্ত এ কথা দুটি আসলে অভিন্নার্থক। অর্থাৎ সংস্কৃত পরিভাষায় যাকে বলেছি আক্ষরিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বাংলা পরিভাষায় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দও বল্‌তে পারি; আর অক্ষরমাত্রিক এবং স্বরমাত্রিক এ শব্দ দুটিও একার্থবাচক। আমরা দেখেছি syllable ও quantity এই দুই তত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রে সংস্কৃত ছন্দকে আক্ষরিক (syllabic), মাত্রিক (quantitative) এবং অক্ষরমাত্রিক (syllabic-quantitative) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ঠিক্ এই প্রণালী অবলম্বন ক'রে বাংলা ছন্দকে নিম্নলিখিত চার শ্রেণীতে বিভক্ত কর্‌তে পারি।—

১। মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ২। স্বরবৃত্ত (syllabic)
৩। যৌগিক (mixed) ৪। স্বরমাত্রিক (syllabic-quantitative)

বাংলা ছন্দের এই চার শ্রেণীর ইতিহাসটাও সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসের আদিযুগে 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দেরই প্রচলন দেখতে পাই; প্রমাণ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের শেষ যুগে অক্ষরমাত্রিক ছন্দের চেয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই অধিকতর প্রচলন একটি লক্ষ্য করার বিষয়। এই উক্তিটি যে বাংলা দেশের পক্ষে বিশেষভাবে খাটে তার প্রমাণস্বরূপ লক্ষ্মণসেনের (খৃঃ ১১৭৮—১২০৫) সভাকবি জয়দেবের

গীতগোবিন্দ এবং আচার্য্য গোবর্দ্ধনের আর্য্যাসপ্তশতী এই দুখানি কাব্যের উল্লেখ করতে পারি। সংস্কৃত-যুগের পরবর্ত্তীকালের প্রাকৃত কাব্যসাহিত্যেও মাত্রাবৃত্তেরই খুব বেশি প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলির আদিযুগে স্বভাবতই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাব্যের প্রধান বাহন হয়েছিল। কাজেই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে মাত্রিক ছন্দের ব্যবহারে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগেও বৈষ্ণব পদাবলীগুলিতে ওই মাত্রিক ছন্দেরই প্রাধান্য। কিন্তু আদিযুগের বৌদ্ধ পদাবলী এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী উভয়ত্রই সংস্কৃত ও প্রাকৃত উচ্চারণ-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেই ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ স্থির করার প্রয়াস দেখা যায়। অথচ ওই উচ্চারণ-পদ্ধতি আধুনিক ভাষার প্রকৃতিবিরোধী। তাই আমাদের প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে সংস্কৃত উচ্চারণ-পদ্ধতি ও বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির একটা দ্বন্দ্ব দেখ্‌তে পাই এবং সেজন্যেই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ছন্দ-পতনের এতটা প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর পরবর্ত্তী যুগে বাংলা সাহিত্য থেকে মাত্রিক ছন্দ একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে 'ভানুসিংহের পদাবলী'-তে প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। তার পরে তিনি 'মানসী'-র যুগেই সর্ব্বপ্রথমে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণটিকে অব্যাহত রেখে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তন করেছেন। তখন থেকেই এজাতীয় ছন্দ বাংলা কাব্যের, বিশেষত, গীতিকবিতার, একটি প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে।

বাংলা 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের ইতিহাসও কম ঔৎসুক্যকর নয়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, কাশীরামদাসের মহাভারত এবং এমন কি গোবিন্দদাসের পদাবলীতেও স্বরবৃত্ত ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। স্বরবৃত্ত হচ্ছে বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কবিরা যে-সব ছন্দে কাব্য রচনা করতেন সেগুলি ছিল কৃত্রিম ছন্দ, তার ফলে আমাদের প্রাচীন কাব্যের সর্ব্বত্রই ওই স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ছন্দগুলির একটা চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন কাব্যে যে-সব স্থলে আমরা সাধারণত ছন্দ-পতন ঘটেছে মনে ক'রে থাকি সে-সব স্থলেই ওই দ্বন্দ্বের পরিচয় র'য়ে গেছে। আর প্রাচীন কবিদের কৃত্রিম ছন্দের বিরুদ্ধে বাংলার সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দের বিদ্রোহের ফলেই ওই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। তাই যে-সব স্থলে ছন্দ-পতনের আকারে ওই দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে তার মধ্যে সাধারণত প্রাচীন কৃত্রিম ছন্দের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাভাবিক নবীন স্বরবৃত্ত ছন্দেরই জয়ের আভাস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাংলা ছন্দের প্রাচীন ও নবীন ধারার এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসটি

বাস্তবিকই খুব বিস্ময়কর। যাহোক্, বাংলার এই স্বাভাবিক স্বরবৃত্ত ছন্দটি সর্ব্বপ্রথমে রামপ্রসাদের গানেই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তথাপি তখনকার দিনের কবিরা এছন্দের স্বরূপ ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্র থেকে হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত অনেক কবির রচনায়ই এছন্দের অল্পবিস্তর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু কারও হাতেই তা'র যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষিত হয়নি; সর্ব্বত্রই তা'র অনাদর ঘটেছে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এছন্দের প্রকৃত মূল্য বুঝে তাকে বাংলা কাব্যের ছন্দ-ভাণ্ডারে সযত্নে অভিনন্দিত* করেছেন। 'ছবি ও গান'-এই তিনি সর্ব্বপ্রথমে এছন্দের যথার্থ প্রকৃতিটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁর এ চেষ্টা পরিশেষে 'ক্ষণিকা'-র যুগে সাফল্য লাভ করেছে। এ ছন্দটির যথার্থ মর্য্যাদা আবিষ্কারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভারতীর বীণায় যে একটি নবতন তন্ত্রী যোজনা করতে সমর্থ হয়েছেন, তার ধ্বনি-মাধুর্য্য অন্য কোনো ছন্দের চেয়ে কম নয়।

কিন্তু সব চেয়ে জটিল ইতিহাস হচ্ছে বাংলা 'যৌগিক' ছন্দের। এ ছন্দটিই হচ্ছে আমাদের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রধান বাহন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য এ ছন্দেই রচিত। কিন্তু তাঁদের কাব্যে এছন্দের প্রকৃত মূর্ত্তি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। এছন্দের উৎপত্তি কিরূপে হ'লো, আমার মনে হয় বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এটি একটি গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার স্থান এটা নয়। শুধু এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, এ ছন্দটির প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করতে বাংলার কবিদের বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। মধ্যযুগে এছন্দটিকে একদিকে প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রাবৃত্ত অপরদিকে বাংলার স্বাভাবিক স্বরবৃত্ত এদুটি ছন্দের আকর্ষণে একটি অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে দোলায়মান দেখা যায়। তার উপর সংস্কৃতজ্ঞ কবিদের হাতে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব, ফার্সী-নবীশ কবিদের হাতে ফার্সী ছন্দের প্রভাব এবং সমস্ত কবিতা-কেই গানের ভঙ্গিতে সুর ক'রে পড়ার প্রচলিত অভ্যাস, এসমস্তর ফলে এছন্দটি কোনো সুস্পষ্ট আকার ধারণ ক'রে উঠতে পারেনি। এই অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার বহু পরিচয় আমাদের প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে আমাদের কাব্যসাহিত্যের প্রধান বাহনটি যে একটি যৌগিক ছন্দের আকার ধারণ কর্‌ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের হাতে এছন্দটি একটি নতুন ধরণের 'অক্ষর'-বৃত্তের আকার ধারণ করে অর্থাৎ সে-সময় থেকে শুধু অক্ষরের সংখ্যার সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ছন্দ-রচনার প্রথা দেখা দেয়। কিন্তু এই 'অক্ষর' জিনিষটা সিলেব্‌ল্‌ও নয়, letterও নয়; স্থলবিশেষে সিলেব্‌ল্,

স্থলবিশেষে letter বা বর্ণ। এইটেই 'অক্ষর' শব্দের বাংলায় প্রচলিত অর্থ। কিন্তু এই অনিশ্চিতার্থক 'অক্ষর' কখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব কর্‌তে পারে না। অথচ ধ্বনিই ছন্দের মূলতত্ত্ব, অক্ষর নয়, একথা বলাই বাহুল্য। যাহোক্, যখন থেকে এই অক্ষর আমাদের কাব্য-ছন্দের মূল-তত্ত্বের স্থান দখল করেছে তখন থেকে আমাদের ছন্দে এক নতুন রকমের ত্রুটি দেখা গেল। সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এটা নয়। শুধু এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে ভারতচন্দ্রের সময় থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কাব্য-ছন্দের রাজ্যে ওই অনিশ্চিত প্রকৃতির অক্ষরেরই একাধিপত্য চলেছে। মেঘনাদবধের ছন্দ-বিচার কর্‌লে দেখা যাবে ওই কাব্যখানির আগাগোড়া প্রত্যেকটি পংক্তি চোদ্দ 'অক্ষরে' গাঁথা। সর্ব্বত্রই চোদ্দ অক্ষরের প্রয়োগ হয়েছে ; কোথাও ধ্বনি-ব্যষ্টির (metrical unit-এর) প্রতি লক্ষ্য নেই। আর অক্ষরই যে ওই ধ্বনি-ব্যষ্টির কাজ সর্ব্বত্র চালাতে পারে না একথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই ধ্বনিবিচারহীন অক্ষর সংখ্যার সাম্যরক্ষা ছন্দের পক্ষে অস্বাভাবিক ব'লেই আমি মনে করি।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সহজ ছন্দ-প্রতিভার স্পর্শে এই 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দের যৌগিক প্রকৃতিটি আবিষ্কৃত হ'লো। তাঁরই রচনা থেকে সর্ব্বপ্রথমে দেখা গেল যে অক্ষর সংখ্যার সাম্যরক্ষা ছন্দের পক্ষে অবান্তর ; ধ্বনি-সাম্যই ছন্দ-রচনার মূল কথা। তাই তিনি শুধু ধ্বনি-সাম্য রক্ষা ক'রেই ছন্দ-রচনা করেছেন, অক্ষর সংখ্যার বৈষম্যে সঙ্কুচিত বা বিচলিত হন নি। অবশ্য তাঁরও অল্পবয়সের রচনায় অক্ষরসাম্যই দেখা যায় ; কিন্তু পরিণত বয়সের রচনায় তিনি ধ্বনি-সাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে অক্ষরসাম্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। এভাবে স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ন্যায় আমাদের যৌগিক ছন্দটিও রবীন্দ্রনাথের হাতেই পরিণতি লাভ করেছে। [এ বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা "জয়ন্তী-উৎসর্গে"র 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামক প্রবন্ধে ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] আমাদের এই তথাকথিত 'অক্ষর'-বৃত্ত ছন্দটি যে আসলে একটি যৌগিক প্রকৃতির ছন্দ সে-বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ এ ছন্দের এই যৌগিক প্রকৃতিটি আধুনিক কালেও যথোচিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে ব'লে মনে হয় না।

আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দটিকে বলতে পারি বাংলার বৈদিক ছন্দ। আর আমাদের মাত্রাবৃত্ত ছন্দটি হচ্ছে সংস্কৃতের 'মাত্রাবৃত্ত' জাতি ও গণচ্ছন্দের প্রতিনিধি। কিন্তু আমাদের যৌগিক ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ সংস্কৃতে নেই, এইটি একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। পক্ষান্তরে সংস্কৃত অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ বাংলায় ছিল না। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন যে বাংলায়ও সংস্কৃত

অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের অনুরূপ ছন্দ রচনা করা যায়। তাঁর রচিত এই নতুন-জাতীয় ছন্দকেই আমি নাম দিয়েছি 'স্বর-মাত্রিক' ছন্দ।

এখানে বলা প্রয়োজন যে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর ছন্দই আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রধান বাহন। আর বাংলা ছন্দের ওই তিনটি শ্রেণীই রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিণতি লাভ করেছে ; তা ছাড়া ওই তিন ছন্দেই তিনি এত বিচিত্র রকমের ছন্দোবন্ধের উদ্ভাবন করেছেন যা সত্যই বিস্ময়কর। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত স্বরমাত্রিক নামে যে চতুর্থ শ্রেণীর ছন্দের উল্লেখ করেছি বাংলা কাব্যসাহিত্যে তার পরিসর এখনও অতি সংকীর্ণ ; এছন্দে রচিত বাংলা কবিতার সংখ্যাও খুবই কম। এছন্দ রচনায় খুব সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিচারের প্রয়োজন ; কারণ এছন্দ রচনায় ধ্বনি-শিল্পের খুব সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের দরকার হয়। তাই এই ছন্দে কবিতা রচনা কর্‌তে হ'লে কবির খুব তীক্ষ্ণ ধ্বনিবোধ এবং নিপুণ শিল্পপ্রতিভা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এত সূক্ষ্ম বিচার অনেক সময়ই কাব্যরচনার পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই ছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যা খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হ'লেও এ ছন্দের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে এবং এর সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্প-পরিসর ব'লে মনে হয় না। তাই স্বর-মাত্রিক ছন্দটিকেও বাংলা ছন্দের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী ব'লে গণ্য করেছি।

৪

বাংলা ছন্দের যে চার ধারার কথা উল্লেখ কর্‌লুম এবার দৃষ্টান্তযোগে তাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করা যাক্।—

।। ।। ॥ ॥ ।। ।। ॥
(১) আহা আহা। চীৎকার ॥ করি রঘু। নাথ
ঝাঁপায়ে প। ড়িল জলে ॥ বাড়ায়ে দু। হাত।
আগ্রহে। যেন তার ॥ প্রাণমন। কায়
একখানি। বাহু হ'য়ে ॥ ধরিবারে। যায়!

—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এছন্দটির unit বা ব্যষ্টি সিলেব্‌ল্ বা স্বর নয় ; সুতরাং এটিকে syllabic বা স্বরবৃত্ত ছন্দ বল্‌তে পারিনে। এর unit হচ্ছে মাত্রা বা *mora* অতএব এ ছন্দটিকে বল্‌ব মাত্রাবৃত্ত বা quantitative ছন্দ। কেননা মাত্রা বা *mora* হচ্ছে ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-রই unit ; আর এ ছন্দটিকে ধ্বনির পরিমাণ বা quantity-র উপরেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে যে, এখানে অযুগ্মধ্বনিকে

এক unit বা *mora* ব'লে ধরা হয়েছে আর যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয়েছে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই মাত্রা বা *mora*। অযুগ্মদণ্ডের দ্বারা একমাত্রিক অযুগ্মধ্বনি আর যুগ্মদণ্ডের দ্বারা দ্বিমাত্রিক যুগ্মধ্বনি নির্দ্দেশ করা গেল। এ দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তি পর্ব্বে চার মাত্রা বা *mora* রয়েছে, তাই এ ছন্দের পূর্ণতর পরিচয়সূচক নাম হচ্ছে চতুর্মাত্র-পর্ব্বিক ছন্দ। চতুর্মাত্র-পর্ব্বিক ছন্দের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আমাদের। ছোটনদী ॥ চলে বাঁকে। বাঁকে,
বৈশাখ। মাসে তার ॥ হাঁটুজল। থাকে।

* * * *

দুই কূলে। বনে বনে ॥ প'ড়ে যায়। সাড়া,
বরষার। উৎসবে ॥ জেগে উঠে। পাড়া।

—ছোটনদী, সহজপাঠ ১ম ভাগ, রবীন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্ত দুটিতে চীৎকার, আগ্রহে, বৈশাখ, এবং উৎসবে এই চারটি শব্দেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতিটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিতেই সমস্ত বাংলা ছন্দেরই বিশেষ প্রকাশটি ধরা দেয়। এবার বাংলা ছন্দের দ্বিতীয় ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

| | | | | | | | | | | | | |
(২) পাষাণ-গাঁথা। প্রাসাদ-'পরে ॥ আছেন ভাগ্য-। মন্ত,
মেহাগিনির। মঞ্চ জুড়ি' ॥ পঞ্চ হাজার। গ্রন্থ ;
সোনার জলে। দাগ পড়ে না, ॥ খোলে না কেউ। পাতা ;
আস্বাদিত। মধু যেমন ॥ যূথী অনা-। ঘ্রাতা।

—যথাস্থান, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে সিলেব্‌ল্ বা স্বর ; সুতরাং এটিকে বল্‌ব স্বরবৃত্ত বা syllabic ছন্দ। এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে চারটি ক'রে স্বর আছে ; তাই চতুঃস্বর-পর্ব্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ বল্‌লেই এটির পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হয়। লক্ষ্য করার বিষয় এ দৃষ্টান্তটিতে অযুগ্ম-যুগ্ম-ভেদে ধ্বনি অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এর মাত্রা বা quantity-র মুখ্যত কোনো পরিমাপ করা হয়নি। তাই এছন্দকে মাত্রিক বা quantitative ব'লে নির্দ্দেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবার বাংলা ছন্দের তৃতীয় ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

‖ | | | | | | | | ‖ | |
(৩) প্রাণ দিয়ে,। দুঃখ স'য়ে ॥ আপনার হাতে
সংগ্রাম ক-। রিতে দাও ॥ ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত। সাধু তব ॥ পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে। গৃহছাড়া ॥ লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।

—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি মাত্রা অর্থাৎ *mora*-ও নয়, স্বর বা syllable-ও নয়। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে এ ছন্দের unit কোথাও syllable, কোথাও *mora*। অযুগ্মধ্বনি সর্ব্বত্রই এক unit বটে ; কিন্তু যুগ্মধ্বনি শব্দের মধ্যে থাক্‌লে এক unit আর শব্দের অন্তে থাক্‌লে দুই unit বা দুই *mora*। তাই এ ছন্দটিকে যৌগিক ছন্দ নামে অভিহিত করেছি ; কারণ এ ছন্দের প্রকৃতি একই শব্দের একাংশে স্বরমূলক বা syllabic এবং অন্যাংশে মাত্রামূলক বা quantitative। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি ; সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে চারটি ক'রে unit বা ব্যষ্টি আছে ; সুতরাং এ ছন্দটিকে চতুর্ব্যষ্টি-পর্ব্বিক যৌগিক ছন্দ বল্‌তে পারি।

এস্থলে একথা বলা দরকার যে, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ বিভিন্ন হ'লেও ছন্দোবন্ধ হিসেবে এগুলি বিভিন্ন নয়। লক্ষ্য কর্‌লেই টের পাওয়া যাবে যে, উপরের সবগুলি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে চোদ্দটি ক'রে unit বা ব্যষ্টি আছে এবং সর্ব্বত্রই আট unit-এর পরে একটি ক'রে ছেদযতি আছে। অর্থাৎ সবগুলি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তি আট এবং ছয় unit-এর দুই পদে বিভক্ত হয়েছে ; আর একথা সকলেই জানে যে, যে-সব ছন্দোবন্ধে পংক্তিগুলি আট এবং ছয় unit-এর দুইভাগে বিভক্ত সে-সব ছন্দোবন্ধেরই নাম পয়ার। সুতরাং উপরের দৃষ্টান্তগুলি ছন্দহিসেবে বিভিন্ন হ'লেও ছন্দোবন্ধ হিসেবে অভিন্ন, কেননা ছন্দোবন্ধ হিসেবে এদের সবগুলিই পয়ার। প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে মাত্রিক (quantitative) পয়ার, দ্বিতীয়টি স্বরবৃত্ত (syllabic) পয়ার আর তৃতীয়টি যৌগিক (mixed) পয়ার। ছন্দ নির্ভর করে ধ্বনির unit-এর প্রকৃতির উপর ; আর ছন্দোবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় ওই unit-এর সমাবেশ প্রণালী অর্থাৎ পর্ব্ব ও পদবিভাগ-প্রণালীর উপর।

এবার বাংলা ছন্দের চতুর্থ ধারার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(৪) তুহিন-লীন। কোন্ মুনির। ছিলাম কোন্। স্বপ্নেতে !
জন্ম মোর। ককোন্ চোখের। টাঙ্কের। সঙ্কেতে !
কোন্ গিরির। হিম-ললাট। ঘাম্‌ল মোর। উদ্ভবে,
কোন্ পরীর। টুট্‌ল হার। কোন্ নাচের। উৎসবে !

—ঝর্ণার গান, বিদায় আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিপর্ব্বে স্বরসংখ্যা (syllables) এবং মাত্রাসংখ্যা (*morae*) যুগপৎ স্থির আছে ; কেননা প্রতি পর্ব্বেই তিনটি ক'রে স্বর বা সিলেব্‌ল্ এবং পাঁচটি ক'রে মাত্রা বা *mora* আছে। তাই এ ছন্দকে স্বর-মাত্রিক (syllabic-quantitative) আখ্যা দেওয়া যায়। এ ছন্দটির বিশেষ পরিচয় দিতে হ'লে বল্‌ব এটি ত্রিস্বর পঞ্চমাত্র-পর্ব্বিক ছন্দ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

হসন্তের পত্র

অশান্ত

বীণা রায়কে চেন? কখনও নাম শুনেছ? একটা বাঙালী ঘরের মেয়ে। কিন্তু এই বাঙালী মেয়েটী একেবারে কবি বায়রণের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বস্‌বার আসন ক'রে নিয়েছেন। কেননা, বায়রণের সম্বন্ধে গল্প আছে, একদিন তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে, তিনি বিখ্যাত হ'য়ে গেছেন। শ্রীমতী বীণা রায়ের অবস্থাও কতকটা ঐ বায়রণের মতো। তবে বায়রণ বিখ্যাত হয়েছিলেন লম্বা লম্বা কবিতা লিখে আর বীণা রায় বিখ্যাত হয়েছেন একটী মাত্র বাক্য লেখার জন্যে। সে বাক্যটী হচ্ছে—"কাহারও তাঁবে রহিব না।"

অবশ্য সৃষ্টি ব্যাপারটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। তাই বাঙালী মেয়ের ঐ রকম একটা কথায় অনেক বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ঘাব্‌ড়ে ও ভেব্‌ড়ে গেছেন এবং তাঁরা একটা ভীষণ হৈ চৈ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ঐ একই কথা যদি কোন বাঙালী মেয়ের মুখ থেকে না শুনে কোন বাঙালী ছেলের মুখ থেকে শুন্‌তেন তবে তাঁরা হয়ত অতটা ঘাব্‌ড়াতেন না, এমন কি কেউ কেউ হয়ত এ-পর্য্যন্ত মনে করতে পারতেন যে, ঐ মনোভাব জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে একটা মস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। আবার ঐ মনোভাবই যদি আমরা কোন ইংরেজ ছেলের মুখ থেকে শুনি তবে তা আমাদের কাছে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা বিসদৃশ বোধ হবে না—এমন কি, হয়ত আমরা কেউ কেউ মনে মনে বল্‌ব—হাঁ, ইংরেজ ছেলের উপযুক্ত কথা বটে। যখন আমরা পড়ি—Britons never shall be slaves, তখন আমাদের উপহাস করবার বা রুষ্ট হবার কথা মোটেই মনে ওঠে না। অথচ ওটা শুধুই "কাহারও তাঁবে রহিব না" এই কথাটারই পদ্য সংস্করণ এবং লেখা ইংরিজি ভাষায়। বীণা রায়ের কথা শুনে আমরা সবাই চম্‌কে উঠেছি কিন্তু ঐ কথাই যদি আমাদের সাম্‌নে এসে গোবর পালোয়ান মোটা গলায় তাঁর বুকের ছাতি ফুলিয়ে, বাহুর বাইসেপস্‌ ও ডেল্‌টয়েড্‌ বেঁকিয়ে বলেন তবে নিশ্চয় আমরা তারিফ ক'রে বল্‌ব—আচ্ছা হ্যায়, ঠিক্‌ হ্যায়—এহি ত মরদানাকা বাত। আবেগে আমাদের মুখ দিয়ে হিন্দি পর্য্যন্ত বেরিয়ে যাবে। তাই বল্‌ছিলাম যে, সৃষ্টি ব্যাপারটাই হচ্ছে আপেক্ষিক।

সে যা হোক্‌, বীণা রায়ের কথা শুনে আমরা ঘাব্‌ড়েই যাই আর চায়ের পেয়ালাতে তুফানই তুলি, বাঙালী কোন মেয়ের মনে যে এই রকমের একটা কথা জেগেছে এবং জেগেছে কেবল তাই-ই নয়, তা যে "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ"র মতোই মর্ম্মতলে আবার মিশিয়ে না

গিয়ে মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে তা শুধু এই-ই প্রমাণ করে যে, বাংলার নারী-সমাজের অন্তরের অন্তরেতে পুরুষের চোখের আড়ালে—অনেক নারীর চোখের আড়ালেও—একটা প্রকাণ্ড ওলোট পালোট হচ্ছে। সে ওলোট পালোটে পুরুষ-সমাজ কি নারী-সমাজ দুয়ের কারোরই কল্যাণ নেই। কেননা, পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার যে-সম্বন্ধ সে-সম্বন্ধ রাম-শ্যাম-হরির মন-গড়া একটা সম্বন্ধ নয়—সে-সম্বন্ধ কেবল একটা রাজনৈতিক বা সামাজিক বা পারিবারিক বা কেবল "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যাঃ" এই সম্বন্ধ নয়—সে-সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষেই আত্মিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। প্রাণ ও আত্মা দিয়ে নর-নারী পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে আছে আজ লক্ষ লক্ষ বছর থেকে—এদের এক থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করবার মন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এবং আবিষ্কৃত হলেই যে সেটা একটা প্রকাণ্ড ঐশ্বর্য্য ব'লে মান্‌তে হবে তাও মনে কর্‌তে পারি নে। কেননা, এই যে মানব-সমাজ এই যে তার সভ্যতা তা রসবন্ত হ'য়ে আছে পুরুষ ও নারীর দুয়ের মিলিত কণ্ঠ-সঙ্গীতে। এটা একটা প্রাণিক ও আধ্যাত্মিক সত্য যে, নারী ছাড়া পুরুষ টিঁক্‌তে পারে না এবং পুরুষ ছাড়া নারী। আমার বিশ্বাস, সব নারীই যদি তারাবাই হ'য়ে পড়ে তবে সব পুরুষই পেলব রায় হ'য়ে উঠ্‌বে। অবশ্য যারা তুড়ী দিয়ে এই জগতটাকে উড়িয়ে দিতে চায় তাদের কথা আমি বল্‌ছিনে। আমি বল্‌ছি তাদের কথা যারা মনে প্রাণে বলে—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

এ-জগতের খেলা হচ্ছে দ্বৈতের খেলা। এ-দ্বৈত হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ পুরুষ ও নারী।

মানুষ মানুষের গায়ে গায়ে আছে ব'লে মানুষ মানুষের অভাব বুঝ্‌তে পারছে না, মানুষ যে মানুষের কত প্রয়োজনের তা সে সজ্ঞানে উপলব্ধি কর্‌তে পারছে না। পুরুষ ও নারী সমাজে নানা ভাবে নানা দিক্‌ দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ পাচ্ছে ব'লে পুরুষ নারীর পক্ষে ও নারী পুরুষের পক্ষে যে কতখানি প্রয়োজন তা তারা সজ্ঞানে বুঝ্‌তে পারছে না। আজ যদি পৃথিবীর সমস্ত পুরুষগুলোকে একত্র ক'রে এদের এক দলকে অতলন্ত মহাসাগরের ওপারে আর অন্য দলকে উক্ত মহাসাগরের এপারে রাখা যায় তবে পুরুষ নারী দুয়ের চোখের দীপ্তিই নিবে যাবে—তখন পুরুষেরা দল বেঁধে দিনরাত সমস্বরে কেবলই গান গাইতে থাক্‌বে—

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত,

> আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
> মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত"

আর নারীরা দলবেঁধে হতাশ হৃদয়ে কতদিন সেই দিকে ছল্ ছল্ চোখে চেয়ে থাক্‌বে—তাদের চোখে পলক পড়বে না। "চিরকুমার সভা"র শেষ ফল কি দাঁড়িয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। "চিরকুমারী সমিতি"রই যে শেষ ফল অন্য রকম দাঁড়াবে তা মনে করবার মতো আজও তেমন কোন কারণ ঘটে নি। আর এতে অবশ্য কুমার-কুমারীদের কোন দোষ দেওয়াও চলে না। মানুষের জীবনে, নর-নারীর জীবনে, কিশোর-কিশোরীদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ ও তার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের এই পৃথিবীটার গায়ে রঙ্ লাগে, তার আকাশ-বাতাসে নেশা জাগে, তার পাখীর গান ফুলের গন্ধ সাঁঝের তারা জ্যোৎস্নার সুর বড় মিষ্টি হ'য়ে ওঠে, তার বসন্তের মায়া শরতের ছায়া বর্ষার বিরহ বড়ই স্বপ্নময় হ'য়ে ওঠে, আর তখন অন্তরীক্ষের কৌতুকপ্রিয় সেই দুষ্টু দেবতাটী তাঁর ফুলধনু হ'তে ফুলশর দিয়ে চারদিকে ফুল ছিটাতে থাকেন—বেচারী কিশোর কিশোরীরা!—তখন কি করবে তারা? তখন সম্ভাব-শতক শূন্য হ'য়ে মিলিয়ে যায়, সুনীতি-দর্পণ পারা-ঝরা অবস্থায় মনো-মন্দিরের এক কোণে প'ড়ে থাকে, মোহ-মুদ্গর নিতান্তই তুলো দিয়ে তৈরী ব'লে মনে হয়—বেচারা কিশোর কিশোরীরা!—তখন তারা কি করবে? তখন সাধ্য কি তাদের প্রাণে প্রাণে নেশা না লাগে, চোখে চোখে অঞ্জন না লাগে, তাদের অন্তরে কার্য্য না জাগে, কণ্ঠে সঙ্গীত না ফোটে, জীবন একটা অনাস্বাদিত মধুর মধুর মধুর রসের মাধুর্য্যে ভ'রে উঠ্‌তে না চায়! তখন প্রহ্লাদের যেমন ক দেখে কৃষ্ণনাম মনে জেগেছিল তেম্‌নি যা দেখে তাতেই কিশোরের মনে পড়ে কিশোরীকে আর কিশোরীর মনে পড়ে কিশোরকে। একখানি ভজন গান, একটা মিষ্টি সুর, একটী মধুর কবিতা, একটু ফুলের গন্ধ, একটা আসন্ন সন্ধ্যা, চাঁদ্‌নী রাত, বরষার রিমিঝিমি সব খানি মনে করিয়ে দেয় কিশোরীকে কিশোর আর কিশোরকে কিশোরী। তারপর অবশেষে একদিন্ ব্যথা-থম্-থম্ হৃদয়ে কিশোর কিশোরীকে বলে—অয়ি আমার জন্ম জন্মান্তরের পথ-চাওয়া প্রেয়সি! আর অশ্রু-ছল্-ছল্ চোখে কিশোরী তার উত্তর দেয়—হে আমার অতীত ও অনাগতের কাণ্ডারী! তার বুড়ি পৃথিবীটার চোখে বুঝি একটু অশ্রু জেগে ওঠে—আনন্দাশ্রু। তার অন্তরে বুঝি একটা বাণী ধ্বনিত হ'তে থাকে—আশীর্ব্বাণী। বুঝি ভাবে সে সার্থক হ'ল—তার এত দিনের স্নেহ মায়া মমতা সফল হ'ল—তার বসন্তের অঙ্গসজ্জা, বর্ষার ব্যাকুলতা, শরতের হাতছানি কৃতার্থ হ'ল—বুঝি ভাবে তার মর্ত্ত্যের লজ্জা এতদিনে অমৃত-লোকের স্পর্শে ঢাকা পড়্‌ল।

কথার স্রোতে কলম ভাসিয়ে একটা অবান্তর বক্তৃতা দিয়ে নেওয়া গেল। মনে রেখো এটা বন্ধুর কাছে বন্ধুর চিঠি। কোন প্রত্নতত্ত্ব-সমিতির সভ্যদের সাম্‌নে গবেষকের গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ পাঠ নয়।

সে যা হোক্, বেচারী বাংলা ভাষায় "কাহারও তাঁবে রহিব না" এই যে কথাটা শুনে আমরা রুষ্ট হয়েছি ঐ কথাটাই যদি সংস্কৃত ক'রে বলি "সর্ব্ব আত্মবশং সুখম্" তবে নিশ্চয় জানি আমাদের সবার চিত্তই ভক্তি গদ্‌গদ হ'য়ে উঠে আমাদের নত মাথা আরও নত ক'রে দেবে। মনে কোরো না যে, ঐ সংস্কৃত বাক্যটী আমি ভট্টিকাব্য থেকে উদ্ধার করেছি। ওটা খাস উপনিষদের কথা।

কিন্তু অশান্ত, মানব-জীবনের ট্র্যাজিডি এ নয় যে মানুষ "কাহারও তাঁবে রহিব না" এই কথা বল্‌তে পেরেছে—আসল ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে এই যে সবাই ও-কথা জীবনে সত্য ক'রে তুল্‌তে পারে না—অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত পারে নি—কোন কোন মানুষ আর কোন কোন মানুষের তাঁবে থাক্‌বেই। কেবল থাক্‌বেই নয় থাক্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব—যেন থাক্‌তে পেলে ধন্য হ'য়ে যায়। ধনীর তাঁবে নির্ধন, পকেটভারীর তাঁবে ইয়ারবক্স, চালাকের তাঁবে বোকা, বুদ্ধিমানের তাঁবে বুদ্ধিহীন, জ্ঞানীর তাঁবে অজ্ঞানী থাক্‌বেই। আমি অতগুলো তালিকা দিলেম বটে এবং ঐ তালিকা আরও বাড়িয়ে অতীব সুদীর্ঘ ক'রে তোলা যায়—কিন্তু সেই সুদীর্ঘ তালিকা একটীমাত্র সংজ্ঞায় পর্য্যবসিত ক'রে বলা যেতে পারে—অর্থাৎ এ-সংসারে অহরহ শক্তিমানের তাঁবে শক্তিহীনেরা থাক্‌বেই। কেবল যে থাক্‌বেই তাই-ই নয় সুযোগ ও সুবিধা পেলেই আবার তারা খোল করতাল বাজিয়ে গান ধ'রে দেবে—

> "আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
> তুমি অবসর মত বাসিও।"

অবশ্য অনেক ভ্যাবাগঙ্গারাম অনেক গডাচড় চন্দ্র রোমানফ্‌দের প্রতি অভিমান ক'রে লেনিনদের নামে দ্বিগুণ উৎসাহে জয় হে জয় হে জয় হে ব'লে তান ধ'রে মনে মনে ভাব্‌তে পারে যে, সত্যি সত্যি তাদের আত্মিক অধীনতার বুঝি অবসান হ'ল। কিন্তু এটা জানা কথা যে, ঢেঁকি যতক্ষণ ঢেঁকি ততক্ষণ তা স্বর্গে গেলেও ধান ভান্‌বে। প্রভেদ বড় জোর এইটুকু হবে, সেখানে এই মর্ত্ত্যবাসিনীদের বদলে তার পিঠে চরণ পড়বে অপ্সরীদের। রামী বামী ক্ষেমীর পরিবর্ত্তে তখন তাকে চরণাঘাত দেবে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা, সুবাহু সুকেশী সুমধ্যা, হেমা সোমা বিদ্যুৎপর্ণারা। এই নব পদকমল-সম্পাতে প্রথম প্রথম বেশ একটু মধুর নেশার আমেজ পাওয়া যেতে পারে বটে, এমন কি নন্দন-কাননের জল হাওয়ায় শরীরটাও দিব্যি চাকচক্যময় হ'য়ে উঠ্‌তে পারে কিন্তু শেষাশেষি দেখা যাবে যে,

আসলে ঢেঁকির তাতে আত্মিক অবস্থার ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার কিছুমাত্র উনিশ বিশ হয় নি। অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে কঠোর তপস্যা ক'রে ঢেঁকি দ্বিজ হ'য়ে উঠে থাকে। আসলে সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্ এ-কথা সত্যি বটে কিন্তু ব্যাবহারিক হিসেবে সর্ব্বং পরবশং যে দুঃখম্, কারোও তাঁবে থাকাটা যে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় দুঃখের, সেটা প্রমাণ করা সহজ নয়। প্রমাণ করা সহজ নয়—কেননা তা সত্য নয়। সত্য নয় যে তার প্রমাণ কৃতদাস-প্রথা রহিত করবার যখন চেষ্টা চল্‌ছিল তখন সেই কৃতদাসদের মধ্য থেকেই একদল উঠেছিল যারা তারস্বরে ঘোষণা করেছিল যে, তারা চমৎকার আছে। দ্বিতীয় নিকোলাস যদি দ্বিতীয় নিকোলাস না হ'য়ে হেন্‌রি ফোর্ড হ'ত তবে লেনিনের দল রাশিয়াতে পাত্তা পেত কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। আজ তুমি আমি ও-পাড়ায় হরিশ চাটুয্যে এ-পাড়ার গজেন বক্‌শী সবাই ব্রিটিশ শাসনে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছি কিন্তু রাজা ভোগ-বিলাস প্রসাদ সিং বাহাদুর, কে সি এস্ আই, জি সি এস্ আই, সি আই ই কে যদি এ-বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করো তবে দেখ্‌বে যে, আমাদের মতের সঙ্গে সে-মতের অনেকখানি গরমিল রয়েছে। আইনের দিক্ থেকে মানুষ মানুষকে আর সব মানুষের সঙ্গে সমান করতে পারে, কিন্তু আত্মার দিক্ থেকে সেটা একেবারে বিলকুল একটা আলাদা ব্যাপার, অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে a different proposition altogether। লেনিন রাশিয়ার শ্রমিকদের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যেরই সুবন্দোবস্ত করতে পারে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা আমোদ-প্রমোদও সহজ লভ্য ক'রে তুলতে পারে কিন্তু তাদের কেমাল পাশা বা সুন্ ইয়াৎ সেন্ ক'রে তুলতে পারে না। সমস্ত দুনিয়ার আজ বল্‌শেভিজ্‌ম্ সোশিয়ালিজ্‌ম্ বা কমিউনিজ্‌ম্ তার জয়-পতাকা উড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু তা—ধর—যুবক ভারতের নয়া কবি বিনয়কুমার সরকারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে পরিবর্ত্তিত করতে পারবে না। বনে বনে চন্দন নেই, গজে গজে মুক্তা নেই—ঘরে ঘরেও রাণা প্রতাপের জন্ম হয় না—যুগে যুগেও কম হয়—দেশে দেশে আরও কম।

আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখি ব'লে মনে কোরো না যে, এখন কল্পনা-সুন্দরী আমার স্কন্ধে ভর করেছেন এবং এই সব কথা আমি তোমাকে কাব্য হিসেবে বল্‌ছি—আমি বল্‌ছি তোমাকে এই সব কথা নিছক তত্ত্ব হিসেবে—ফ্যাক্ট্ হিসেবে অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগতের একটা অতি বাস্তব ব্যাপার হিসেবে। আর এই বাস্তব ব্যাপার যে আজকেই খালি সত্য হ'য়ে আছে তাই নয়, এ গত-কল্যও সত্য হ'য়ে ছিল, আগামী কল্যও সত্য হ'য়ে থাক্‌বে। আসলে এই বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই আদিম কাল থেকে, যতদিন থেকে আমরা

মানুষকে জানি তার পরিবারকে জানি গোষ্ঠীকে জানি সমাজকে জানি —এবং চারিদিক্ দেখে শুনে এ-কথা কিছুতেই মনে করতে পারা যায় না যে, আগামী কাল হঠাৎ এটা ভীষণ রকম অসত্য ও অসম্ভব ও একেবারে একটা অতীতের ব্যাপার হ'য়ে উঠ্‌বে। ওয়েল্‌সের "মিষ্টার ব্লেট্‌স্‌ওয়ার্দ্দি অন্ র‍্যামপোল আইল্যাণ্ড্" পড়েছ? না প'ড়ে থাক্‌লে বইখানা পোড়ো। ভয় পেয়ো না। বইখানা উইলিয়াম ক্লিসোল্ডের জাত-ভাই নয়। অত বড়ও নয় আর ও-রকম বক্তৃতাও নেই এতে। সে যা হোক্, মিষ্টার ব্লেট্‌স্‌ওয়ার্দ্দির সেই র‍্যামপোল আইল্যাণ্ড হোক্ অথবা সিষ্টার ডিমোক্রাসির (ফরাসী মতে ডিমোক্রাসী হচ্ছে স্ত্রী-লিঙ্গ) রিপাবলিক্ ল্যাণ্ড্ই হোক্ এ-দুই দেশেই এ সত্যের সাক্ষাৎ মেলে। তবে র‍্যামপোল আইল্যাণ্ডে এই সত্য একেবারে উলঙ্গ কঙ্কালের রূপে দেখে আমরা শিউরে উঠি আর রিপাব্‌লিক্ ল্যাণ্ডে তারই হ্যাট-ওয়েস্টকোট্-কোট-পরা ভদ্র সংস্করণ দেখে আমাদের আনন্দে রোমহর্ষণ হ'তে থাকে। কিন্তু ভিতরের দিক্ থেকে দেখ্‌লে দেখা যাবে সেই এক কথা—কয়েকটী লোক আর কতকগুলো লোকের উপর মাতব্বরি করছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন হয়? কেন পৃথিবীর কতগুলো লোক —বেশীর ভাগ লোকই বোধ হয় বলা যেতে পারে—আর কতগুলো লোকের তাঁবে থাক্‌তে গররাজি নয়? আর কতগুলো লোকের তাঁবে থেকে তারা অসোয়াস্তিও বোধ করে না, অপমানও অনুভব করে না, বিদ্রোহও ঘোষণা করে না? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গেলে সেটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু শোনাবে—কিন্তু তবুও উত্তরটা দিচ্ছি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বাইরের হাজার চাকচক্য হাজার জুলুম হাজার বড় বড় কথার অন্তরালে এই কথাটাই সত্য হ'য়ে আছে যে, বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষই জীবনের বেশীর ভাগ সময়েই মানুষের সামান্য ধর্ম্মে ধর্ম্মী অর্থাৎ আহার নিদ্রা মৈথুন জীবনের এই তিন ব্যাপার সুচারু সহজ ও সুন্দররূপে হলেই তাদের প্রাণ ও আত্মা তৃপ্ত হয় ও পরিতৃপ্ত থাকে। লক্ষে একজন কি কোটীতে একজন তেমন মানুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় যার অন্তরে আমরা দেখ্‌তে পাই সেই অগ্নি যে-অগ্নি তাকে মানুষের সামান্য ধর্ম্মে সহজ হ'য়ে থাক্‌তে দেয় না— —যে-অগ্নি ঊর্দ্ধ-শিখ হয়ে ক্রমাগত তাকে তার সহজ জীবনে কষ্ট দিতে থাকে—ক্রমাগত তাকে বল্‌তে থাকে—আরাম তোমার এখানে নয়, বিশ্রাম তোমার এখন নয়—হে আত্মবিস্মৃত! তুমি যাত্রী তুমি বীর তুমি যোদ্ধা —হে যাত্রী তুমি যাত্রা কর আমার এই ঊর্দ্ধগামী শিখার আলোকে আলোকে —হে বীর হে যোদ্ধা তুমি গ্রহণ কর ঊর্দ্ধের ঐ আমন্ত্রণকে, আপনার কর ঊর্দ্ধলোকের ঐ সঙ্গীতকে, আপনার সিংহাসনকে স্থায়ী ক'রে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ

ক'রে পাত উর্দ্ধের ঐ জগতে যেখানে দেবদেবীরা হাতে বিজয়-মাল্য ও কণ্ঠে আশীর্ব্বাণী নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন। সেইখানে—সেইখানে তোমার বিশ্রাম, সেইখানে তোমার সুখ শান্তি আরাম। এদেরই পক্ষে মানুষের সহজ জীবনে সুখী হওয়া সহজ নয়। এবং এদেরই অন্তরের ঐ অগ্নি-শিখায় সহজ মানুষের জীবন-মাত্রা কখনও বা আলোকিত হ'য়ে উঠেছে আবার কখনও বা প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। গানে আছে—

"ওমা ডান হাতে তোর খড়্গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ"

এরাও কখনও বা বরাভয় বহন ক'রে এনেছে আবার কখনও বহন ক'রে এনেছে ধ্বংস—কখনও শান্তি আবার কখনও শাস্তি—এদের অন্তরের ঐ অগ্নি-শিখা কখনও ঘরে ঘরে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়েছে কোমল মধুর রাগিণীতে আবার কখনও ঘরে আগুন লাগিয়েছে ঘোর ভৈরব রাগে। সহজ মানুষের সংসারে এদের আবির্ভাব সব সময়ে সহজ মানুষের পক্ষে বড় আরামের হয়নি।

তাই দেখ্‌তে পাই বিশ্বমানবের যে-সভ্যতা সে-সভ্যতা রূপ পেয়েছে উপরের ঐ লোকগুলোর কল্যাণে—পৃথিবীর বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে বিশেষ যা কিছু তা ঘটেছে ঐ মুষ্টিমেয় লোকদের জন্যে। আজ আমরা জোর গলায় প্রচার করছি এবং প্রাণপণে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করছি বটে যে দেশের ইতিহাস মানে হচ্ছে দশের ইতিহাস। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে দশের কোন ইতিহাস নেই—অর্থাৎ সে-ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯৩১ ও খৃষ্টপর ১৯৩১-এ বিশেষ কিছুই তারতম্য পাওয়া যাবে না—সুতরাং তা জানবারও কোন দরকার হবে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে গান ধরেছিলেন—

তোমারি গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমারি রূপে"

মানব-সভ্যতা যদি ঐ মুষ্টিমেয় মানুষদের উদ্দেশ্য ক'রে ঐ গান ধরে কিম্বা বিশাল জনসঙ্ঘ যদি ঐ লাইনটা একটু বদলিয়ে উপরিউক্ত মুষ্টিমেয় মানুষদের লক্ষ্য ক'রে গলা ছেড়ে সমস্বরে তান ধ'রে দেয়—

তোমারি গরবে গর্ব্বিত মোরা রূপবান তব রূপে

তবে তাতে কিছুমাত্র সত্যের অপলাপ করা হবে না। এবং আমাদের অন্তরাত্মাও অন্তরে অন্তরে জানে এ-কথা। তাই মিষ্টার গোমেজ-প্রমুখ আমাদের সুহৃদবৃন্দের যখন ভয় ও ভক্তি উৎপাদন করতে চাই তখন আমরা "জয় ত্রিশ কোটী ভারতবাসীকি জয়" ব'লে চীৎকার করি নে—চীৎকার করি "জয় মহাত্‌মা গান্ধিকি জয়" ব'লে। বঙ্কিম অবশ্য লিখেছিলেন—

"সপ্ত কোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্ত কোটীভুজৈঃ ধৃত খর করবালে"

কিন্তু আমরা জানি যে যত কোটী তরবারীই হোক্ না-কেন তার প্রকৃত মূল্য প্রকাশ পায় তখন যখন তাদের মাথায় থাকে একজন আলেকজান্দার বা একজন জুলিয়াস্ সিজার বা একজন নেপোলিয়ান। আমরা পাঁচ কোটী বাঙালী আজ সম্ভবতঃ বড় জোর পঞ্চাশটী বাঙালীর নাম নিয়ে গর্ব্ব করতে পারি।

আমার এই লম্বা বক্তৃতা শুনে তুমি হয়ত মনে মনে ভাব্‌ছ যে আমি কি বল্‌তে চাচ্ছি—অর্থাৎ what I am driving at। আমি বল্‌তে চাচ্ছি এই কথা যে আমাদের মধ্যে একটা মন আছে ও একটা বন আছে। তাই একটা মনের মানুষ আছে ও একটা বনের মানুষ আছে। এবং আমাদের মধ্যেকার এই বনের মানুষটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বনমানুষ হ'য়ে ওঠে। এবং তখন তার কাছে এই বিরাট্ বিশ্বের পরিসমাপ্তি হয় আহার নিদ্রা ও মৈথুনে। এই থেকেই বাঁচবার জন্যে আমাদের মনের মন্দিরে ক্রমাগত নানা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ক'রে চল্‌তে হয়, নানা উচ্চ আদর্শের ছবি টাঙিয়ে রাখতে হয়। এবং এই সব মন্ত্রেরই একটা প্রধান মন্ত্র হচ্ছে ঐ "কাহারও তাঁবে রহিব না"—অর্থাৎ স্বাধীনতার বাণী, মুক্তির সঙ্গীত, আত্মবশ হবার মন্ত্র। "কাহারও তাঁবে রহিব না" কথাটা খারাপ দেখায় ততক্ষণই যতক্ষণ তা জীবনে সত্য হয়ে ওঠে নি—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তা সত্যি সত্যি সত্য হয়ে ওঠে সেই মুহূর্ত্ত থেকে ওর দীপ্তির আর সীমা থাকে না। এই দীপ্তির গুণে আশেপাশের ক্রোধ জল হ'য়ে পরিণত হয় ভক্তিতে, বিদ্রূপবাণী সুর বদ্‌লে পরিণত হয় চাটুবাক্যে। তাই এই ধরণের বাণী আমরা যতই ভাবি যতই শুনি যতই প্রচার করি ততই মঙ্গল—মানুষের পক্ষে, মানবসভ্যতার পক্ষে। তবেই আমরা সব সময় সজাগ থাক্‌ব যাতে বনের মানুষটা তাঁর শরীর ফুলিয়ে মনের মানুষটার টুঁটি চেপে না ধরে। সম্ভবতঃ "রাজা ও রাণী"রই একটা গানে আছে

"ওই শোন বাঁশি বাজে
মন মাঝে কি বন মাঝে"

কবি যে ও-গান কি মনে ক'রে লিখেছিলেন—কিম্বা আদৌ কিছু মনে ক'রে লিখেছিলেন কি না তা আমরা জানি নে। কিন্তু ঐ মন-মাঝের বাঁশি হচ্ছে মানুষের সভ্যতার বাঁশি—মানুষের চলার পথে এগিয়ে যাবার বাঁশি আর ঐ বনমাঝের বাঁশি হচ্ছে তার ব'সে পড়বার বাঁশি, তার সভ্যতার স্রোতকে থামিয়ে দেবার বাঁশি। মহাত্মা গান্ধি যখন দেশকে ব্রিটিশের শাসন-পাশ থেকে মুক্ত করতে চান তখন আমরা শুনি মনের বাঁশি কিন্তু যখন তিনি বলেন—চল চল সেই গরুর গাড়ীর সরল শান্তিময় যুগে ফিরে চল—তখন আমরা শুনি ঐ বনের বাঁশি। বনের

বাঁশি মিষ্টি হতে পারে—বৈষ্ণব পদাবলীর মতো মিষ্টি হতে পারে—কিম্বা—পদ্মার বুকে নৌকোর মাঝিদের ভাটিয়াল সুরে গান শুনেছ?—স্তব্ধ দুপুর বেলা—ঝাঁঝাঁ করছে রোদ—কোথাও একটি গাছের পাতা নড়ছে না—চারিদিকে কোথাও একটী জন প্রাণী নেই—রৌদ্র কিরণে পারের বালি চিক্ চিক্ করছে, জলে ছোট ছোট ঢেউগুলো চক্ চক্ ক'রে উঠ্‌ছে—একটা বক নিঃশব্দে কোথা থেকে উড়ে এসে জলের কিনারে নামল—মাঝগাঙ দিয়ে একটা নৌকো ভেসে চলেছে—তার দাঁড় ফেলার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ—আর সেই নৌকো থেকে মাঝিদের ভাটিয়াল সুরের গান ভেসে আস্‌ছে—যেন এক মুঠো সাদা কোমল পালক তোমার কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে—সব মিলে ভারি চমৎকার লাগে—যেন রূপকথার রাজ্যের একটা ছোট টুক্‌রো কে ওই দুপুর বেলা সেই পদ্মার বুকে ফেলে গেছে—ফেরবার পথে আবার কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে যাবে!—সে যা হোক্, বনের বাঁশি বৈষ্ণব পদাবলীর মতো মিষ্টি হ'তে পারে—ঐ ভাটিয়াল সুরের মতো মিষ্টি হ'তে পারে—কিন্তু তা কোন হিসেবেই, কোন ক্রমেই, কোন দিক দিয়েই মানুষের সমগ্র জীবন নয়। তরুণ তরুণীর প্রণয়গুঞ্জন কত মিষ্টি কিন্তু তা পুরুষ-নারীর সমগ্র জীবন নয়। মানুষের জীবনকে সহজ সরল করবার ইচ্ছা হচ্ছে ক্লান্ত মন প্রাণের কথা। তুমি আমি বা পাড়ার স্মৃতিরত্ন মশায় ব্যক্তিবিশেষে ক্লান্ত হ'তে পারি, কোন জাতিবিশেষেরও মন ও প্রাণ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হ'তে পারে কিন্তু বিশ্ব-প্রাণ যেদিন ক্লান্ত হ'য়ে উঠ্‌বে সেদিন বিশ্বমানবেরও যে মৃত্যু আরম্ভ হ'য়ে যাবে। আর যতদিন বিশ্ব-প্রাণের স্রোত অব্যাহত থাক্‌বে—যতদিন ঐ 'ডাইনামো' অক্লান্তভাবে চল্‌তে থাক্‌বে ততদিন মানুষের সরল জীবন আশা করা হবে বাতুলতা—আসলে ততদিন বিশ্বমানবের জীবন জটিল হ'তে জটিলতরই হ'য়ে উঠতে বাধ্য। এই জটিলতার মধ্যেই মানুষকে খুঁজতে হবে শৃঙ্খলা। আসলে আসল প্রশ্নটা এ নয় যে কি ক'রে এই জটিলতাকে সরিয়ে দিয়ে মানুষের জীবন সহজ ও সরল ক'রে তোলা যায়—আসল প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে কি ক'রে এই জটিলতাকে অঙ্গীকার ক'রে মানুষের জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করা যায়। জটিল হ'লেই যে অসুস্থ হবে বা অসুন্দর হবে এ-কথা অভিধানে লেখে না।

কিন্তু সে যা হোক্, "কাহারও তাঁবে রহিব না" এ-কথাটা যত বড় স্বাধীনতার বাণীই হোক্ না-কেন, যত বড় নিগূঢ় মুক্তির মন্ত্রই হোক্ না কেন ও-কথার অর্থ কিন্তু কোনদিনই এ নয় যে "কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রহিবে না।" কেননা মানুষের অলৌকিক জীবন একলার জীবন হতে পারে, একটা grand isolation-এর জীবন হ'তে পারে কিন্তু তার

লৌকিক জীবন হচ্ছে সবকে নিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয় "নেতি" "নেতি" ক'রে কিন্তু বস্তু ও বিষয় জ্ঞান লাভ করতে হ'লে "ইতি" "ইতি" চাই। মানুষ যে খালি সামাজিক জীব তাই নয় সে পারিবারিক জীবও বটে। তাই পিতা-পুত্র ভাই-ভগ্নী স্বামী-স্ত্রী মাতা-সন্তান ইত্যাদি সম্বন্ধ মানব-সমাজে থাক্‌বেই। আর এই সব সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা বা অধীনতার কোন কথা নেই কেননা এ-সব সম্বন্ধের জন্ম হয়েছে স্নেহ প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি থেকে। আর এই স্নেহ প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি মানুষের অন্তরের এমন সব অনুভূতি যে অনুভূতির মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই—সুতরাং এ অনুভূতিগুলি তাদের আপন আপন রসের মধ্যেই সার্থক হ'য়ে ওঠে। তাই কোন প্রকৃতিস্থ পিতাই ছেলেকে লালন পালন করেন না ছেলে তার তাঁবেদারী করবে ব'লে। কোন মার্জ্জিত যুবকই এ-কথা মনে করতে পারে না যে স্ত্রীটি তা!র কৃতদাসী। তবে পাঁচ বছরের শিশু যদি পিতার দিকে চেয়ে বলে—"কাহারও তাঁবে রহিব না" তবে সেটা তেমনি হাস্যকর হ'য়ে ওঠে যেমন দুঃখের বিষয় হ'য়ে ওঠে যদি পঁচিশ বছরের যুবক এই জগতের দিকে চেয়ে ও-কথা না বলে। তবে এমন মানুষ ত আছেই যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত পাঁচ বছর বয়েসকে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। তাদের যাবজ্জীবন পরের তাঁবে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

এ সম্বন্ধে তোমাকে পাঁচ দশ পাতা বক্তৃতা দিতে না পারি তা নয় কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল যে এ-পত্রের পত্রাঙ্ক এসে পৌচেছে দশে। সুতরাং Brevity is the soul of wit ইংরিজি এই প্রবচন স্মরণ করবার সময় এসে গেছে। বিশেষতঃ বুদ্ধিমানের কাছে ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সুতরাং আজকের মতো এইখানেই "আমার কথাটী ফুরোলো, নটে গাছটী মুড়োলো" করি। এর পরেও যদি প্রশ্ন কর "কেন রে নটে মুড়োলি?

খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো,
বর্গী এলো দেশে,
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে।

সুর ক'রে এই গান ধরা ছাড়া আর উপায় থক্‌বে না। ইতি

তোমার
হসন্ত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিশ্ব

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে। কি অর্থে এই কথাটি প্রয়োজ্য ভেবে দেখা উচিত। যাঁরা জ্ঞানী পাঠক তাঁরা দেখিয়ে দিতে পারেন কাব্যের কোন উপকরণ দেশ ও কালের অতীত, কোন পদ্ধতি সার্ব্বভৌমিক, কোন লিখন-ভঙ্গী অমর। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে, তার উপাদানের ও উপাদান-সংযোগের চিরন্তন মূল্য যাচাই করা সাধারণ পাঠকের শক্তিতে কুলায় না। সকলেই কিন্তু একটা কথা বোঝেন, কবি হ'তে গেলেই দেশ ও কালের ভেতরে থেকেও তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, কবির কাছে তাঁর দেশ ও কাল উপায় মাত্র। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কাব্য-বস্তু ও কাব্যাবস্থান আমাদের সুপরিচিত না হলেও তাঁরা আমাদের নিতান্ত প্রিয়। তাঁদের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের আপেক্ষিক অজ্ঞানতা আমাদের রস-গ্রহণের মাত্রা হ্রাস করে মনে হয় না। কিন্তু অন্য একটা দিক্ থেকে আমাদের কাছে দেশ ও কালের একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে অন্ততঃ দেখার আনন্দ হয়, যাকে চিনি না তার কাছে সঙ্কোচ বোধ করি, তাকে আপন করতে সময় লাগে, অভ্যস্তকে আমরা সহজে গ্রহণ করি, অনভ্যস্তকে আমরা ভয় করি, পরিহার করি, নচেৎ অনিচ্ছায় গ্রহণ করি। আমাদের কাছে আমাদের দেশ ও কাল বন্ধুর মতনই পরিচিত। অবশ্য জ্ঞানের দ্বারা অপরিচিতও পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে জ্ঞানলাভের জন্য শক্তি খরচ করতে হয়, মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। শক্তির এই 'অপ'-ব্যবহার, এই 'অপ-চয়' সহজ-আনন্দ-উপভোগে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। কারণ, অন্ততঃ পরিমাণের দিক্ থেকে বলা যায় যে, কোন এক বিশেষ অবস্থার পক্ষে মানসিক শক্তি স্থির ও নিত্য। স্থূলভাবে দেখলেই মনে হয় যেন মন একটা বিশেষ ঘটনা-সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ অ-বিভিন্ন শক্তি বিকিরণ করছে। অতএব উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হ'লেও, কবিতা পড়ে আনন্দ-উপভোগের মত সহজ মানসিক কার্য্যের জন্য সাধারণ-পাঠক তার শক্তির মূলধনকে জ্ঞানার্জ্জনের মতন অনিশ্চিত ব্যবসায় খাটাতে অনিচ্ছুক হয়। এই অপচয়ের অনিচ্ছা এবং পূর্ব্ব পরিচিতের সাক্ষাৎ-জনিত সহজ-ভাব ও শক্তি-সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতের অন্য কোন বিশেষ মূল্য নেই। এর বেশী মূল্য যদি নাই রইল, তা হলে দেশ ও কালের অতিরিক্ত ও অতিক্রান্ত বিশ্বের একটি অর্থ হচ্ছে—দেশ ও কালের মধ্যস্থিত সাধারণ মানুষের নিকট

কবির রস-সৃষ্টির সহজ-বোধ্যতা, সহজ-উপভোগ্যতা। বিশ্ব-কবি সর্ব্ব-সাধারণের কবি, সহজ কবি।

জ্ঞানী পাঠকদের বিশ্ব থেকে বহিষ্কৃত করা যায় না। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে দুই মত থাকতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসুর কাছে বিশ্ব-কথাটির অর্থ প্রকাশ পায় তুলনা-মূলক বিচারের ফলে। অর্থাৎ বিশ্বের এই তাৎপর্য্য অর্জ্জন করতে হয়। এমন একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তৈরী করা সম্ভব যার দ্বারা কবির প্রত্যেক কীর্ত্তিকে সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বকালীন রূপসৃষ্টির ধারার সম্পর্কে আনা যেতে পারে। বিনয়াবনত মনে জ্ঞানার্জ্জনের ফলে সাহিত্য-রূপ সম্বন্ধে গোটাকয়েক মূল তথ্য ধরা পড়ে। পৃথিবীর সব বড় কবিই গোটাকয়েক সাধারণ গুণ ও নিয়ম মেনে চলেন। বাস্তবিক পক্ষে নিয়ম নেই, কিন্তু সুবিধার জন্য সাধারণ গুণগুলিকেই নিয়ম বলা হয়। কয়েকটি গুণের উল্লেখ রসিক সমালোচক ক'রে থাকেন, এই যেমন, প্রত্যেক কবি ও আর্টিষ্টের অনুভূতি নিতান্তই গভীর ও সত্য হবে, সেই গভীর ও সত্য অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করতে প্রত্যেকেই সুসমর্থ হবেন, পাঠকের মনে সেই সব অভিজ্ঞতাকে পুনর্জ্জীবিত করতে প্রত্যেকেই পারবেন; অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের মনের ও নিজের মনের সৃষ্ট রূপের একটা মিল থাকবেই থাকবে। অতএব কি রকম ভাবে কাব্যের ও আর্টের সাধারণ নিয়মাবলী আর্টিষ্ট ও কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করছে জ্ঞানী পাঠক তাই দেখবেন। তুলনামূলক বিচার ক'রে সেই প্রকাশকে বোঝবার ও বুঝে আনন্দ পাবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিশ্ব-কথাটির অন্য একটি অর্থ সার্থক হ'তে পারে। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে বিশ্ব-কথাটি যে ইঙ্গিত বহন করে, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, তুলনামূলক বিচার এবং তারই ফলে 'সৎ'-সাহিত্যের চিরন্তন লক্ষণ-নির্দ্ধারণ।

পূর্ব্বেই বলেছি—একমাত্র সুবিধার জন্যই আর্টের সাধারণ লক্ষণ-গুলিকে নিয়ম বলা যেতে পারে। নিয়ম বল্‌লেই আইন-কানুন কিম্বা নীতি, অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের কথা মনে হয়। এই রকম নিয়মে আর্টিষ্টের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয় মনে করা স্বাভাবিক। কে না জানে যে আর্টিষ্টকে, কবিকে কেবলমাত্র ঐতিহ্যের সম্পর্কে এনে তার সৃষ্টিকে বিচার করলে, তার অন্য দিক্‌টা, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তিগত সত্তার দিকটা ফাঁক পড়ে যায়? ঐতিহ্যের এই প্রকার ঐকান্তিক ধারাবাহিকতার ধারণার দ্বারা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও, সে উপায়ে সৃষ্টি-রহস্যের একটি মূল কথা প্রকাশ পায় না। সৎসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলিকে নিয়ম মনে করা সুবিধাজনক ব'লে, এবং তারই ফলে নিয়মের ধারাবাহিকতা আর্টিষ্টের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে অনেক সময় বাধা

দেয় ব'লে, রস-সৃষ্টির ও রসোপভোগের অন্য একটি ঐক্য-বিধায়ক মূল তত্ত্বের সন্ধান করা দরকার। (রবীন্দ্রনাথ সে সন্ধান নিজেই দিয়েছেন)। মূল তত্ত্বটি হ'ল পার্সন্যালিটি। ব্যক্তিত্বের এই সংজ্ঞাটিতে সৃষ্টির ভেতর ও বাইরের প্রধান তথ্যগুলি সূচিত হয়, ভেতরের সৃষ্টি-চাতুর্য্য এবং বাইরের সংসাহিত্যের লক্ষণগুলি। কারণ দেশ ও কালকে যে ঐতিহ্যের ধারা প্রাণবন্ত ক'রে অতিক্রম করে তার মূলেও থাকে পাত্র। পাত্রটি শুধু কোন ব্যক্তি-বিশেষ নয়, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার অন্য গুণ যথেষ্টই রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য-বিকাশের ধারার মধ্যেও এমন অনেক সাধারণ গুণ রয়েছে যাদেরকে ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে পৃথক ক'রে বাহ্য বিষয় ব'লে গণ্য করা অসম্ভব নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিক—কারণ, প্রত্যেক সৎ-পুরুষের কার্য্যই হচ্ছে, নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্ব্বাত্মক ক'রে তোলা। পার্সন্যালিটির প্রধান লক্ষণই এই। (রবীন্দ্রনাথ একেই ক্রিয়েটিভ্ ইয়ুনিটি বলেন।) ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে মৈত্রীভাব রয়েছে। সে বিকাশের গোড়ার কথা এই—বিশেষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সকলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, এবং সেই জন্য ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে। পাঠকের বৈশিষ্ট্য যত বিচিত্রই হোক না কেন, আর্টিষ্টের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে, তাঁর বিকাশ-ধারায় এসে, তাঁর ও অন্যের থেকে নিজের পার্থক্যটুকু হারিয়ে ফেলে, একত্র সম্পূর্ণ হয়। এই ধরণের সম্পূর্ণতাই হ'ল ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা। এক কথায়, আর্টিষ্টের সৃষ্টিতে ছোট আমিটা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হ'য়ে বড় আমিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক পাঠকেরই অভ্যন্তরে, নিজের অজানিত অবস্থায়, এই নতুন সৃষ্টি চলতে থাকে। অতএব এই সৃষ্টি কারুর নিজের সম্পত্তি নয়। তবুও লোকে ভাবে অন্য কথা—কেননা, সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথম অভিজ্ঞতা তার নিজত্বটুকু নিয়ে। যদিও হয়ত কোন সম্পূর্ণ অর্থাৎ সৎপুরুষের সাহায্যে সেই নিজত্বকে লোপ পাওয়ানই তার শেষ অভিজ্ঞতা। কবির ব্যক্তিত্ব সমুদ্র-বিশেষ, তার মধ্যে সকল বিশেষের নদ-নদী সম্পূর্ণ হ'তে পারে। তিনি সৎ-পুরুষ, অতএব তিনি বিশ্বের।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি সাধারণের বেলা এবং রসগ্রাহী জ্ঞানী পাঠকের বেলাতেও খাটে। সত্য কথা এই যে মানুষই মানুষের প্রধান আগ্রহের বস্তু, তার আনন্দের প্রধান উপাদান। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে সম্পূর্ণ ও সার্থক হবার তাগিদ্ রয়েছে—সে জানুক, আর নাই জানুক—যে জানে, সেই তাগিদ সম্বন্ধে যে সচেতন, সেই জ্ঞানী, যে জানে না সেই সাধারণ। সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ হ'তে পারে না, অন্ধ-জীবনস্রোতে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলে। এর জন্য তার বরাবরই একটা ক্ষোভ থেকে

যায়। সে ক্ষোভ যখন ঈর্ষাতে পরিণত না হয়, তখনই কোন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশা মেটায়, ক্ষতিপূরণ করে। এটা হয়ত বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, কিন্তু বুদ্ধি-নামক ইন্দ্রিয়টা সকলের থাকে না, যাদের থাকে তারা আর্টিষ্টের অসম্পূর্ণতা দেখাতেই ব্যস্ত। যাঁদের বুদ্ধি মার্জ্জিত, তাঁরা সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ করতেই ব্যস্ত। নিজের আশা মেটান, অর্থাৎ নিজের অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ করা অন্ততঃ বহির্মুখী স্বভাবের রীতি। যাঁরা অন্তর্মুখী তাঁরা একটি মহান্ ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধা-সহকারে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। উভয় ক্ষেত্রেই পাত্রের বিশেষত্বটুকু বড় আধারের আশ্রয়ে সার্থক হয়। অতএব এই একীকরণ শুধু দেশ, কালের বাইরে নয়, পাত্রেরও বাইরে। আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব যদি সাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের তাগিদ কিম্বা ক্ষোভ মেটায়, তার মধ্যে প্রকাশ ক'রেই হোক, কিম্বা তাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রেই হোক, তাঁর সৃষ্টি যদি আমাদের সুপ্ত সৃজনী-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে, তা হ'লে সেই আর্টিষ্টকে বিশ্ব-কবি নাম ছাড়া অন্য নাম দেওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব-বিকাশই হ'ল বিশ্বের মর্ম্মকথা।

অবশ্য একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতিভাশালী ব্যক্তির পার্থক্য অনেক। সাধারণের আধার ছোট, তার প্রেরণা দুর্ব্বল, তার তাগিদের জোর কম। কিন্তু কোথায় যেন একটা গভীর মিল থাকেই থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে, যে জীবনী-শক্তির লীলা সকলের মধ্যেই চলছে, সেই জীবনী-শক্তিরই অভিব্যক্তি পুনরাবৃত্ত হয়—তবে দ্রুততর ভাবে, সংক্ষেপে, অথচ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। প্রত্যেক জীবেরই জীবনে তার শ্রেণীগত ইতিহাসের পুনরভিনয় হয়। যে সব জীবের জন্য শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হয়, তার মধ্যে জীবনী-শক্তি চৌদুনে চলে। মনে হয়, যেন জীবনের তাল ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে, সুর ও লয় ভ্রষ্ট হয়েছে, নতুন কিছু সংসাধিত হচ্ছে। মানসিক জগতেও এই নিয়মের বড় বেশী ব্যতিক্রম হয় না। মনের ইতিহাসে সাধারণ মানুষ এখনও যৌবনে, অর্থাৎ সভ্যতার স্তরে পদার্পণ করে নি। এখন যদি দেখি, কোন মানুষের সৃষ্টিতে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গে সভ্যতার রাজটিকা পরান, শুধু তাই নয়, মনের ভবিষ্যৎ গতির একাধিক ইঙ্গিত তাঁর প্রত্যেক কর্ম্মে ও চিন্তায় নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে, তখনই সে মানুষের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি জুড়ে দিতে পারি। কেননা, মানসিক বিবর্ত্তন ঘটছে, এবং ঘটছে ব'লেই সেটি কোন বিশেষ যুগের ও দেশের সম্পত্তি নয়; কেননা স্থান ও কাল সেই বিবর্ত্তন বোঝবার সুবিধাজনক সঙ্কেত মাত্র। এই মানসিক বিবর্ত্তনের গতিকে নিজের আধারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করান, কিম্বা তার শক্তিতে শক্তিমান হওয়া যদি প্রত্যেক পাত্রের চরম

সার্থকতা হয়, তা হ'লে স্বাতন্ত্র্য হ'য়ে ওঠে বিশ্বজনীন। এবং যে ব্যক্তির
মধ্য দিয়ে এই গতি সুন্দরভাবে, অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হচ্ছে, তিনি হ'য়ে
ওঠেন বিশ্ব-মানব।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে
প্রত্যেকেই, দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে, নিজের বিকাশমর্ম্ম উপলব্ধি করতে
পারে। এতে নিজের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না, নিজের শক্তির অপচয় হয় না,
সে বিশেষ শক্তি সার্থক, সম্পূর্ণ ও সঞ্চিত হয়। প্রত্যেকের বিশেষত্ব তাঁর
বিশেষত্বের মধ্যে, তাঁর বিরাট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সঞ্জীবিত হ'য়ে শতদলের
মতন ফুটে উঠতে পারে। প্রত্যেকের স্বভাব তাঁর সৃষ্টিতে চরিতার্থ হয়।
স্বভাব কথাটির দুটি অর্থ আছে—একটি, মাত্র প্রকৃতির দান, যেটি স্বাতন্ত্র্যের
ভিত্তি, অন্যটি সেই দানেরই সার্থক মূর্ত্তি, পরিপূর্ণতা, সেই ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমারৎ। এ দুটি অর্থ যেখানে এক হ'য়ে যায় সেইখানেই
সার্ব্বজনীন পরিমাণ, সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়। (যেমন
য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের পরিমাণ, পরিণতি
ও উন্নতি সূচিত হয়েছিল রোমান জুরিষ্টদের সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মের
মধ্যে।) সেই ভাবে যদি আমাদের দেশাত্মবোধ তাঁর বিশ্ববোধে পরিণত
হয়, তা হ'লে তিনি কেবল আমাদের দেশের নন্, সকল দেশের। যদি
বর্ত্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি তাঁর চিন্তায় ও কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট হয়, তা হ'লে
তিনি ভবিষ্যৎকালের, অর্থাৎ বর্ত্তমানের সম্পর্কে সকল কালের। যদি তাঁর
রচনার মধ্যে আমাদের দেশের ও অন্য দেশের রস-সৃষ্টির ধারার প্রধান
প্রধান পর্য্যায়গুলি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, সেই ধারার ভবিষ্যৎ গতি ইঙ্গিত করে,
তা হ'লে তিনি কেবল আমাদের ও অন্যদের দেশের ঐতিহ্যে আবদ্ধ নন্—
তিনি হন, সৎ-সাহিত্যিক, অর্থাৎ বিশ্ব-সাহিত্যিক। যদি তাঁর সঙ্গীত-
রচনায় আমার সঙ্গীত-প্রিয়তার, আমাদের ও অন্যদেশের সঙ্গীত-
পদ্ধতির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তা হ'লে তিনি শুধু আমাদেরও নন,
তাঁহাদেরও নন্, তিনি বিশ্বের। যদি তাঁর কাজের মধ্যে জীবনের সার-
ধর্ম্ম অনুসৃত হচ্ছে দেখতে পাই, তা হ'লে তিনি সর্ব্ব-জীবনের। যদি তাঁর
মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের নিকর্ষ-সাধন হচ্ছে
মনে হয়, তা হ'লে তিনি সর্ব্ব-সাধারণের।

এই রস-সৃষ্টিধারার, এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের, এই জীবন-ধর্ম্মের
পুনরাবৃত্তির দিক থেকে তাঁকে আমি বিশ্ব-কবি বলি। লোকেও তাই বলে।
অতএব এই আখ্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়ান, সে
দায়িত্ব-জ্ঞান দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হ'তে
দেওয়া, এইটাই হ'ল প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান। নামকরণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড

দায়িত্ব লুকান থাকে। সে সম্বন্ধে সচেতন হ'লে নামধারীর প্রতি প্রকৃত
শ্রদ্ধা দেখান হয়। তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করেছেন, এখনও করবেন—তাঁর
দায়িত্ব তাঁর নিজের প্রতি। তাঁর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই
বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। লিখে, চিন্তা ক'রেই তিনি ক্ষান্ত, আমাদের
সাধনার কিন্তু অবসান নেই। রস-সৃষ্টি ক'রে তিনি হন সারা, মোদের কিন্তু
এই হ'ল সুরু।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গল্পগুলো শুনে পাঠক বুঝতেই পারছেন যে ছেলেবেলায় আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা একটু বিশেষ গোলমেলে রকমের হয়েছিল। প্রথম ইংরেজী শিখে একেবারে রাতারাতি সুসভ্য হওয়ার যে উৎসাহ দেশে জেগে উঠেছিল, সেটা আমাদের সময়ে অনেকটা মন্দা প'ড়ে গিয়েছিল। আগে যেটা হয়েছিল সেটা বান ডাকার মত। আমাদের সময় যা ছিল সেটা যেন নিত্যকার জোয়ার ভাঁটা। তার থেকে একটা উদ্দীপনা, মাদকতা সঞ্চয় করা বড় শক্ত কাজ। অথচ বাঙ্গালীর প্রাণ উদ্দাম আবেগের জন্য অপেক্ষা ক'রেই আছে। যাক্, নিজের কি হয়েছিল বলি, তাহ'লেই অবস্থাটা সবাই বুঝ্‌তে পারবেন। বাড়ীতে ঘটা ক'রে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান হ'ত না। বাবা একেশ্বরবাদী ছিলেন কিন্তু ভগবান্‌কে কখন ডাকতেন তা আমরা জানতেও পারতাম না। মা পূজা আহ্নিক করতেন কিন্তু আমাদের অগোচরে। ঠাকুরঘর ব'লে পদার্থ টা ত বাড়ীতে ছিলই না। আমাদিকে কেউ নিত্য উপাসনা করতে উপদেশ দেন নি, বরং একথা বারবার শুনতাম যে, নিয়মিত লেখাপড়া ও শরীর চর্চ্চা করাটাই বিদ্যার্থীর যথার্থ উপাসনা। এ অবস্থায় আমাদের একের নম্বর কালপাহাড় হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা ঠিক হ'ল না। বিখ্যাত ব্রাহ্ম আচার্য্যেরা কুচবেহারে এলে বাড়ীতে উপাসনা হ'ত আর আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকার আদেশ ছিল। খুব ছেলেবেলায় দুই-একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও উপাসনা করেছিলেন। এতদিনের কথা, কিন্তু তবু তাঁর সৌম্য সুন্দর চেহারা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তন্ময় ভাব এখনও যেন চোখের সামনে রয়েছে। বড় বড় উৎসবের সময় বাবা সমাজে নিয়ে যেতেন। ভালই লাগত, যদিও কতকটা spectacular (ধুমধাম) হিসেবে। ভক্তি চর্চ্চার দিক থেকে যাত্রার ধ্রুব প্রহ্লাদ ঢের বেশী ভাল লাগত। যাত্রা যত ইচ্ছা শুনতে পেতাম, কিন্তু কীর্ত্তন শোনার বিষয়ে কোনও উৎসাহ কেউ দিতেন না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার কথা একরকম taboo (নিষিদ্ধ) ছিল। একদিনকার কথা মনে আছে, কলিকাতা থেকে এক সুগায়ক এসেছিলেন, মজলিশ ক'রে সবাই গান শুনতে বসেছিলেন, বড় ভাল লাগছিল। হঠাৎ তিনি গান ধরলেন, "এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজায়ে বাঁশরী"। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেলাম। সংস্কার এই রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দশ বছর আগে হ'লে হয়ত সুরুচি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা ক'রে ফেলতাম, কিন্তু আমাদের মনে অত জোর আগুন

ছিল না। এ সব শিক্ষা সংস্কার সত্ত্বেও অকালে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কবলে কি ক'রে প'ড়ে গেলাম সেইটেই আশ্চর্য্য। কিন্তু আমাদের দোষ খুব বেশী ছিল তা বল্‌তে পারি না।

আগেই জানিয়েছি যে, একটা অব্যক্ত রকমের জাতীয় গৌরব শিশুকাল থেকে মনে জেগে উঠেছিল, সেটার জোর মুক্তি-পিপাসার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। সেই সামান্য অস্পষ্ট আগুনের ফিন্‌কি একদিন ভীষণ দাবানল হ'য়ে কৈলাসে বুড়ো শিবের জটা গলিয়ে দেশের সপ্তসিন্ধুকে বানে ভাসাবে তা তখন কে জানত? একটা বিষয়ে আমাদের মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। এই ঋষিতুল্য কেশবচন্দ্র, যিনি একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে দেন, তাঁর সমাজ-মন্দির খৃষ্টানি গির্জ্জের মত কেন গড়া হ'ল, ভেতরের পূজা-পদ্ধতিই বা মোটামুটি খৃষ্টানি চালের কেন করা হ'ল? মহর্ষির "খৃষ্ট বিভীষিকার" কথা তখন জানতাম না, কিন্তু জিনিসটা ঠিক হজম হ'ল না। কেশববাবুর Band of Hope (মদ্যপান নিবারণী সভা) নিয়ে কিছুদিন খুব খেটেছিলাম। আমাদের খাটা ত হুজুগ বিশেষ, তার কিছু মূল্য হয়ত ছিল না। তবে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমরা টাকা ও প্রতিজ্ঞাপত্রে সই জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু শেষে দেখলাম সব মিছে, সব ভুয়ো। আমাদের সভার যিনি অধ্যক্ষ, যাঁরা আমাদের সহায়, তাঁদেরই অভ্যাস দোষ সব চেয়ে বেশী। এ অবস্থায় আমাদের ছেলে-ছোকরার উৎসাহই বা থাকে কি ক'রে? ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদের কেউ কেউ আমাদের বড় ভালবাসতেন। তার মধ্যে নববিধানের মহাজ্ঞানী গৌরগোবিন্দবাবু ও সাধারণ সমাজের ভক্ত নবদ্বীপ দাস মহাশয় দুজনের নাম করব। এঁদের দুজনের কাছে শিখেছিলামও অনেক। কিন্তু কই, এঁরা ত এঁদের সমাজের অনাচারী সাহেবদের কিছু বলতেন না। এই সব পাঁচ রকমে মন বড় বিগড়ে গিয়েছিল। একজন ভক্ত কর্ম্মীর কথা কিন্তু মনে আছে, যিনি তখন আমাদের মন একেবারে কিনে নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রামকুমার। কুচবেহারে এসেছিলেন গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর বেশে। আসামের চা-বাগানে তখনকার দিনে কুলিদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হ'ত। পণ্ডিত মহাশয় বাগানে বাগানে ঘুরে সব খবর জেনে কুলিকাহিনী ব'লে এক গল্পের বই লিখেছিলেন। সেই বই থেকেই বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ এই অত্যাচারের কথা প্রথম সব জানতে পারলে। পূজনীয় পণ্ডিত যতদিন কুচবেহারে ছিলেন, আমরা দলবেঁধে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খুব ঘুরলাম আর কত গল্পই তাঁর কাছে শুনলাম। শুনে মনে ইংরেজ জাতের উপর শ্রদ্ধা ভালবাসা বাড়ে নি সেটা নিশ্চিত।

কয়েক বছর পরে যখন বিলেত যাই তখন আমার ক্যাবিন-সঙ্গীদের মধ্যে Adam ব'লে একজন চা-বাগানের সাহেব ছিল। আমি একে নেটিব তায় বালক, এক কামরায় থাকা সত্ত্বেও সে আমার দিকে চেয়েও দেখত না। কিন্তু একদিন সে আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে এল। আমি ছিলাম নিতান্ত ভালমানুষ, খুব রাগ না হ'লে গায়ের muscle-গুলো শক্তও হ'ত না। আমাকে দড়াম ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল, "তুমি নাকি সিবিল্ সার্বিস্ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ? কি দরকার এত কষ্ট করার, তোমরা ত মাসিক দুশো টাকা হ'লেই রাজার হালে থাকতে পার।" আমি ছেলে মানুষ কি বা জবাব দেব, কিন্তু মা সরস্বতী জিবের ডগায় এসে জবাব দিলেন, "দেখি চেষ্টা ক'রে, যদি ইংরেজ একটারও এদেশে আসা বন্ধ করতে পারিত কষ্ট সার্থক হবে।" সাহেবটা একবার দুবার "ঘোঁক্" ক'রে উঠে গেল। তার পর আর সারা পথ আমায় জ্বালায় নি। কিন্তু এই ঘটনার এক মজার ফল হ'ল। আমার আর এক ক্যাবিন-সঙ্গী ছিল, তার নাম Stewart, সে সওয়ার পলটনের কাপ্তান। পয়সার অভাব, তাই স্ত্রী ছেলেকে উপর কেলাসে দিয়ে নিজে সেকেণ্ড কেলাসে যাচ্ছিল। সেও কোন দিন আমার দিকে ফিরে চায় নি, কিন্তু যখন Adam ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে গেল, তখন সে হেসে আমার কাছে এসে বসল আর "গুড্ মর্ণিং" ব'লে গল্প জুড়ে দিলে। শেষে বল্‌লে, "আমি তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় খুসী হয়েছি, you are a boy of the right sort (তুমি ছেলের মত ছেলে)।" আমি একটু কাঁচুমাচু হ'য়ে তাকে বল্‌লাম যে, "আমি নিরীহ ছেলে, সাত চড়ে রা বেরোয় না, কিন্তু চা-বাগানের সাহেব আমি বরদাস্ত করতে পারি না; আসামের কোলের কাছে মানুষ হয়েছি, সেখানকার জুলুম অত্যাচারের কথা কোনদিন্ ভুলতে পারিনি।" কুলিকাহিনীর এক-আধটা গল্পও বল্‌লাম, কিন্তু কাপ্তান বিশ্বাস করলে না, বল্‌লে, "না না, এ হতেই পারে না, তোমায় কেউ বোকা বুঝিয়েছে।" বাকী যে কদিন জাহাজে ছিলাম, এই সাহেব আমায় অনেক যত্ন করেছিল, তার স্ত্রী বিলেতে তাঁদের বাড়ীতে যেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। আমি সে নিমন্ত্রণ নানা কারণে রক্ষা করতে পারি নি। কিন্তু এই ব্যাপারে মোটামুটি বুঝে নিলাম যে, ইংরেজ জাতের কাছে সোজা কথার খুব কদর। পরে ইংরেজের সঙ্গে অনেক কারবার করেছি কিন্তু এ বিষয়ে আমার ধারণা কায়েম আছে।

চা-বাগানের সম্বন্ধে আমায় কেউ যে বোকা বোঝায় নি সেটা পরে ভাল ক'রেই জানতে পেরেছিলাম। বিলেতে আমি অধিকাংশ সময় ঘর ভাড়া ক'রে থাকতাম। আর আমার অভ্যাসদোষে আমার ঘরে

আড্ডাও জমত খুব। এই ধরণের আড্ডাতে সচরাচর যে রকম তর্ক-বিতর্ক হ'য়ে থাকে আমার ঘরেও সেই রকম হ'ত। শুধু একটা কথা উল্লেখযোগ্য। আমাদের তর্কের বিষয় ছিল সব সময়েই এক, রাষ্ট্রনীতি ও ভারতের ভবিষ্যৎ। কাজেই আমরা খুব গরম হ'য়ে উঠতাম। একদিন জোর গলায় এই গবেষণা চলছে, এমন সময় বাড়ীর ঝিটা এক চিঠি নিয়ে এল, তাতে লেখা আছে, "আমার স্ত্রীর বড় কঠিন অসুখ, মরণাপন্ন অবস্থা, আপনারা যদি একটু আস্তে কথাবার্ত্তা চালান ত বড় উপকৃত হই।" নীচে একটা ইংরেজের সই। সই দেখে আমাদের বীর রক্ত ধমনীতে নেচে উঠল, একজন প্রস্তাব করলেন, "লিখে দে, আমাদের বয়ে গেল।" শেষ পর্য্যন্ত কতদূর বাঁদরামি ক'রে তুলতাম জানি না কিন্তু এক সাহেব সশরীরে এসে ঘরে উপস্থিত হ'ল। কথায় বোঝা গেল সেই চিঠি দিয়েছে। সে বল্‌লে, "আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমার স্ত্রীকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে। আপনাদের কথাবার্ত্তায় ব্যাঘাত করলাম, কিছু মনে করবেন না।" আমাদের রাগ প'ড়ে গেল। ভদ্রলোক ব'সে একটু গল্পস্বল্প ক'রে বেরিয়ে গেল। তার দু-চার কথাতেই মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। আমরা ভারতবাসী, একথা জেনে সে বল্‌লে, "আমিও ভারতবর্ষে পনের বছর ছিলাম। যে অত্যাচার অনাচার করেছি, আজ তার ফল পাচ্ছি। আমাদের রাজত্ব এই পাপে ধ্বংস না হ'লে হয়।" লোকটী উপর-তলার ভাড়াটে ছিল। এই আলাপের পর, তার স্ত্রী ফিরে আসা পর্য্যন্ত কদিন প্রায়ই আমার ঘরে এসে গল্প করত। একটা কথা আমায় বিঁধে বিঁধে বার বার বল্‌ত, "তোমাদের দেশের লোক সহায় না হ'লে এত পাপ চলতে পারত না।" কথাটা একশোবার ঠিক। পাপ আমাদের, ভোগ আমাদের, অন্যলোক নিমিত্ত মাত্র।

ভদ্রলোক আসামে চা-বাগানের সাহেব ছিল। পনের বছর অশেষ অনাচার ক'রে, হায়রান হ'য়ে, দেশে পালিয়ে এসে বিয়ে থা ক'রে সবে বছর খানেক বাস করেছে। সদাই তার ভয় যে, তার পূর্ব্বজীবনের সঞ্চিত ভোগ কবে তার ঘাড়ে এসে চাপে, আর তার নূতন সংসার চূরমার ক'রে দেয়। ভারতবর্ষে তার পরেপরে তিনটী স্ত্রী (?) ছিল। প্রথম দুটীকে চা-বাগানেই বিনা আয়াসে সঞ্চয় করেছিল, আর তেমনি নির্ব্বিবাদে তালাক দিয়েছিল, দু-চার মাস রেখে। শেষেরটী পাহাড়ের এক কনভেন্ট্ ইস্কুল থেকে রপ্তানি। কিছু লেখা-পড়া আগেই জানত, সাহেব তাকে গ'ড়ে-পিটে, শিখিয়ে বুঝিয়ে সহধর্ম্মিণী না হোক্ সহকর্ম্মিণী ক'রে নিয়েছিলেন। মেয়েটী আমাদের বাঙ্গালী, পাঁচ বছর সে বাটীতে গৃহিণীপনা করেছিল। তাকে সাহেব ভাল বাসতেন ব'লে দেশে ফেরবার

সময় মাঠে ছেড়ে না দিয়ে নিজের খানসামার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষ প্রশ্নের এক রকম সমাধান ক'রে এসেছিলেন। এই মেয়েটী একবার সাহেবের প্রাণ কি ক'রে বাঁচিয়েছিল সে গল্প শুনলাম। বাগানে দুটী কুলি-মেয়ে ছিল, তারা বাঁকুড়া জেলার চাষী-কন্যা। বড়টী দিন কয়েক সাহেবের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল, কিন্তু ছোটটীকে সাহেব কোন মতেই দখল করতে পারেন নি। তার দিদি তাকে সর্ব্বদা বাঘিনীর মত আগলে থাকত। দূত দূতী কেউ তার কুঁড়ের কাছে এগোতে সাহস পেত না। সাহেব বল্‌লে যে, হয়ত এই ছোট বোনটীকে বাঁচাবার জন্যই দিদি অত সহজে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল। একথা যদি সত্য হয় ত, মেয়েটী শিবি দধীচির দলের লোক। পাঠক তাকে মনে ক'রে একটী অতি ছোট নমস্কারও করবেন। সাহেবের তখন জোয়ান বয়স, উদ্দাম প্রবৃত্তি, বাধা পেয়ে দুই বোনের সর্ব্বনাশ করবেন স্থির করলেন। কিন্তু জিনিসটা আপাততঃ চাপা পড়ল, কারণ অল্পদিন পরেই সাহেব দার্জ্জিলিঙ্গ বেড়াতে গিয়ে সেখানকার ইস্কুল থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষ সংসার সংগ্রহ ক'রে আনলেন। কিছুদিন পুরানো প্রেম, প্রতিহিংসা, সবই ভুলে রহিলেন নূতনের নেশায়। তারপর একদিন তাঁর বাড়ীতে এক ক্ষুদে হাকীম সাহেব এসে অতিথি হ'লেন। হাকীমরা তখনকার দিনে চা-কর সাহেব-দের কুঠীতেই ডেরা নিতেন। চা বাগানে অতিথিসৎকারের একটা নিয়ম ছিল। অন্যত্র একেবারে ছিল না তাও আমি বল্‌তে প্রস্তুত নই। সেই নিয়মমত, অতিথি এলে তাঁকে সে রাত্রের জন্য একটা গান্ধর্ব্ব কি আসুর বিবাহ দিতে হ'ত। সাহেবের প্রতিহিংসার সুযোগ মিলল। বাগানের ডাক্তারবাবুকে ডেকে বল্‌লেন, "ডাক্তার, জমাদারকে নিয়ে যাও, যেমন ক'রে হোক্ আজ খানার পর সেই কুলি-মেয়েটাকে আনাই চাই।" সাহেবের হুকুম তামিল হ'ল। সকালবেলা সর্ব্বদেবময় অতিথিকে বিদায় দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বাগান তদারক করতে বের হলেন। দেখলেন যে, হাওয়ায় কেমন একটা থম্‌থমে ভাব। কুলিরা যে যার কাজ করছে কিন্তু কারও মুখে হাসিঠাট্টা কথাবার্ত্তা কিছু নেই। সেই বোন দুটী এক জায়গায় কোদাল্ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেরই চোখ লাল, যেন গাঁজা খেয়েছে। সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় বড়টাকে রসিকতা ক'রে বল্‌লেন, "কি রে, বোন কি বলে?" তার পা কোদালের ফালের উপরই ছিল। একটানে হাতলটা বের ক'রে নিয়ে মারলে সাহেবের রগের উপর এক ঘা। সাহেব অজ্ঞান হ'য়ে ভূঁইয়ে প'ড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলেন যে কুঠীর বারান্দায় প'ড়ে আছেন আর চারিদিকে দু-তিনশো কুলি গর্জ্জন করছে আর ইট ছুঁড়ছে। বাগানের জমাদার

সাহেব বারান্দার কোণে জড়সড় হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। ডাক্তারবাবু চেঁচিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছেন। আর তাঁর স্ত্রী তাঁর দেহের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তাঁকে আগলে, একটা দোনলা বন্দুক মেরে মেরে কুলিদের তফাৎ করছে। ডাক্তারবাবু জানালেন যে, এই সব বেয়াড়া হারামজাদাদের সাজা দেওয়ার জন্য তিনি পাশের বাগানের সাহেবকে খবর দিয়েছেন। বিকেল নাগাদ অন্য বাগানের সাহেবটী তার তিনশো কুলি নিয়ে এসে সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন। আমার সাহেব গল্প বল্‌তে বল্‌তে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ঘটনার moral (নীতি) কি, বুঝতে পারছ ত?" যাক্, শান্তি স্থাপন হ'ল, বড় মেয়েটীকে পুলিশ ও হাকীম মারফৎ জেলে দাখিল করা হ'ল, আর আমাদের ডাক্তারবাবু ছোট মেয়েটীকে বকশিস্ পেলেন। আর বেশী গল্প বলার দরকার বোধ হয় নেই। সেকালের চা-বাগানের অবস্থা পাঠক নিশ্চয়ই কতকটা বুঝতে পেরেছেন। আজ কি অবস্থা ঠিক জানি না। তবে কটন সাহেবের আন্তরিক চেষ্টার ফল না হ'য়ে যায়নি। পণ্ডিত রামকুমারের কথা হ'তে এত কথা এসে পড়ল। আর একটু ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল, কুচবেহারে আমাদের বাড়ীতে থাকত। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু অধ্যবসায়ের একান্ত অভাব। ছেলে-বেলায় সাঁওতালদের মাঝে মানুষ হয়েছিল। লাঠি খেলতে বেশ ভাল জানত, আর ধনুকে তীর দিয়ে কি বাঁটুল দিয়ে অব্যর্থ নিশানা ছিল। মহারাজের চাবুক সওয়ারদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়ে ঘোড়াশালের যত দুর্দ্দান্ত ঘোড়া চুরী ক'রে চ'ড়ে বেড়াত। আমার একটী মোটা ভুটিয়া টাট্টু ছিল, সেটা নিয়ে ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতে এল। একদিন এক খোড়ো বাড়ীতে আগুন লেগেছিল, হাতের কাছে মই না থাকায় নেবাবার কোন চেষ্টা হচ্ছিল না। অগ্নিকাণ্ড বেড়েই চলেছিল, এমন সময় আমার বন্ধুটী এসে উপস্থিত হ'ল আর চট্ ক'রে চালের উপর একটা চেরা বাঁশ ঠেকিয়ে তাই দিয়ে চ'ড়ে গিয়ে জল তুলে ঢালতে লেগে গেল। এ রকম ছেলের কি আর ভাল মানুষটীর মত প'ড়ে শুনে কেরাণীগিরি করা পোষায়? অনুকূল হাওয়ায় প'ড়লে এরা অনেকদূর গিয়ে পৌঁছায়। নইলে বানচাল। বন্ধুর অদৃষ্টে শেষটাই হ'ল। কিন্তু যে জন্যে এর উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে এই। চা-বাগানের কুলিদের দুর্দ্দশায় যখন আমরা হা হুতাশ করছি, এ একদিন কাউকে না ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। বাবার নামে চিঠি রেখে গেল, "অপরাধ নেবেন না, অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। লেখা-পড়া ক'রে আপনাকে খুসী করতে পারলাম না, ইত্যাদি।" আমায় কিন্তু ব'লে গিয়েছিল যে,

চা-বাগানে কুলি হ'তে যাচ্ছে, একবার সাহেবগুলোকে দেখে নেবে। পারলে না কিছু করতে, কারণ বয়স বড় কম ছিল। বছরখানেক কি বছর দুই পরে ফিরে এল, তারপর কয়েক বছর নানা জিনিস চেষ্টা ক'রে, শেষ বহুদূরে অজানার সন্ধানে চ'লে গেল। তখন আমি বিদেশে।

এর কথা বলতে বলতে আর একজনের কথা মনে হচ্ছে। একদিন আমরা তিন বন্ধু প্যারিসে বেড়াতে বেড়াতে সেন নদীর একটা পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি। পুলেতে মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য পাথরের বেঞ্চ। যেতে যেতে দেখি এক বেঞ্চে ব'সে একটী কৃষ্ণকায় যুবক আপেল খাচ্ছে। সে কোন্ দেশের লোক এই বিষয় জল্পনা করতে করতে আমরা চ'লে যাচ্ছি, এমন সময় সে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা আমায় কিছু কি বলছিলেন?" আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। তার পরণে ময়লা আধছেঁড়া লম্বা কোর্ত্তা, মাথায় খড়ের টুপী, হাতে আধ-খাওয়া আপেল। খানিকক্ষণ সকলে একসঙ্গে ব'সে গল্প হ'ল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু পরিচয় তিনি দিলেন না। কেবল এইটুকু জানালেন যে, যুদ্ধ শিক্ষার জন্য এদেশে এসেছেন, কিছুতেই কোথাও আমল পাচ্ছেন না। অর্থসঙ্গতির কথা বললেন, "চ'লে যাচ্ছে"। আমি বললাম, "দাদা, চলুন একসঙ্গে কোথাও চারটী খাওয়া যাক্।" জবাব দিলেন, "সে হয় না ভাই, আমার ত নিজের কিছু সঙ্গতি নেই আর ভিক্ষাও করি না।" শেষ বললেন, "তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে, কথা কয়ে, বড় আনন্দ হ'ল। যদি কিছু ক'রে উঠতে পারি ত আবার একদিন দেখা হবে।" আর দেখা হয়নি। ব্রেজিলের সুরেশ বিশ্বাস মহাশয়ের জাতের লোক। ভারতের যদি দিন ফেরে ত এ-রকম কত দেখা যাবে।

আর ডানপিটে ছেলেদের গল্প এখন থাক। নিজের একঘেয়ে জীবনের কথাই বলি। ছেলেবেলায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম শিক্ষার প্রভাবের কথা বলেছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রভাব একরকম ছিল না বললেই হয়। বাবার সঙ্গে উৎসবাদিতে যেমন সমাজে যেতাম, মার সঙ্গে তেমনি পূজা পার্ব্বণে মন্দিরে যেতাম। মন্দির সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ ছিল না, আর মা-ও কোনদিন কোন পূজায় আমাদের বিশেষভাবে যোগ দিতে বলেন নি। আজকাল যেমন হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটা hysteria বা বায়ুর প্রকোপ হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢুকেছে, তখন তা ছিল না। মার সব রকমে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে একটা fuss বা হৈচৈ কখনও দেখি নি। ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে কালে ভদ্রে দেখা হ'লে শেকহ্যাণ্ড করতেন, আবার তারা চ'লে গেলে কখন নিঃশব্দে স্নান ক'রে কাপড় ছেড়ে আসতেন কেউ জানতেও পারত না। বাবা খুব চেষ্টা করেছিলেন

যে আমাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন রকমের গোঁড়ামি না হয়। তাই যেমন রামায়ণ মহাভারত প'ড়তে হয়েছিল, তেমনি মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বাইবেলও খানিক খানিক প'ড়েছিলাম। মুসলমান বাল্যবন্ধুও অনেক ছিল। তাদের কাছে পয়গম্বরের জীবন, মেহদীর কথা, শয়তান ও ফেরেস্তাদের গল্প অনেক শুনে শিখেছিলাম। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ইস্কুল-জীবনের শেষের দিকে মূর্ত্তিপূজা, জাত-বিচার, টিকি, টিকটিকি, হাঁচি ইত্যাদি অনেক জিনিসে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম। অন্ততঃ বিশ্বাস করি এই কথা জোরে জাহির করতে লাগলাম। কি ক'রে এ রকম হ'ল তা ভাববার বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব খুব স্পষ্ট আর প্রবল হ'য়ে এল।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক আমাদের এই সময়কার নেতা। আর বঙ্গবাসী আমাদের এই সময়ের Oracle (দৈববাণী)। এই অবস্থায় কলিকাতায় প'ড়তে গেলাম। কপাল মন্দ যে সেই বছরেই Consent Bill (যাকে তখন সম্মতি আইন বলা হ'ত) পেশ হ'ল। নব হিন্দু ভাবের সঙ্গে একে মিশল সরকার বিদ্বেষ। রাস্তায় মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘোরা অভ্যাস হ'য়ে গেল। মুখে বুলি, "ধর্ম্ম গেল", "আইন চাইনা"। যাঁরা সে আইনের পক্ষপাতী, সবাই হ'লেন আমাদের শত্রুপক্ষ। কোথায় গেল ভেসে ছেলেবেলাকার কাগজ পত্র, সঞ্জীবনী ও নব্যভারত, Liberal ও Indian Messenger, সমস্ত মনটা জুড়ে বসল বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি। যে যবনান্নে চিরকাল এত লোভ ছিল, তা দেশের কল্যাণের জন্য ছেড়ে দিতে হ'ল। এমন কি বিলেতী নুন চিনি পর্য্যন্ত গেল। ঘরে ঘরে ছেলেদের সাবান দেশলাই তৈরী হ'তে লাগল। কুচবেহারে থাকতে চুলের পাট করা আমাদের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর দলভুক্ত হ'য়ে সেদিকে সময় নষ্ট করা ছেড়ে দিলাম। রুক্ষ কেশ, পরণে মোটা ধুতি চাদর, হাতে বাঁশের লাঠি, তখন লোকে দেখে কি মনে করত জানি না, এখন কিন্তু মনে প'ড়লেই হাসি পায়। টিকির বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সত্যি টিকিটা রেখে উঠতে পারিনি। ফোঁটা মাঝে মাঝে কাটতাম, কিন্তু সে অবস্থায় রাস্তায় বের হ'তে সাহস কুলোয় নি। মন্দিরে যাওয়া আসা করার খুব ইচ্ছা হ'ত কিন্তু হ'য়ে উঠত না। তাই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তারকেশ্বর কালীঘাট দর্শন হয়নি। ব্রাহ্ম আবেষ্টনে জন্ম, তাই গোঁড়ামি যখন এল খুব জোরেই এল। কথায় বলে, "হিঁদুর ছেলে যবন হ'লে, গরু খাওয়ার যম", কিন্তু পেটে সয় না যে। আমার ত আর্য্যামি করতে গিয়ে অজীর্ণ রোগ হ'য়ে প'ড়েছিল। তবে সেটা স্বীকার করতাম না,

দাপটে চালিয়ে নিতাম। সনাতন ধর্ম্মে আস্থা হুতিন বছরেই কেটে গেল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অন্য দীক্ষাটা রয়ে গেল। সনাতনী কীর্ত্তি অনেক করেছিলাম তার হুই একটা গল্প ব'লে এ পর্ব্ব শেষ করব।

যখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি তখন কলিকাতায় খুব জোরে ৺শীতলার কৃপা হয়। ছেলেবেলায় কতবারই টিকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অনুমত নয় ব'লে এবার নিলাম না। উপরন্তু, কয়েকটী প্রবাসী ছাত্রের বসন্ত হয়েছিল, আমরা তাঁদের সেবার ভার নিলাম। আমার ভার নেওয়া মানে কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের মত, কিন্তু রোগীর কাছে ব'সে থাকতাম। মা নিরুপায় হ'য়ে ৺শীতলার ফুল সঙ্গে দিতেন, সেটা কোমরে গোঁজা থাকত। এইখানে উল্লেখ করা উচিত যে, সে সময় বিপদে আপদে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর প্রধান সহায় ছিলেন নীলরতনবাবু। তাঁর ডাক্তারী ও আমার সিনিয়র-(বয়োজ্যেষ্ঠ) দের সেবায় আমাদের সব কটী রোগী বেঁচে গেল কিন্তু আমার সনাতনী চালের জন্য বাবার কাছে ভয়ানক বকুনি খেলাম, বিশেষ যখন দেখা গেল যে মাকে বসন্তের ছোঁয়াচ এনে দিয়েছি।

খাদ্যাখাদ্য বিচার হিন্দুর প্রধান কীর্ত্তি ব'লেই জানতাম। কিন্তু যত দিন পারি আমার অখাদ্যবর্জ্জন বাবার ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। শেষে ধরা প'ড়ল। গরমির ছুটীতে আমরা তিন ভাই কুচবেহার যাচ্ছিলাম। যেখানে রেল-পথের শেষ সেইখানে বাবা আমাদের নিতে এসেছিলেন। চিরপ্রথামত ডাকবাংলায় ষোড়শোপচারে ভোজন ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। সেখানকার খানসামা তের-চৌদ্দবার বিলেত ঘুরে এসেছিল, খুব লায়েক আদমী ব'লেই নিজেকে জানত, আর কাজেও সেটা দেখাতে চেষ্টা করত। আমাদের খিদের ধার বাড়াবার জন্যেই বোধ হয় বাবা menu-টা কি তাই বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় আমার ছোট্ট ভাইটী রস ভঙ্গ করলে, ব'লে উঠল, "বাবা, বড়দা ত ওসব খাবে না। সকালবেলা তিস্তায় মোছলমানে ছোঁয়া ব'লে চা টোষ্টও খায়নি।" বাবা গম্ভীরভাবে তাঁর চোপদার মিশির ঠাকুরকে ডেকে বললেন, "মিশির, বড়বাবু তোমাদের কাছে খাবেন, নিয়ে যাও।" আমি এত সহজে martyr (শহীদ) হ'তে পারব আশা করিনি। মাথা উঁচু ক'রে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলাম। আশা করি খুব সঙের মত দেখায় নি। কলিকাতায় ফিরে শুনলাম যে, বাবা আমাদের অভিভাবক কাকাকে চিঠি লিখেছেন, "আমার ছেলে এত বড় গাধা হ'তে পারে ধারণা ছিল না।"

এ ত হ'ল ঘরের কথা। একবার খুব বড় আসরে হিন্দুত্ব জাহির করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় মারা গেলেন। তিনি আমাদের বড় স্নেহ করতেন। দশ দিন আমরা অশৌচ পালন

করেছিলাম, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে আমি গেলাম। যাওয়া মাত্র নারায়ণবাবু ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সেখানে আট-দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসেছিলেন। একটু কথাবার্ত্তার পর জলখাবার এল। দেখলাম যে খাবার সব এত পরিষ্কার যে, নিশ্চয় বিলেতী নুন চিনির তৈরী। আমি বিনয় ক'রে বুঝিয়ে বললাম যে, আমি এ সব খাই না। পণ্ডিত মহাশয়েরা হেসে উঠলেন, বললেন যে, "এই কথা। এতে আর কি হয়েছে? ওরে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জলখাবার একখানা নিয়ে আয় ত।" অপেক্ষাকৃত মলিন জলখাবার এল। আমার বুকটা দশ হাত হ'য়ে উঠল। পণ্ডিতদের দেখালাম যে Young Bengal (নব্যবঙ্গ) সব অনাচারী নয়।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

মাঘ সংখ্যার পুরানো কথায় গোটাকয়েক মারাত্মক ছাপার ভুল রয়ে গেছে। পাঠক সেগুলো সংশোধন ক'রে নিলে আমরা অনুগৃহীত হ'ব।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১৭ পৃষ্ঠা ৩০ লাইন	বেলাটা	খেলাটা
৪১৮ পৃষ্ঠা ২১ লাইন	ভদ্র	শুভ্র
৪২০ পৃষ্ঠা ২১ লাইন	হনুমান দন্ত	হনুমান দণ্ড
৪২৬ পৃষ্ঠা ৬ লাইন, ৪২৬ পৃষ্ঠা ৮ লাইন	ফলতাপুর	কমতাপুর
৪২৬ পৃষ্ঠা ৩২ লাইন	অব্রাহ্মণ্য	অব্রহ্মণ্য
৪২৭ পৃষ্ঠা ২৯ লাইন	নাম	নাচ

মনুষ্যধর্ম্ম

মানুষের চরিত্রে এমন কতকগুলো বিরোধ আছে, যার গুণে, পিশাচ-সিদ্ধের মতো, ভাবিকথকেরও একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে আষাঢ়ে গল্পের নায়ক হ'য়ে থাকা। এমনি কোনো একটা বিসম্বাদের অনুগ্রহেই যে-যুগ গালিলিওকে প্রাণান্ত প্রয়াসে পৃথিবীর সূর্য্যানির্ভরতা ঘোষণা করতে দেখেছিলো, ঠিক সেই যুগেই য়ুরোপে মনুষ্যধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুপাতে মর্ত্ত্যলোককে অণোরণীয়ান্ জেনেও উজ্জীবিত পশ্চিম বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করলেনা, ধ্রুপদী সভ্যতার দৈবানুগত্যে ফিরে গেলোনা; মধ্যযুগের অধ্যাত্মনিষ্ঠাকে নান্যপন্থা ব'লে মানলে না; সে তার পিতাপিতামহের ভয়-ভাবনা, শিক্ষা-সংস্কার মুহূর্ত্তমধ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে, চণ্ডীদাসের অনুকরণে গান ধরলে: "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। এই গানে আন্তরিকতা আনতে হলে কী পরিমাণ একাগ্রতা, অভীপ্সা ও আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, তা যিনি বোঝেন, তাঁর কাছে পশ্চিমের আকস্মিক উন্নতি আর রহস্যময় বোধ হবে না। মানুষের জগতে মানুষই নিত্য, মানুষের জগতে মানুষই উপাস্য, মানুষের জগতে মানুষিক মঙ্গলই একমাত্র লক্ষ্য, এই মহাসত্যকে যে-জাতি সমগ্রভাবে তার শিল্পে সাহিত্যে, দর্শনে বিজ্ঞানে, জীবনে মরণে উপলব্ধি করেছে, তার অভ্যুত্থান অপ্রতিহত হতে বাধ্য। কোনো অনধিগম্য অমরার হতাশ আকাঙ্ক্ষা সেই আদর্শের পটভূমি হয়ে ওঠেনি, সেই জন্যেই তার আহ্বানে সারা বিশ্বে সাড়া জেগেছিলো। মানুষের মহামিলনই ছিলো সেই নিমন্ত্রণের মূলমন্ত্র, তাই সে-সমবেত আক্রমণে চিরবৈরী প্রকৃতিরও সন্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অমিশ্র সিদ্ধি অনন্ত স্বর্গের মতোই শুধু কবি-কল্পনা; জীবনে জন্ম-মৃত্যুর সীমাসন্ধি অনিশ্চিত; এবং শীতের পশ্চাতে বসন্তও যেমন আসে, বসন্তের পরে গ্রীষ্মের আগম হয়তো তারও চেয়ে ধ্রুব। সম্ভবত এই কারণেই নবজাত মনুষ্যধর্ম্ম অচিরে ব্যক্তিবাদে পরিণত হলো। বিশ্বমানব অতিবাস্তব হলেও, সে হাওয়ার মতো। তাকে বাদ দিয়ে বাঁচা শক্ত, অথচ তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ব্যক্তি স্পর্শনীয়, তার ধাক্কায় পথে চলা বিপদ, তার সংসর্গ চেষ্টা করেও এড়ানো দুষ্কর। উপরন্তু সে-কালটা ছিলো ব্যক্তির অনুকূল। শূদ্র সেদিন অন্ধকূপ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু সমাজপতিদের অনুরূপ অর্থ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার মতো সুযোগ সে তখনো পায়নি। তা ছাড়া বিশ্বের সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়, কাজেই সে

হয়তো সেদিন বোঝেনি যে আলোর আশীর্ব্বাদ গিরিশৃঙ্গকে প্রথম স্পর্শ করলেও, পর্ব্বতচূড়া অনুর্ব্বরই থেকে যায়; কিন্তু সে-আলোককে চরিতার্থ করে সমভূমির সফলতা। কারণ যাই হোক্, মানুষ সেদিন তার অন্তরের বিশুদ্ধ শূন্যতায় ব্যক্তির পাদপীঠ স্থাপনে বিলম্ব করেনি। ফলে যারা অত চেষ্টায় স্থাণু পৃথিবীকে বিধাতার করায়ত্ত থেকে ছিনিয়ে, উন্মুক্ত আকাশে জঙ্গম ক'রে দিয়েছিলো, এক শ বছর বাদে তাদেরই মুখপাত্র হয়ে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্ একদিন ব'লে বসলেন—আমরা অমৃতের পুত্র, দ্বিধাবিভক্ত অনন্তকে সেতুবন্ধ ক'রে রাখে আমাদেরই জ্যোতির্ম্ময় গতি।

উপরের যুক্তি দিয়ে আমি 'ইতি গজ'-পদটাকে উহ্য রেখে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ উচ্চকণ্ঠে প্রচারের পক্ষে ওকালতি করছি, এমন ভাবলে অন্যায় হবে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, আকস্মিক মুক্তি সচরাচর ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ মাত্র, অনর্জ্জিত জ্ঞান অনেক সময়েই অবিদ্যার নামান্তর, অনভ্যস্ত আলোক সাধারণত অন্ধতাকেই প্রসব করে। কিন্তু কাল ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মতো, তার প্রভাবে প্রায় সকল আতিশয্যই নির্ব্বিষ হয়ে আসে, এবং যে-ব্যাধি সে-প্রলেপেও নিরাময় হতে চায়না, তার অবসান অমোঘ মরণে। উজ্জীবিত পশ্চিম-সম্বন্ধেও এ-সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তার পোপ্‌কে উচ্ছেদ করার উৎসাহ পর্য্যবসিত হয়েছে ধর্ম্মব্যাপারে অনাস্থায়; তার সমাজসংস্কারের উদ্দাম প্রচেষ্টার পরিণাম অর্থশাস্ত্রের অবচ্ছিন্ন অভ্যুদয়ে; তার অদম্য কৌতূহল আজ শান্ত সংযত বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পরিবর্ত্তিত। কেবল নির্ব্বিকার রয়ে গেছে তার ব্যক্তিবাদ। না, নির্ব্বিকার থাকেনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে নীট্‌শের কণ্ঠে তা প্রকাশ হয়েছে দানবিক প্রমত্ততার প্রতিমূর্ত্তিরূপে। কিন্তু ব্যক্তির দম্ভ, ব্যক্তির দাবি, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এত দিন ধ'রে সময়ের শাসনকে উপেক্ষা ক'রে এলেও, তার আয়ুও যে অপরিমেয় নয়, সে-প্রমাণ মিলেছে গত মহাযুদ্ধে। আমার বিশ্বাস ওই কুরুক্ষেত্র বিলুপ্তির অগ্রদূত। এখনো হয়তো সংস্কৃতির শেষ সুযোগ অতীত হয়নি; কিন্তু এবারে যদি ব্যক্তি ও তার সহোদর সাম্রাজ্য সমষ্টির সঙ্গে সসম্মান সন্ধিস্থাপনের অবকাশ হেলায় হারায়, তবে আগামী প্রলয়ে তাদের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে কিনা সন্দেহ।

কেউ যেন-না মনে করেন যে, এই অপ্রচলিত মতের সাহায্যে আমি মহতের মাহাত্ম্য অস্বীকার করছি। আমি জানি যে, জগতে দু-চার জন মহৎ মানুষ ছিলেন এবং আছেন ব'লেই আমার মনুষ্যত্বের গর্ব্ব একান্ত উপহাস্য নয়। আমি জানি যে, সম্মিলিত, সমবেত মানুষ বারম্বার এমন আচরণ করে এবং করেছে যে, তাদৃশ ব্যবহার বুদ্ধিবিবেচনাহীন পশুর

কাছেও অপ্রত্যাশিত। আমি জানি যে, জনসাধারণের পক্ষে ভাবুকতার চেয়ে ভাবালুতাই সহজ, বিচারের চেয়ে ব্যাভিচারই স্বাভাবিক, আবেগের চেয়ে আবেশই শোভন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমার অবিদিত নেই যে, মহৎ মানুষও মানুষ, অমানুষ বা অতিমানুষ নয়; আমার পাশে সে যতই গগনস্পর্শী হোক্, তবু তার মনুষ্যত্বেরও একটা সীমা আছে, এবং সেই সীমা আছে ব'লেই মানবসমষ্টির প্রতিযোগিতায় তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে মহামানব বিশ্বমানবের প্রতিভূ। তাকে আগ্নেয়-গিরির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাকে প্রণালী ক'রে যে-দীপ্তি, যে-তেজ, যে-দাহ উৎক্ষিপ্ত হয় সে-সমস্তই মানবীয় গৌরবের কণামাত্র। অবশ্য, এই অন্তঃশীল ঐশ্বর্য্যের বাহক হতে পারা কম গর্ব্বের কথা নয়; এর মধ্যে এমন একটা অনির্ব্বচনীয়, এমন একটা অমেয় মুক্তির প্রেরণা আছে যে, তার উন্মাদনায় আমাদের সীমাবধারণের শক্তিটা সহজেই লোপ পায়। কিন্তু তাই ব'লেই একজন মহামানব, এমন-কি জগতের মহামানব-সমবায়, বিশ্বমানবের চেয়ে গরীয়ান, এ-দর্প চূর্ণ হবেই হবে।

উপরের কথাগুলোয় যে-অর্থবিরোধের আভাস আছে, তা হয়তো একটা উপমার সাহায্যে দূর হবে। সৌরজগতে যেমন সূর্য্যের প্রাধান্য অস্বীকার করতে চাওয়া পাগলামি, তেমনি মনুষ্যসমাজেও মহামানবের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সমগ্র সৌরজগতের অনুপাতে স্বতন্ত্র সূর্য্য যে-কারণে গৌণ ব'লে বিবেচিত হতে বাধ্য, ঠিক সেই কারণেই মানবগোষ্ঠির পাশে নিঃসঙ্গ মহামানবকে উপেক্ষা করা স্বাভাবিক। সূর্য্যের তুলনায় সৌরজগৎকে বৃহৎ বলা সম্ভব, কারণ সে-জগতে সূর্য্যের স্বকীয় উৎকর্ষ তো বাদ পড়েই না, বরং আরো কতকগুলো অখ্যাত গ্রহনক্ষত্রের গুণাবলীর সমন্বয়ও তারি মধ্যে ঘটে; এবং মানবসমষ্টিও মহামানবের চেয়ে বড়, কারণ মানবসমষ্টি মহামানবের বিয়োগে গঠিত নয়, মহামানব ও ক্ষুদ্রমানবের সন্নিপাতেই সৃষ্ট। পক্ষান্তরে, সূর্য্য সৌরজগতের অধিপতি হলেও, যেমন তার উপাদানে আর নিকৃষ্টতম উল্কার উপাদানে একটা মূলগত ঐক্য আছে এবং সেই সাদৃশ্যের শাসনেই তারা উভয়ে একটা বিশেষ আয়তনে, একটা বিশেষ আচরণে, একটা বিশেষ অয়নে চিরকাল আবধ্য; তেমনি মহামানুষ ও মামুলি মানুষ, এরা দুজনেই নির্ম্মিত এক ধাতুতে, দুজনেই চালিত এক প্রবর্ত্তনায়, দুজনেরই সুরু জন্মে এবং শেষ মৃত্যুতে। অবশ্য এক আর দুই, এই সংখ্যা দুটি যেমন একটা ভগ্নাংশক্রমে সংযুক্ত, তেমনি জন্ম ও মৃত্যু, এই মর্ত্ত্যসীমার মধ্যেও তারতম্যের প্রায় ইয়ত্তা নেই, বললেই চলে। কিন্তু এই পরিধির মধ্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা অগণ্য হলেও, অনন্ত নয়। বৃত্তবদ্ধ ব্যোমের মতো

সুপরিমিত পৃথিবীর মধ্যেও বামন ও অসুরের ভিতরকার প্রভেদ ততটা মৌলিক নয়, যতটা মৌলিক তাদের সাদৃশ্য।

আমি উপমার খাতিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে-নিয়ম মানুষের সম্বন্ধে চালালুম, তা, হয়তো, এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাই ব'লে জড়-বিজ্ঞানের রীতি-নীতি প্রাণময় মানুষের পক্ষে অপ্রযোজ্য, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। অবশ্য বিজ্ঞানে আমার অজ্ঞানতার পরিমাপ করতে হলে, সুমেরুকেও মানদণ্ড-হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। এবং সেই জন্যেই সম্ভবত ফরাসী রাসায়নিক স্তেফান্ লদ্যুক্-এর 'অস্মোসিস্'-সংক্রান্ত গবেষণার কথা শুনে, আমি এত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছি। কিন্তু বিভিন্ন দ্রাবণের সুচিন্তিত সংমিশ্রণে যদি এমন ব্যাঙের ছাতা, ঘাস, বীজ, ফুল, পাতা, পলা, কড়ি ইত্যাদি রচনা করা যায়, যাতে বিশেষজ্ঞেরও ভুল ঘটে, তবে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণসঞ্চারের ব্যাপারটাকে, হয়তো, আর অগম-রহস্যের অন্তর্গত ব'লে না-ভাবলেও চলবে। এই কল্পিত প্রত্যূষের প্রায়ান্ধকারে জীবকে জড়ের প্রতিভাস ব'লে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হাস্যকর হতে পারে, তবু জীব যে জীবনের লৌহ নিগড়ে বাঁধা, জীব যে সান্ত, জীব যে ক্ষয়শীল, সে-কথার পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন। জীববিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান থেকে খুব বেশি রোমহর্ষক নয়; এবং জড়বিজ্ঞান যেমন প্রথমাণু থেকে নীহারিকা পর্য্যন্ত, জড়ের সমস্ত অভিব্যক্তির সম্পর্কে খাটে, তেমনি জীববিজ্ঞানের প্রসারও, এককোশী শষ্প থেকে বহুলাঙ্গ মানুষ পর্য্যন্ত, জীবনের সকল আবির্ভাবকেই আচ্ছন্ন ক'রে আছে। তবে প্রাধান্য জড়বিজ্ঞানেরই, কারণ জীবনের উপক্রমণিকা যদিই বা জড়বিজ্ঞানের নিয়ম অমান্য করে, তবুও জীবনের বৃদ্ধি এবং স্থিতি সম্পূর্ণভাবে সেই নিয়মে পরিচালিত।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাণের মূলতত্ত্ব ভূতবিদ্যার বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে না। জীবনের চরম পরম ধর্ম্ম হচ্ছে অনুবর্ত্তন ও ক্রমানুসরণ, এবং জড় সান্তর ও অধোগামী। এই পার্থক্য সম্ভবত আমাদের অজ্ঞানতা-প্রসূত; হয়তো বিজ্ঞানদৃষ্টির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে যে, প্রভেদটা আসলে বাহ্য। কিন্তু তা যদি না-ও হয়, জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে যদি বিবাদটা আরো প্রাথমিক ব'লে ধরা পড়ে, তবু ওর পৃষ্ঠপোষণে ব্যক্তির অনন্যতন্ত্রতা, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির উৎকর্ষ কি ক'রে টিঁকতে পারে, তা আমি বুঝি না। জীববিদ্যা থেকে যদি কোনো নীতি আহরণ করা সম্ভব হয়, তবে তা হচ্ছে, ঈসপের ভাষায়, ঐক্যই শক্তির হেতু, বিচ্ছেদ অধঃপতনের মূল। প্রাণের প্রাক্তন প্রকারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে, শুধু যে তাদের মিশ্র উপকরণের বৈচিত্র্য বোঝা যায়, তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে

এটাও সাব্যস্ত হয় যে, প্রাণপ্রবাহের নিমিত্তও ওই সংমিশ্রণ, ওই সহযোগ। জীবলোকের সোপানমার্গে যতই উঠি, এই সংযোগ ততই প্রত্যক্ষ করি; এবং শেষকালে ভিন্নাবয়ব প্রাণীর প্রকোষ্ঠে এসে থামলে দেখি যে, তাদের প্রজনন তো দ্বিবিধ প্রাণকোশের পরিপূর্ণ সঙ্গমে ঘটেই, এমন-কি তাদের প্রত্যেকের পৃথক দেহও একটা অদ্বৈত সমষ্টির আধারমাত্র; অর্থাৎ তাদের স্বয়ম্বশ দেহের অখণ্ডায় ভেদবুদ্ধির লেশ পর্য্যন্ত নেই, তাদের সজীব অবয়বগুলির কোনো দেহাতীত অস্তিত্ব নেই, একের দুঃখ অপরের মধ্যে সংক্রামিত, একের হর্ষে অন্য সকলেই পুলকিত। আমার বিশ্বাস, এই নিগূঢ় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব'লেই, জীবজগৎ ভূতজগতের উপরে স্বাধিকার-বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। জড় সাধ্যপক্ষে তার স্বকীয়তা বাঁচিয়ে চলে। তা সত্ত্বেও সংহতি অবশ্যই ঘটে, কিন্তু সে-যোজনার প্রবর্ত্তনা আন্তরিক নয়, তার হেতু দৈবদুর্ব্বিপাক। তাই যখন আবার বাইরে থেকে বিকলনের তাগিদ আসে, তখন সে ওই আপতিক সম্বন্ধ-বন্ধন থেকে তার আত্মরত সত্তাকে নিষ্কৃতি দিতে মুহূর্ত্তেক বিলম্ব করেনা। কিন্তু প্রাণের মিলন সাধিত হয় অস্‌মোসিস্‌-জাতীয় কোনো একটা অন্তর্গূঢ় প্রেরণায়। ফলে বাহির থেকে বিয়োগের আদেশ পেলে, দুটি আশ্লিষ্ট প্রাণকোশ তাদের সৌহৃদ্যসূত্র ছিন্ন করতে পারেনা, বরণ করে সহমরণ। প্রাণের পিছনে এই নিবিড় অনুষঙ্গ রয়েছে ব'লেই, বোধ হয়, জীবনের রথ-পতাকায় প্রেত্যুৎপাদন-ও পরিবর্ত্তন-রূপ গৌরব-লাঞ্ছন দুটি গত পঞ্চাশ কোটি বৎসরেও ম্লান হয়নি।

জীবজগতে প্রাণকোশের যে-স্থান, মনুষ্যলোকে ব্যক্তির অবস্থাও তদনুরূপ। তার আধিপত্যের কারণও ঐক্য, অহংসর্ব্বস্ব হলে, তার সর্ব্বনাশও অনিবার্য্য। জীবন প্ররোহী এবং পরিবর্ত্তনশীল ব'লে, কেউ যেন না-ভাবেন যে তার এই গুণ দুটি কোনো অলৌকিক প্রসাদের পরিচায়ক। তা তো নয়ই, এমন-কি ভূতজগতের মূলে ভ্রাম্যমাণ অণু-পরমাণুর আচরণেও যে-একটা তথাকথিত স্বৈরাচারের ইঙ্গিত আছে, জীবজগতে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত। পূর্ব্বে আমি জীবকে পৃথিবীর অধিশ্বর-নামে অভিহিত করেছি, কিন্তু তার কারণ আমি নিজেও জীবজাতীয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে, জীব আবহমান কাল পৃথিবীর নিতান্ত নগণ্য অধিবাসী, জীব আজন্ম শূদ্র। সে শুধু অন্য জীবের সাহচর্য্যেই অভিষ্টসিদ্ধিতে কৃতকার্য্য হয়নি, যুগযুগান্তর ধ'রে স্থবির হয়ে ব'সে থেকেছে ভূতপ্রকৃতির আনুকূল্যের প্রত্যাশায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদেরা আজকাল বলতে সুরু করেছেন যে, সৃজনের আদিতে সমস্ত আকাশ জড়ের একটা লঘু এবং নিরন্তর প্রসারে পরিপূর্ণ ছিলো; তার পরে জড়েরই স্বভাবগত ধর্ম্মে সেই অবিচ্ছিন্নতার

মধ্যে হলো পুঞ্জের প্রাদুর্ভাব। জীবনের বিকাশে এই প্রাক্তন চপলতাটুকুও অদ্যাবধি ধরা পড়েনি।

জীব নিশ্চয়ই তার সন্তানসন্ততির ভিতর দিয়ে নিজের অস্তিত্বসূত্রকে নিরবচ্ছিন্ন রাখ্‌বার চেষ্টা করে; কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির তাড়নাব্যতিরেকে তার অন্তরে কোনো অভীপ্সা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া গেছে ব'লে আমি অন্তত জানিনা। কোটি কোটি বৎসর ধ'রে অভিব্যাপ্ত সমুদ্র যতদিন নিঃস্রোত ছিলো, 'ট্রাইলোবাইট্' এবং সমগোত্রের জীবেরা ততদিন তাদের শুক্তির সৌধে স্বচ্ছন্দ নিদ্রায় বিভোর থাকতে এতটুকু আপত্তি করেনি। কিন্তু প্রকৃতি বিমুখ হলো, আস্তে আস্তে এখানে ওখানে একটা দুটো পাহাড় মাথা জাগিয়ে উঠে দাঁড়ালো, একটা দুটো নদী অচল সমুদ্রে চাঞ্চল্য এনে দিলে; এবং যুগের পর যুগ লণ্ডভণ্ড ক্ষতবিক্ষত হতে হতে, কম্বুজাতি অল্পে অল্পে বুঝতে লাগলো যে, বাঁচতে হলে, তাদের এমন দেহের দরকার যা স্রোতের সজ্ঘাতে নুয়ে যাবে অথচ ভাঙবে না। তারপর আবার কোটি কোটি বৎসরের সমবেত চেষ্টায় জীব মেরুদণ্ডের সন্ধান পেলে। এই ইতিহাসের অনুমোদনে যিনি জীবের স্বাতন্ত্র্য ও জীবনের অতিমর্ত্ত্যতা প্রমাণ কর্‌তে পারবেন, তাঁর দৃষ্টিকে দিব্য বল্‌তেই হবে।

উপরের বর্ণনায় প্রগতির পদচিহ্ন খুঁজতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ ট্রাইলোবাইট্‌দের কাহিনীতে মেরুদণ্ড আবিষ্করণটা তত দ্রষ্টব্য নয়, যত দ্রষ্টব্য ওই জাতির উচ্ছেদ-ব্যাপারটা। প্রগতির প্রসঙ্গে এই কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা দরকার যে, ট্রাইলোবাইট্, ডাইনোসর্, ম্যামথ্ প্রভৃতি অধুনালুপ্ত জীবেরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন যুগে উন্নতির চূড়ান্তে পৌছেছিলো; এবং বৈশেষিকতার সীমা অতিক্রম করেছিলো ব'লেই আজকে আর তাদের স্মৃতিটুকুও অবশিষ্ট নেই। জীবনেতিহাসের পাতায় পাতায় প্রকৃতি, বোধ হয়, এই তত্ত্বটিকেই বার বার রেখাঙ্কিত করেছে যে, অতিবৃদ্ধি তার অনভিপ্রেত; যে সে পছন্দ করে সেই জীবেদের, যারা সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিমানের সুমিত গণ্ডিকে লঙ্ঘন কর্‌তে অপারগ বা অনিচ্ছুক। অবর, ইতর, অবজ্ঞেয়, অপাঙ্‌ক্তেয়, এরাই প্রকৃতির প্রিয়পাত্র। যে-শৈবাল, যে-শিলাবল্ক ঝড়ে ভাঙেনা, রৌদ্রে শুকায় না, জলে ধুয়ে যায়না, জীবনের আরম্ভ থেকে অদ্যাবধি তারাই আছে অবিনাশ; অথচ তাদের পরবর্ত্তী অভ্রভেদী বনস্পতিরা আজকে কয়লায় পরিণত। অজ্ঞাত অখ্যাত জীবাণুদের ইতিবৃত্তও অনুরূপ; টিরানোসরাসের জীবাবশেষে যে-রোগাবহ বীজাণুর প্রস্তরিত স্বাক্ষর দেখা যায়, আধুনিক মানুষের অস্থিতেও সে আজ মৃত্যুর অগ্রদূত-রূপে বিদ্যমান। মানুষও যেহেতু জীব, এবং তাকেও যেহেতু প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়, তাই

বৃত্তবদ্ধ প্রগতির ঘূর্ণি লেগে, পূর্ব্বগামীদের দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হওয়া তার পক্ষেও বিপজ্জনক। এবং যেটা জাতির ক্ষেত্রে অহিতকর, সেটা কখনো কোনো ব্যক্তির—তা সে যতই মহান্ হোক্—কখনো কোন ব্যক্তির পক্ষে শুভ হতে পারেনা। কারণ, আগেই বলেছি ব্যক্তির সামর্থ্য, জাতির সামর্থ্যের চেয়ে কম; ব্যক্তির প্রাণশক্তি জাতির প্রাণশক্তির তুলনায় হেয়।

বলাই বাহুল্য, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যে-বুদ্ধির, যে-নির্ব্বাচন ক্ষমতার ব্যবধানে বিভক্ত, তা প্রথম দৃষ্টিতে মৌল, দুস্তর, অভূতপূর্ব্ব ব'লে মনে হয়। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত করবার কোনোই উপায় নেই যে বুদ্ধি ও নির্ব্বাচনক্ষমতা মানুষের নিজস্ব সম্পদ। যে-দেহী সর্ব্বপ্রথম নাড়ীমণ্ডলের আবিষ্কার করে, সেই অতিপুরাতন জীবই মানুষকে বুদ্ধির উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে। এবং যে-উপায়ে আদিম পাকস্থলীবিশিষ্ট জন্তু আপনার অন্ত্রকে জীর্ণ না-ক'রে খাদ্যকে পরিপাক করতে শিখেছিলো, আমাদের জঠরাগ্নি ঠিক সেই দৃষ্টান্তই অনুকরণ করছে। নির্ব্বাচন-পদ্ধতির পুরাবৃত্ত আরো প্রাচীন। "পারামিসিয়ম্"-নামক এককোশী কীট,—যার নাড়ী-মস্তিষ্কহীন আণুবীক্ষণিক দেহের স্বল্পতা দেখে মনে হয়, সেই বুঝি সৃষ্টির প্রথম প্রাণী, তারও বিপদের থেকে পলায়নের এবং আহার্য্যের দিকে পুরশ্চরণের শক্তি আছে। অতএব যদি বলা যায় যে, আধুনিক বৈদ্য যখন রোগীর অনাবশ্যক এপেন্‌ডিক্স্ কেটে, তাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচান, তখন তিনিও সেই প্রাক্তন প্রাণীর পদানুসরণ করছেন, তবে আমাদের অহমিকা অল্পবিস্তর প্রপীড়িত হয় বটে, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের কোনো অমর্য্যাদা ঘটে না।

মূলত প্রাথমিক জীবের মতো, মানুষের কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাও উপজ্ঞা-ঘটিত। তবে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের বাকযন্ত্রকে ব্যাবহারিক ক'রে তুলেছি; তাই পশুর মতো আচরণের পরে আমরা তার নাম দিই দৈবানুপ্রেরণা। এবং শুধু তাতেই আমরা তুষ্ট নই; যে-লজ্জাকর প্রবৃত্তিগুলো মানুষের একান্ত আপন, পশুজগতে যার ইসারা পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন, এমন সমস্ত বিকৃতির আমরা স্থালন করি জন্তুর দোহাই দিয়ে। উদাহরণ-স্বরূপ মানুষের আষ্টপ্রহরিক কাম-বৃত্তির নাম করা যেতে পারে। মানুষের নিম্নস্তরে এমন কোনো পশু আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি, (সম্ভবত এক বানর ছাড়া) কামায়ন যার জীবনে নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত, মিথুনকে যে নিষিদ্ধফলের পর্য্যায়ে ফেলে, আমাদের একটা অবাস্তব নন্দনের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। কিন্তু এমনি আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনার ক্ষমতা যে, মানুষের ভাষায় যৌন ব্যাভিচারের প্রচলিত বিশেষণ হচ্ছে পাশবিক।

তবে এ-কথা মানতেই হবে যে, মানুষের ভাষা হচ্ছে তার অপূর্ব্ব অবদান, এটাই তার সম্পূর্ণ আপন, এবং এরি জোরে সে আজ ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়ী। মানুষের পূর্ব্বগামীরা এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হয় নি, যার আশীর্ব্বাদে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-ব্যতিরেকেও জীবনযাপন সম্ভব। তাই তাদের যুগ ছিলো অপচয়ে ভরা; বংশকে বংশ, পর্য্যায়কে পর্য্যায় উজাড় হয়ে গেলে, তবে জাননিক নির্ব্বাচনের দুর্গম পথ দিয়ে একগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার দায়ভাগ এসে পৌঁছতো আরেকগোষ্ঠীর আয়ত্তে। এই সর্ব্বনাশা যোগ্যতাসঞ্চয়ের মধ্যে মানুষ এলো তার ভঙ্গুরতা নিয়ে। পুরাতন প্রথায় প্রাণপাত ক'রে প্রকৃতির বরণমালা কুড়াবার সাধ যদিই বা তার থেকে থাকে, সাধ্য আদৌ ছিলোনা। কাজেই সে অল্পদিনেই বুঝলে যে, তাকে বাঁচতে হলে, এমন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, যাতে একের বিজ্ঞান বিনা-অনুশীলনেই অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। এমনি ক'রে, ভাষার জন্মও দৈবাৎ; সে-আবিষ্কারের জন্যে কোনো ঐশী শক্তির প্রতিগ্রহ নিষ্প্রয়োজন। বিশ্লিষ্ট ব্যক্তির দুর্ব্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যেই তার উৎপত্তি। তার আদি লক্ষ্য প্রতিকূল পরিবেষ্টনকে সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতিহত করা। এই মহাব্রতে ভাষার সার্থকতা অত্যদ্ভুত, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাই ব'লে ভুললে চলবে না যে, ভাষা যদিও প্রতিবেশজয়ের পরমাস্ত্র, তবুও তা প্রতিবেশেরই আজ্ঞাবহ। যে-ভুবন আমাদের জ্ঞানের আগোচরে, যে-অবস্থা আমাদের দৃষ্টির উত্তরে, যে-সংঘটনে আমরা অনভ্যস্ত, সে-সকল ক্ষেত্রে ভাষা একেবারেই অকারী।

আমার অনুমিতির প্রমাণস্বরূপ বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সঙ্কটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র এমনি লোকোত্তর যে শত মনীষীর অক্লান্ত অধ্যবসায় সত্ত্বেও তাকে এখনো কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে নি, এবং কখনো পারবে কিনা সন্দেহ। ভাষা সাংসারিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যে তৈরি, সুতরাং তার সাহায্যে যখন আমরা তারকার আন্তর উত্তাপের পরিমাণ দিতে চাই, তখন সাধারণের মনে চার কোটি ডিগ্রি তাপের কোনো ফলাফলই ব্যক্ত হয় না। সুদূর তারার অন্দরের অবস্থা না-হয় বাদই দেওয়া গেলো, কিন্তু আমাদের নিজের আন্ত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাও খুব সহজসাধ্য নয়। আসলে যেটা আমরা কখনো দেখিনি, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কখনো সুস্পষ্ট হয়না; উপমার সাহায্যে যদি বোঝানো গেলো তো গেলো, নচেৎ জিনিসটায় আমরা ফাঁকি পড়তে বাধ্য। গণ্ডারের মতো দ্বিরায়তনিক দৃষ্টি লাভ করলে, মানুষের ভাষা ও বুদ্ধি যে কি রূপ ধরতো, তার কতকটার ইঙ্গিত পাওয়া যায় চতুর্থ আয়তন-সম্বন্ধে আমাদের কষ্টকল্পনা থেকে।

ভাষা-সম্পর্কে আমার অনুমান যদিও বা বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবু
সকলে এতে সায় দেবেন না, জানি। আমার কথা আর যিনিই মেনে
নিন, সভ্যতাভিমানী বিদগ্ধের দল, অন্তত, বিশ্বসাহিত্যের দিকে সজয়
তর্জ্জনী নির্দ্দেশ ক'রে, জানতে চাইবেন, সেই প্রকীর্ত্তির সঙ্গে মানুষের
পরবশ প্রস্তাবনার সম্বন্ধ কি? আড্‌লার্‌-প্রমুখ এক সম্প্রদায়ের মনো-
বিদেরা মানুষের সকল প্রচেষ্টার মূলেই "দৈন্যগ্রন্থীর" সন্ধান পেয়েছেন।
তাঁরা বলেন যে, মামুলি মানুষ, সে কল্পলোকবাসী, সে আদর্শমাত্র; বাস্তব
জগতে যারা জন্মায়, তাদের মধ্যে কোনো-না-কোনো গুণের অনটন পড়ে।
মানুষের সাধনাই হচ্ছে এই অভাব পূরণ ক'রে, আদর্শে উপনীত হওয়া।
এঁদের মতে সাহিত্যসেবায় তারাই আত্মনিয়োগ করে, যাদের জন্মগত
ত্রুটি কোনো ভৌতিক প্রক্রিয়ায় সারবার নয়; তারাই কায়াকে ছেড়ে
আশ্রয় করে ছায়াকে; তাদের উপাদানে সোনা নেই, তাই তাদের কারবারে
রাঙতার এত ছড়াছড়ি। এই দলের মনস্তাত্ত্বিকেরা আদর্শ মানেন ব'লে,
দর্শনশাস্ত্রে যে-মত আদর্শবাদ-নামে পরিচিত, এঁরাও সেই মোহময় মন্ত্রের
উপাসক, এমন বিশ্বাস, সম্ভবত, অমূলক হবে। আধুনিক মনস্তত্ত্বে আমি,
অন্তত, ক্রমোন্নতিবাদের কোনো সমর্থন পাইনি। এখানে যে-আদর্শের
কথা বলা হয়েছে, সে কোনো দুর্ল ভ তত্ত্ব নয়, সে কেবল ধ্যেয় সত্য নয়,
সে-অস্থাবর আলেয়াকে অনুসরণ ক'রে, মানুষ শেষে পরব্রহ্মে লীন হয়ে
যায় না। এই পরিপূর্ণতা ব্যষ্টির মধ্যে ধরা না-গেলেও, একটা যে-কোনো
সজীব মানবসমষ্টির ভিতরে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। জীবগোষ্ঠীকে
বাঁচতে হলে, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে তার যে-সার্ব্বত্রিক সদ্ভাবের
প্রয়োজন, এই পরিপূর্ণতা সেই সনাতন মিতালিরই নামান্তর। সুস্থ,
সবল ব্যক্তিমাত্রের প্রচেষ্টার পরমার্থ হচ্ছে এই সমীকরণব্যাপারে আত্মোৎ-
সর্গ করা। এখানে এই কথাটিই প্রণিধানযোগ্য যে, ব্যক্তি নির্দ্দোষ হলে,
অর্থাৎ তার নিজের ক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ সঙ্গতি সাধিত হয়ে থাকলে, তার
আর কোনো কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা থাকা সম্ভব নয়। সাহিত্যও এই অসংস্থিতির
ফল, এবং সেই জন্যেই সে-সাধনা সমাজের মঙ্গলবিধায়ক। একের
সামঞ্জস্যপদ্ধতিকে দশের সামনে ফুটিয়ে তুলে, সাহিত্যও জৈবিক প্রতিষ্ঠার
প্রকরণ-আবিষ্কারে সহায়তা করে। তা না-করলে, এই বিষয়াসক্ত সংসারে
তার অন্নজলের ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই উঠে যেতো।

তবে আমরা মানতে বাধ্য যে, ভাষা, এবং পক্ষান্তরে সাহিত্য, আসলে
মানুষের অন্যান্য অঙ্গবিক্ষেপের মতো একটা স্থিতিস্থাপক ভঙ্গীমাত্র হলেও,
তার পরিণতি আজকে অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ, শাসন
ও অভ্যাস, এই তিন দীক্ষাগুরুর ভ্রুকুটিতে নবজাত শিশুর ক্ষুধিত ক্রন্দন

যেমন অচিরে পাচককে পরিবেষণের আজ্ঞায় পর্য্যবসিত হয়, ঠিক তেমনি ক'রেই আমরা আজকে আর রিরংসার তাড়নে সঙ্গিনীসন্ধানে বাহির হই না, ঘরে ব'সে লিখি প্রেমের কবিতা। অঘটন সংঘটনই হচ্ছে সভ্যতার সার্থকতা; আমাদের বৈদগ্ধ্য, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের পরিশীলন যতই বাড়ছে, আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলি ততই যাচ্ছে হারিয়ে; ব্যাপার এতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে যে, সম্প্রতি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর নয়, যার কার্য্যকলাপের আর নৈমিত্তিক কাটামোই নেই, আছে কেবল পুঁথিজাত প্রবৃত্তি; যারা আর জীবনের তাগিদে বিচলিত হয় না, মেতে ওঠে কথায়। কিন্তু আধুনিক জগতে ভাষা সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে উঠেছে ব'লেই, মানুষ তার পাশব কুটুম্বদের জাতিচ্যুত করতে পারবে, এমন ধারণা নিঃসার স্বপ্নমাত্র। মদনসখার সংস্পর্শে আমাদের আদিপুরুষের দেহে যে-অবস্থান্তর ঘটতো, সেই মদস্রাবই এখনো প্রণয়-নামে অভিহিত; তবে সে-গণ্ড-নিঃসরণের উদ্বোধন আর সময়সাপেক্ষ নয়, আজ তা ব্যক্তিগত। এখানে কারণটা বদলেছে কিন্তু ফল আছে যথাপূর্ব্ব; অভিনেতা ও পট পরিবর্ত্তিত হয়েছে, কিন্তু নাটক রয়েছে নির্ব্বিকার।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, ভাবনা-বেদনা, আবেগ-উদ্যোগ, এ-সমস্তেরই সূত্রপাত দেহে। একথা অন্তর্দর্শী মনোবিদও অস্বীকার করেন না; এবং স্বয়ং উইলিয়ম্‌ জেম্‌স্‌ই প্রথম দেখান যে, প্রাণী যখন ভয়াবেগ অনুভব করে, তখন তার শরীরের অবস্থান্তরটা গৌণ নয়, মুখ্য। অর্থাৎ আমাদের দেহ সঙ্কুচিত হয়, নিঃশ্বাস ক্ষিপ্র হ'য়ে ওঠে, হৃদ্‌কম্প বাড়ে ব'লেই আমরা ভীত হই, ভয়ানুভূতি জাগে ব'লে ওই বিকারগুলো পরিলক্ষিত হয় না। এই মহাপ্রমাণ আবিষ্কারের পরেও কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির শরণ নেন, কারণ নরদেহের নলীহীন গণ্ডসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অদ্যাপিও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু এ-বিষয়ে, বোধহয়, আর মতদ্বৈত নেই যে, ক্ষুধার তাড়নে মানুষের গণ্ডবিশেষ যেমন লালায়িত হ'য়ে ওঠে, অন্য যে-কোনো উত্তেজনাতেই বিভিন্ন গণ্ডে ঠিক তেমনি ক'রেই রসসঞ্চার হয়। আলঙ্কারিক রস এই প্রাকৃত রসের প্রতিরূপ। এই প্রাকৃত রসে আমাদের বাতবহা নাড়ীর বিভিন্ন কেন্দ্র অভিষিক্ত না-হ'লে আমরা বীরত্ব, স্নেহ, সৌন্দর্য্য, অধ্যাত্ম্য ইত্যাদিকে উপলব্ধি করতে অপারগ। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে মানবচৈতন্যকে আর দেহাতিরিক্ত ব'লে মনে করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। চৈতন্যের সার্ব্বভৌমত্ব ও অবিনশ্বরতার ব্যাখ্যাও বোধহয় এইখানে। যে-শাশ্বত সত্য, যে-সনাতন সৌন্দর্য্য মানুষকে গত পাঁচ হাজার বছর ধ'রে প্রলুব্ধ ক'রে রেখেছে, সে আর কিছুই নয়, কেবল এমন রসস্রাব যা দেহীর পক্ষে মহত্তম মঙ্গলের কারণ। এগুলো

অবিনশ্বর, কেননা শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা মানুষ তার আঙ্গিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে সংযত করতে পারলেও, পূর্ব্বোক্ত গণ্ডনিঃসরণকে অবদমন করতে অসমর্থ। সুতরাং তার চৈতন্যের ভেক বদলায় কিন্তু চৈতন্য থাকে নির্ব্বিকল্প ; প্রেমাস্পদের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু প্রেমানুভূতিতে বিকার ধরা পড়ে না। উপরন্তু উক্ত রসগুলি যেহেতু রসায়নের অকাট্য নিয়মে বাঁধা, তাই তাদের ফলাফলও সকল কালে ও সকল ক্ষেত্রে সমান। মানব-চৈতন্য যদি এই ভৌতিক উপাদানে বিরচিত না-হয় তবে মানুষের মূল্যজ্ঞানের, মানুষের অর্ঘ্যপ্রমাণের কি অর্থ থাকতে পারে, তা, অন্তত, আমার কাছে অপ্রকাশ।

এই কোণ থেকে দেখ্‌লে কবিকে আর স্বর্গের চক্রান্ত ব'লে মনে হবে না ; তাহলে দেখা যাবে সেও আমাদের মতো অসম্পূর্ণ মানুষ, যে প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টায় নিজের প্রণালীহীন গণ্ডগুলিকে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ক'রে তুলেছে। ফলে যতটুকু বা যে-রকমের অভ্যাঘাতে তার দেহ সরস হ'য়ে ওঠে, হয়তো তার অনেক বেশি ধাক্কা না-লাগলে আমাদের শরীরে আন্দোলন জাগে না। অতএব কবি, মহাকবি, সেই, যে দৃশ্যমান বস্তুমাত্রের প্রচ্ছন্ন উদ্দীপনশক্তিকে নিজের দেহের দ্বারা একান্ত আপন ক'রে নিয়ে, সে-দুর্ব্বল উত্তেজনাকে অনুকূল ঘটনাচক্রের অনুগ্রহে পাঠকের দেহে সংক্রামিত করতে পারে। এ-ক্ষেত্রে অনুকূল ঘটনাচক্র হচ্ছে ভাষা, কারণ ভাষা যে শুধু ধ্বনিরূপ উচ্চণ্ড উদ্দীপকের আধার, তা নয়, সভ্য মানুষের পক্ষে শব্দ আর বস্তু প্রায় অভেদাত্মা। কাজেই কাব্যরচনাকালে কবি কোনো অলৌকিক প্রেরণায় অমানুষ হ'য়ে ওঠে না, সে অভিধান নিয়ে এমন শব্দরূপ অন্বেষণ করে, এমন ধ্বনিতরঙ্গ খোঁজে, যা তার প্রাথমিক উদ্বোধনের যথার্থ প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এবং তার রূপায়ন তখনই সার্থক হয়, যখন অবশ্যম্ভাবী বাক্য-বিন্যাসের অভ্যাঘাতে তার দেহান্তরে সেই ঈপ্সিত আবেগের পুনরভিনয় চলে। এইটাই যদি কাব্যসৃষ্টির অনন্য উপায় না-হতো, তবে মহৎ কবিতার প্রত্যেক শব্দটি, প্রত্যেক অলঙ্কারটি, সমগ্র রূপটি অত অপরিহার্য্য, অত নির্ব্যূঢ় ব'লে মনে করার কোনো কারণ থাকতো না ; তাহলে কবির পক্ষে বুদ্ধি-বিচারের কোনো আবশ্যিকতা দেখা যেতোনা ; তাহলে মহা-কবিদের পরম প্রবচনগুলিকে প্রথমপাঠেই অতিপরিচিত ব'লে ভ্রম হতো না।

কবি জানে যে, আবেগের ঝোঁকে কথা কইতে গেলে, মানুষের বাক্‌যন্ত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। তাই সে যখন তার শব্দশৃঙ্খলার গুণে সেই পরিবর্ত্তনগুলোকে পাঠকের কণ্ঠে পুনরাবৃত্ত করাতে

পারে, তখনই কবির আবেগ-প্রতিমা জাগে পাঠকের মানসপটে। বাক্‌-যন্ত্রের এই পরিবর্ত্তনকেই হয়তো বলে "রিদ্‌ম্‌", বলে গতিভঙ্গী। এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলে মনুষ্যদেহের গণ্ডগুলোকে ইচ্ছামত সরস করা যায় ব'লেই, হয়তো, আধুনিক কাব্যবিবেচকেরা মনে করেন যে, কবিতায় কৃত্রিম ছন্দের ত্রুটি যদিও বা মার্জ্জনীয় তবু গতিভঙ্গীর পঙ্গুতা একেবারেই অসহ্য। অবশ্য এখানে বলা দরকার যে, চেঁচিয়ে পড়ায় আর মনে মনে পড়ায় খুব বেশি তফাৎ নেই। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষার সঙ্গে যিনিই পরিচিত, তিনিই জানেন যে, চিন্তাকালে আমরা শুধু মস্তিষ্ককেই কাজে লাগাই না, সারা দেহে আন্দোলন জাগিয়ে তুলি। এবং যেহেতু পূর্ব্বেই বলেছি উদ্দীপনা যেমনি হোক্‌, তার শারীরিক প্রতিঘাত সার্ব্বত্রিক ও সমান, তাই কবি ও পাঠকের নিমিত্ত পৃথক হ'লেও তাদের আবেগ ও অনুভূত রস প্রায় অভিন্ন। এ না-হ'লে, কাব্য কেন চিরপরিচয়ের বিস্ময় জাগায়, কাব্যপাঠে বিষাদ, পুলক, উৎসাহ ইত্যাদি কায়িক সংবেদনগুলো কেন পরিলক্ষিত হয়, কাব্যের অর্থ কেন অনির্ব্বচনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়, এ-সকল প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া শক্ত।

শুনেছি, সাধনার এমন মার্গ আছে, যাতে চললে মানুষ মর্ত্ত্যসীমা অতিক্রম ক'রে, অমৃতলোকে পৌঁছয়। এ-কথা সত্য কিনা জানবার সৌভাগ্য, সুযোগ বা সামর্থ্য কোনোদিন না-ঘটলেও, আমি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি যোগীদের এই দাবিতে আমার আস্থা যেন নিত্যকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস সত্ত্বেও আমি কিছুতে বুঝতে পারিনা, উক্ত সাধনার সঙ্গে কাব্যচর্চ্চার সম্পর্ক কোথায় ? প্রচ্ছন্ন প্রেরণাকে প্রকাশ্য ব্যঞ্জনায় পরিণত করাই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কার, সাধারণ অনুভূতির সীমা মানা ছাড়া কবির গত্যন্তর দেখিনা। রাক্ষস-শব্দের দ্বারা কোনো রমণীর দেবীত্ব জ্ঞাপন করতে চাওয়া যেমন উপহাস্য, মর্ত্ত্যের ভাষায় স্বর্গের বার্ত্তা ব্যক্ত করার চেষ্টা তার চেয়ে কিছু কম ব্যর্থ নয়। আগেই বলেছি, ভাষা অতীন্দ্রিয়ের বাহন তো হতেই পারেনা, এমন-কি ইন্দ্রিয়গোচরকে প্রকাশ করাও সময়ে সময়ে তার সাধ্যের অতীত। উপরন্তু আবেগ ও বাক্‌যন্ত্রের মধ্যে যদি যথার্থই নিবিড় আত্মীয়তা থাকে, তবে এমন সিদ্ধান্ত থেকে অব্যাহতি নেই যে, মানুষের কান যে-নিয়মে একটা সুপরিমিত শব্দপর্য্যায়ের উপরে-নিচে বধির, মানুষের চক্ষু যে-নিয়মে একটা সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণস্তরের অধে-উর্দ্ধে অন্ধ, ঠিক তেমনি কোনো নিয়মেই মানুষের কণ্ঠ একটা নাতিবৃহৎ আবেগ-গণ্ডির বাইরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কাজেই কবির প্রেরণা যতই মহৎ হোক্‌, তার ভাষায় শুধু ততটুকুই প্রকাশ্য যতটুকুর চাপ তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সয়, অথবা যতখানির তাড়া না-খেলে

তার বাক্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক আলস্য অবিচল থাকে। হয়তো, তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যেতে পারে যে, এমন সিদ্ধপুরুষ আছেন, যাঁর দিব্যকর্ণ গ্রহ-নক্ষত্রের নূপুর নিক্কণে অহর্নিশি ঝঙ্কৃত। কিন্তু তাই ব'লে এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর কবিতায় ব্যক্ত কর্‌তে পারবেন, এমন ভাবলে খুবই ভুল হবে। তাঁর কাব্য যেহেতু মানুষী ভাষায় রচিত, তাই সে-কবিতার ধ্বনিসমাবেশও গতিগণিতের ঠিক সেই বিধিবিধানকে মান্‌বে, যার আজ্ঞায় তারার পদশব্দ মনুষ্যলোকে নিষিদ্ধ। এই রকমের নিষ্ফল প্রয়াস নিরস্ত করবার জন্যেই ক্রোচে তাঁর বিখ্যাত সূত্রটিকে প্রচার করেছিলেন যে, রূপাতীত ভাবনা ভাবনাই নয়, ভাবনার ভানমাত্র।

অবশ্য তারার নূপুরনিক্কণ-ব্যাপারটা নিতান্তই অতিকথন; কিন্তু অনুরূপ ঘটনা আধুনিক সাহিত্যে খুব বিরল নয়। আজকালকার কবি সাহিত্যের ব্যাবহারিক ধর্ম্মে আস্থা হারিয়েছেন। (গত দেড়শ বছর ধ'রে আমরা সাহিত্যের সার্ব্বিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে, সমস্ত প্রয়াস প্রয়োগ করেছি কাব্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাহক ক'রে তুলতে। ফলে কবি আজকে উৎকেন্দ্রিক, কাব্য মুমূর্ষু, সাহিত্য স্বীকারোক্তিতে পরিণত। আমরা ভুলে গেছি যে, উদ্‌ভাবনের সামর্থ্য মানুষের নেই, কবি শুধু আবিষ্কারক। আমরা ভুলে গেছি যে, অসামান্য অভিজ্ঞতা থাকলেই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়না, তার জন্যে দরকার অনুকম্পন। আমরা ভুলে গেছি যে, প্রিয়াকে পেলেই কাব্যলক্ষ্মীকে বাঁধা যায় না, সে জন্যে প্রয়োজন আমার প্রিয়ার মধ্যে চিরন্তন নারীর আবির্ভাব। এই আত্মোৎসর্গে আমরা আবার যবে সক্ষম হবো তবেই আমাদের জিহ্বাগ্রে সরস্বতী আপনার আসন পাতবেন, তবেই জগতে জন্মাবে নূতন সফোক্লিস্, অভিনব শেক্‌স্‌পীয়র্। কিন্তু এ-সত্যকে আমরা মানতে চাইনা, সেইজন্যেই বৈচিত্র্যে আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের বহু উর্দ্ধে হ'লেও, আজকে তা খেলার জিনিস, আজকে তা বিলাসিতার উপকরণ, তা আর পূর্ব্বের মতো জীবনের অবর্জ্জনীয় সম্পদ নয়। সেই জন্যেই আধুনিক সাহিত্য হেঁয়ালির পার্শ্বচর। ব্যক্তি-বাদের উগ্র সুরা আমাদের শিরা-উপশিরায় এমনি বিস্মৃতি ভ'রে রেখেছে যে, এই অধঃপতনের সংজ্ঞা সুদ্ধ আজকে বিলুপ্ত; আজকে আমরা বলতে সুরু করেছি যে, সাহিত্যবোধ, সে হচ্ছে অধিকারভেদের কথা; যে সাহিত্য-রস, সে হচ্ছে অমরাবতীর উপহার; যে সাহিত্যসিদ্ধি, বিশ্বোৎপত্তির মতো, কেবল নেতি-নেতির দ্বারাই প্রকাশ্য।

অবশ্য এ-কথা অস্বীকার করা বৃথা যে, সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি, তাও অন্যান্য বিদ্যার মতো, অনুশীলনের ফল, এবং অন্যান্য বিদ্যার মতো তার জন্যেও একটা সহজাত পক্ষপাত থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই পক্ষপাতকে,

এই আয়াসসিদ্ধ পরিপক্কতাকে অলোকের আশীর্ব্বাদ ব'লে জাহির করলে, পারদর্শী ফুট্‌বল্‌খেলোয়াড়কেও অধরার প্রিয়পাত্র ব'লে মানা দরকার। কবি-পাঠক-সংবাদ যদি সত্যই একটা আধিদৈবিক ব্যাপার হয়, তাহলে সাহিত্যের—অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের কোনো সার্থকতাই থাকে না, তৃতীয় নয়ন খুলে চাইলেই পাঠক বোঝে কবির হৃদয় কোন্ অনুপ্রেরণায় উদ্বেল। আসলে সাহিত্যপ্রবণতার জন্যে যেটা অপরিহার্য্য, সে হচ্ছে অনুকূল আবেষ্টন। ভিন্ন মানুষের পরিমণ্ডল ভিন্ন ব'লেই, কেউ ঝোঁকে সাহিত্যের দিকে, কেউ তন্ময় হয় গণিত-চর্চ্চায়; কারো জিহ্বা গো-নামে সরস হ'য়ে ওঠে, কেউ ভাবে গাভী ভগবতী। এবং যুগের আবেষ্টনও ব্যক্তির আবেষ্টনের মতো পরিবর্ত্তনশীল, তাই অষ্টাদশ শতকের কবিতা উনবিংশ শতাব্দীতে ছড়া হ'য়ে দাঁড়ায়; শেক্‌স্‌পীয়রের প্রহসন প'ড়ে, পরীক্ষার্থীর কান্না আসে; 'সঙ্ অফ্ সলোমন্'-এর আধ্যাত্মিকতা আধুনিক মানুষের কামোৎপাদন করে। কিন্তু মানুষের অধিকাংশ ভাবনা-বেদনা শিক্ষা ও সমাজ সংঘটিত হ'লেও, তার দেহের কতকগুলো প্রতিক্রিয়া সহজ, কতকগুলো প্রবৃত্তি স্বসমুত্থ, কতকগুলো অভিজ্ঞা মজ্জাগত। সুতরাং যে-কবি এই প্রাকৃত ধর্ম্মের শরণে কাব্য রচেন, দেশ, কাল ও পাত্রকে পেরিয়ে তাঁর কবিতাই জ্বলে ধ্রুবতারার মতো, তাঁর কবিতা আনে আপনার পূজা আপনি আহরণ ক'রে, ব্যক্তিতার অন্ধকূপ ভেঙে তিনিই ব্যক্ত হন অবিনশ্বর ব্যক্তিস্বরূপে; বিশ্বমানবের শাশ্বত প্রতীকরূপে তিনি বিরাজমান থাকেন সময়ের অনিত্য পটভূমিকায়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রসঙ্গ, পদ্ধতি এবং আবেদনের সমতা ও সার্ব্বিকতার এ ছাড়া অন্য কি টীকা থাকতে পারে, তা, অন্তত, আমার জানা নেই।

কাব্য ও মহত্ব বিশ্লেষণে যাঁরা স্থূলহস্তাবলেপ অপছন্দ করেন, তাঁরা বলেন যে, শেক্‌স্‌পীয়র্ বা বুদ্ধ যতদিন প্রয়োগাগারে উৎপন্ন না-হচ্ছেন, ততদিন তাঁদের অসামান্য লক্ষণগুলির বিষয়ে বিজ্ঞানের জারিজুরি কেবল নিরর্থ নয়, উপহাস্যও। এই মনোভাবের অলিগলিতে প্রবেশ করার মতো পথজ্ঞান আমার নেই, তবু এমন মত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ভূতবিজ্ঞানের সাহায্যে হিমালয়কে গড়া যায় না ব'লেই, ওই গিরিরাজের বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত মিথ্যা নয়। এটা, অবশ্যই, সত্য যে, জড়পদার্থে আমাদের যতটা অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে, পরীক্ষার অসৌকর্য্য ইত্যাদি কারণে জীবনপ্রসঙ্গে আমরা ততটা নিশ্চিত নই। কিন্তু যদি ভৌতিক প্রণালীতে জীবের লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, প্রণয়াসক্তির মতো মৌলিক প্রবৃত্তিকে বিপরীত থেকে সমপদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, মনুষ্যমিশ্রিত দ্রাবণে পাতা গজিয়ে ওঠে, তবে এ-কথা

অস্বীকার করা বৃথা যে, জীববিদ্যায় আমরা সর্ব্বজ্ঞ না-হ'লেও, একেবারে অনভিজ্ঞ নই ; যে প্রাণপ্রসঙ্গে আমাদের অনুমান স্থানবিশেষে অস্পষ্ট হ'লেও, তাতে অযৌক্তিক কিছু নেই, তার নির্দ্দেশে পরিণামে সত্য গন্তব্যে উপনীত হওয়াই সম্ভব। অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান অনুমিতি জন্তুর সাহায্যেই গঠিত হয়েছে, এবং মন, মেধা ও মনীষার গুণে মানুষের মধ্যে একটা অতিজান্তব লক্ষণ বিদ্যমান। কিন্তু এ-গুণগুলির সূত্রপাত-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যা বলেছি, তার পরে এমন মন্তব্য নিশ্চয়ই সঙ্গত যে, মর্ত্ত্যমহিমা মর্ত্ত্যেরই মহিমা, স্বর্গের প্রতিচ্ছবি নয়। এই মহিমার সমস্ত অন্ধিসন্ধি এখনো আমাদের অধিকারে আসেনি, সত্য, কিন্তু সেই জন্যেই যদি ওর অতিমর্ত্ত্যতা মানতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটা বলাও প্রয়োজন যে, তীরের ঋজুগতি, তাও উর্দ্ধলোকের অনুগ্রহ। আসলে চক্র যেমন গড়িয়ে চলে আপনার স্বভাবগতিকে, তেমনি মানুষও আজ পশুপতি কেবল ঘটনার খেয়ালে। অবশ্য ঘটনার খেয়াল জিনিসটা বেশ একটু আবছা ধরণের হলো ; কিন্তু আমাদের জ্ঞান এখনোও অমিত হয়নি ব'লেই, ব্রহ্মবাদের মতো, একটা নঙর্থক আদর্শের আশ্রয় চাইতে হবে, এমন উপদেশও কিছু কাজের নয়। আমরা যেন কখনো না-ভুলি যে, অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান ক'রে মানুষ শ্রীমান বা শক্তিশালী হয়নি ; মানবীয় কীর্ত্তিস্তম্ভের পাদপীঠে যে-আর্য্যসত্য নিহিত আছে, তা হচ্ছে এই : যা অজ্ঞানগোচর তা অবাস্তব ; যা অব্যক্ত তা মায়া, মরীচিকা, মিথ্যা।

উপসংহারে এই কথাটার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন মনে করি যে, আমি মহাপুরুষকে খর্ব্ব করতে চাই না, সেই মহত্ত্বের প্রতিবিম্বে দাঁড়িয়ে অপার গৌরব অনুভব করি ; সাধারণের মতো, আমার মাথাও বিরাটের চরণে সর্ব্বদা ভক্তিপ্রণত। কিন্তু বিরাটকে চাইলেও আমি অসুরকে চাই না, আমার কাছে মহৎ আর অমিত সমার্থব্যঞ্জক নয়। আমি জানি, এর জন্যে আমার স্বকীয় সামান্যতাই দায়ী, আমি নিজে সীমাবদ্ধ ব'লেই আজ অসীমকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি। আমার বুদ্ধি অক্ষম, কল্পনা সঙ্কীর্ণ, সেইজন্যেই গতিবেগের বিচার করতে হ'লে আমি বিমানপোতে উঠি না, আসন পাতি এমন যানে, মাটির টান যাকে প্রতিপদে ব্যাহত করে ; সিন্ধুর বিশালতা উপভোগ করতে হ'লে আমি নিস্তট সাগরে ঝাঁপ দিই না, দাঁড়াই গিয়ে এমন উপকূলে যেখানে পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রচেতার আক্রমণকে প্রতিক্ষণ প্রতিহত করে ; আমার সমীপদর্শী চোখে মানুষের মাহাত্ম্য তখনি পরিস্ফুট হয়, যখন বুঝি ওথেলোর কত বড় অভীপ্সা কতটুকু আঘাতে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলো। আমি নিজে অপদার্থ ও অপারগ ব'লেই ব্যক্তিবাদের ভয়াবহ সঙ্কল্প আমাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে। সম্ভবত সেই জন্যেই আমি ভবিষ্যৎকে ভবিতব্য ব'লে

ভুল করি, সেইজন্যেই আমার দৃষ্টি আগামী কালের অপূর্ব্ব আশ্বাসের দিকে না-তাকিয়ে, ছুটে চলে সেই অখ্যাত অতীতের পানে যেখানে মানুষ সমবেত চেষ্টায় আপনার অধীনতা দূর করেছিলো। কিন্তু যেহেতু আমার সমষ্টিবাদ অত্যন্ত আন্তরিক, সম্পূর্ণ অখল, তাই এই একান্ত উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও জানি যে, আমার মোক্ষের মার্গ, হয়তো অন্যের পক্ষে মুমূর্ষার নামান্তর।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বিবাহ ও নীতি *

বিবাহে আর নরনারীর অন্যান্য যৌন সম্পর্কে সব চেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, বিবাহ আইনসম্মত, আর সেই জন্যে তা কড়া পাহারায় ঘেরা। গোড়ার কথা বলতে গেলে বিবাহ-ঘটিত আচার-ব্যবহার গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ তিনটে জিনিস নিয়ে। প্রথমটি মানুষের প্রবৃত্তিমূলক, দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক এবং শেষেরটি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা। এদের কোনোটিকেই আলাদা ক'রে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে ফেলা যায়না বটে, কিন্তু এরা যখন পরস্পরের সঙ্গে একটা ছুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে তখন আবার মুস্কিল বাড়ে বই কমেনা। প্রবৃত্তি আর ধর্ম্মের কথাই আগে ধরা যাক, কারণ এদের সম্বন্ধটাই আমাদের আলোচনায় বেশি ক'রে উঠবে।

ধর্ম্মের যে-সব অনুশাসন মানুষের জীবনে খুব প্রবল, সেগুলো প্রায়ই তার প্রবৃত্তিজাত। তবে পরে সেই সঙ্গে সংস্কারপ্রিয়তাও যোগ দেয়। আবার যৌনবোধ যে পূরোপূরি প্রবৃত্তিমূলক নয়, প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতাই তার চরম সাক্ষ্য। অথচ সমাজের ও ধর্ম্মের মধ্যে দিয়ে উল্‌টো কথাটাই সত্য ব'লে জাহির করবার মারাত্মক চেষ্টা চলছে। মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রবৃত্তির থেকে কত তফাৎ তা যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো ক'রেই বোঝা যায়।

বিবাহের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধকে স্থায়ী করার প্রয়াসই প্রধান। ঠিক এমনি ধরণের স্থায়িত্ব পশুজগতেও অল্পবিস্তর দেখা যায়, বিশেষ ক'রে যখন সন্তান-সন্ততি লালনপালনে পুরুষের সাহায্য ও সাহচর্য্য আবশ্যক হয়। জীবনধারণের জন্যে সন্তানের পক্ষে পিতা অদরকারী হতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে পিতার প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করাও শক্ত। পিতৃস্নেহ কতটা প্রবৃত্তিমূলক, সে-বিষয়ে মতভেদ থাকলেও মোটের উপর মানুষের অন্যান্য প্রীতিবন্ধনের মতো পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সামাজিক নীতির আবেষ্টনে সহজ হয়েই গড়ে উঠেছে। পশুদের তথাকথিত বিবাহের মধ্যে একবিবাহের প্রচলন বেশ বেশি। এমন কি অনেক পণ্ডিতের মতে এই আদর্শ পশুদের পক্ষেই স্বাভাবিক, কেননা তাদের ভিতরে বিবাহের পরে পরকীয়া-প্রীতি মোটেই দেখা যায় না। কিন্তু পশুর পক্ষে এই নিয়মটা সাধারণ হলেও, মানুষের বেলায় ব্যতিক্রমটাই প্রথা; আর তাই থেকেই অসংখ্য সমস্যার স্থষ্টি। এ থেকে বোঝা যাবে যে, ধর্ম্ম অথবা আইনের সাহায্য না-নিয়েও, শুধু প্রবৃত্তির উপরে নির্ভর ক'রেই বিবাহের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।

* বার্ট্রেণ্ড্ রাসেলের "ম্যারেজ্ এণ্ড্ মরাল্‌স্" পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ এতই দৈহিক যে, বিচারবুদ্ধিব্যতিরেকেও তা আমাদের চোখে পড়েছিলো। কিন্তু পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ততটা দৈহিক নয় ব'লে সেটা আবিষ্কার করতে অনেকদিন বিলম্ব হয়েছিলো। সেই অবকাশে সমাজ, ধর্ম্ম ও আইন বিবাহ-অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে গেলো। ফলে বিবাহের মধ্যেই মানুষ পারিবারিক জীবনের প্রথম আস্বাদ পেলে। কিন্তু বিবাহসম্বন্ধে মানুষের আদিম মনোভাব—যেটা একবিবাহের পরিপন্থী—তার পরিবর্ত্তন অত্যন্ত ধীরে ধীরে হতে লাগলো। এই পরিবর্ত্তনের মূলে আর্থিক কারণই সব চেয়ে বেশি বর্ত্তমান। মানুষ যতদিন কৃষিজীবী ছিলো, ততদিন স্ত্রী-পুত্রের সংখ্যাধিক্যই যে তার পক্ষে লাভের, তা সহজেই অনুমেয়। এমনি ভাবে বহুবিবাহ প্রথার মধ্যে দিয়েই সবপ্রথমে নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ককে সাংসারিক অন্যান্য প্রয়োজনের তুলনায় গৌণ করা হলো। এবং সেইজন্যেই সে-যুগের আইন স্ত্রীজাতির অনুকূল হলোনা। তবে সৌভাগ্যের বিষয় পক্ষপাতের প্রতিক্রিয়া খুব শীঘ্রই সুরু হলো এবং ধর্ম্মের সাহায্য পেয়ে বিবাহপ্রথায় অসাধারণ সাফল্যও এলো অচিরে। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ সংস্কারের পর্য্যায়ে উঠে দাঁড়ালো। এবং সে-সূত্র স্বামী-স্ত্রীর জীবনে ছিন্ন হবার নয় ব'লেই মানুষের যৌন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন দরকার হয়ে পড়লো।

ধর্ম্মের অনুশাসনে নারী হয়তো পুরুষের যথেচ্ছাচার থেকে কিছু রক্ষা পেলে, কিন্তু মোটের উপর তার অবস্থার বিশেষ বদল ঘটলো না। পুরুষের সঙ্গে তার যৌনসম্পর্ক আগের মতোই ধরাধরিতে বাঁধা রইলো। স্বামী তার বিবাহিত জীবনের একমাত্র আরাধ্য অধীশ্বর; তবে আধ্যাত্মিক জীবনে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ এখন আর ততটা নিষিদ্ধ রইলো না। বিবাহিত জীবনে থেকেও সে অনায়াসে স্বামীকে ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হতে পারে। এতে নিন্দার চেয়ে গৌরবই বেশি। মানুষ যতদিন তার স্বাধিকার-সম্বন্ধে সজাগ হয় নি ততদিন বিবাহিত জীবনে স্বাধীনতার অভাব তাকে তেমন পীড়া দেয় নি। কিন্তু সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অধিকার যেই চিনতে শিখলে অমনি নূতন বাধা তাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। এই বিদ্রোহের ধাক্কা সব চেয়ে বেশি লাগলো বিবাহ অনুষ্ঠানে, কারণ একা বিবাহই নর-নারীর জীবনের অধিকাংশটা জুড়ে বসে থাকে। তা ছাড়া যৌবন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ পছন্দ করে না; গাছের অসংখ্য ডালে সদ্য ফোটা নানা রঙের ফুলের অসংযত প্রকাশ দেখে সংযম শিক্ষা করা খুব সহজ নয়।

তাই নীতিবাগীশেরা বললে, মানুষ সভ্য হলো আর বিবাহের মধ্যে এ কি দুর্নীতির ঝড় উঠ্‌লো। হয়তো এটা সত্য যে, আজ-কালকার

মানুষ আর সারা জীবন শুধু একজনকে সঙ্গী ক'রে থাকতে রাজি নয়। কিন্তু এটা কি দুর্নীতিপ্রসূত অসহিষ্ণুতা না জীবনে সত্যানুসন্ধানের ফল? আজো তো দেখা যায় যে, দেশে দেশে পুরুষে পুরুষে তফাৎ করা হয় না, কেবল মেয়েদেরই এক পর্য্যায়ে ফেলে বলা হয় বিবাহ যাবজ্জীবনের বন্ধন—সুখেরই আকর। এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করেন বলেই শাস্ত্রকারেরা বিধান দেবার বেলা বিবাহকে অচ্ছেদ্য না করার কারণ খুঁজে পান নি। কিন্তু চলার পথে এ উপদেশ মানুষের কাছে সঙ্গত ঠেকে না। সে দেখে যে, শুধু চিন্তার দ্বার রুদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়—সারা জীবনকে নির্জলা ও আকর্ষণশূন্য না করতে পারলে বিবাহে চলনসই সুখ, এমন কি মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য আনাও অসম্ভব। তাই যেখানে নরনারী বিবাহ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না সেখানে বিবাহ কতকটা সুখের হয়। অন্যত্র তা শুধু ভাগ্যবিড়ম্বনা। সমাজের শাসনে মানুষ যখন বিবাহের চেয়ে বড় কিছু সুখের আশা ছেড়ে দেয় তখনই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আচরণে বিরাগের কারণ দূর হয়। কিন্তু এই দুরাশা ত্যাগ করা আজকে অত্যন্ত কঠিন, সেই জন্যেই পুরানো সমাজের বিবাহ অতি আধুনিক বিবাহের চেয়ে বেশি সার্থক হতো।

কিন্তু আজ যদি সেই সার্থকতার দোহাই দিয়ে আমরা আর নব অভিযানে অগ্রসর না হই তবে আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন তাতে তৃপ্ত হবে না। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে সভ্যতার উচ্চতর ধাপে উঠে বিবাহিত জীবনের অসামঞ্জস্যের সমাধান করা। যাকে বরণ করেছি তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার সাহস যেন আমাদের হয়।

বিবাহের নিষ্ফলতার কারণ খুঁজলে সব প্রথমেই যারা বিবাহিত জীবনের জন্যে তৈরী হচ্ছে তাদের যৌনজ্ঞানের অভাব চোখে পড়ে। যেখানে অজ্ঞতা ভয়াবহ সেখানেই তার অহৈতুকী প্রশংসা চল্‌ছে। আমরা গোড়ায়ই বলেছি যৌনবোধ তত বেশি প্রবৃত্তিমূলক নয়, তার উপরে যদি বিবাহিত জীবনে এক পক্ষ পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে অপর পক্ষের অজ্ঞতার অপব্যবহার করার চেষ্টা করে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনুরাগ-সঞ্চারের যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হয়। পূর্ব্বরাগের আকর্ষণকে বিবাহের পরেও স্থায়ী করতে হলে আমাদের মধ্যে যৌন শিক্ষার প্রচলন দরকার।

আর এক কারণে আমাদের বিবাহ অত্যন্ত অসুখের হয়ে ওঠে। বর্ত্তমান সমাজ-শাসনে শৈথিল্য এসে পড়ায় মানুষের মন গোড়াকার সংযমকে আর বড় বলে মান্‌তে চায় না। ফলে বহুবিবাহের প্রবৃত্তি আধুনিক সভ্য মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর দেখা যায়। এইজন্যেই গভীর প্রণয়ের

ফলেও যে বিবাহ সম্পন্ন হয় কিছুকাল পরে তাতেও ভাঁটার স্রোত বইতে থাকে। এই হ্রাসের জন্যে স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যৌনসম্পর্কও বোধ হয় দায়ী। তাই নর-নারী আবার তাদের প্রথম জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রত্যাবর্ত্তন দেখ্‌তে চায়; নতুন সঙ্গীর সহায়তায়। সুনীতির অজুহাতে একে বাইরে থেকে দমন করা সম্ভব হলেও ভিতরের হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত রোধ করা যায় না। বর্ত্তমান যুগের নারী-প্রগতি ব্যাপারটিকে আরো জটিল ক'রে তুলেছে। পুরাকালে নারী পুরুষের উপযোগী হলেই মোটামুটি কাজ চ'লে যেতো কিন্তু আজ নারী তার স্বকীয় সত্তা সম্বন্ধে খুব সজাগ হয়ে উঠেছে; পুরুষের উপযোগী হবার জন্যে তার যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে সে আর রাজি নয়—তাতে বিবাহ সুখকর হোক বা না হোক। কিন্তু পুরুষ অতীতের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি; তাই আজও নারীর সতীত্বের বিচার হয় সাবেক কালের সেই কঠোর নীতির মাপকাঠি দিয়ে। আমরা ভুলে যাই আগেকার সমাজে পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত খুবই কম ছিল, আর যাও বা দেখা যেতো তাও তাদের স্ত্রীদের কানে এসে পৌঁছাতো না। পৌঁছালে পুরুষ দোষ স্বীকার ক'রে অনুতপ্ত হতো। তাই সে অবস্থায় যে রীতি-নীতি বা আইনের উদ্ভব হয়েছিলো আজকে আর তার জের টানা চলে না। নারী নিষ্ঠার বিনিময়ে পুরুষের কাছে কি কিছুই চাইতে পারে না? চাইলে, পৌরুষ-অভিমানী পুরুষ এর কি প্রতিদান দেবে? পুরুষ যেমন নিজেকে নারীর উপযোগী ক'রে নিতে অস্বীকৃত হলে আপত্তি উঠে না, নারীও ঠিক তেমনি স্বাধীনতা দাবী করে। এইজন্যেই বর্ত্তমান বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যনিষ্ঠার কথাকে আর তেমন বড় ক'রে দেখা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবাহে ঈর্ষাকে একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি ব'লে মেনে তাকে যথেচ্ছাচারের সুযোগ না দিয়ে তার পিছনে কোনও নৈতিক সমর্থন নেই একথা স্বীকার করলে ঈর্ষা জয় হয়তো ঢের বেশি সহজ হবে। "প্রথম দেখায়" প্রণয়ের সম্বন্ধে আমরা যতই মুখর হই না কেন কালের গুণে বহুদিনের সাহচর্য্য ক্রমে মৌরশী হয়ে আসে এবং মৌরশী হয়ে আসে ব'লে আমাদের মন শেষ পর্য্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেয়। এইজন্যেই তাকে নবীন প্রেমের কাছে পদে পদে প্রত্যাখ্যাত হতে দেখলে আমরা গোপনে ব্যথা পাই।

প্রণয় বা ভালবাসা বিবাহকে সুখসম্পদে ভরে দেয় বটে তবু যাঁরা প্রণয়ের পরিণতিতে বিশ্বাসী তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, কর্ত্তব্যবন্ধনের চেয়ে মুক্তির মধ্যেই প্রেম বেশি সার্থক। সাধারণতঃ বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সন্দেহের সূত্রপাত হয় ব'লে তাতে পাহারার প্রয়োজন ঘটে, ফলে প্রণয়ের সচ্ছন্দতা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফুল পড়ে থাকে, গন্ধ চ'লে যায়;

অর্থহীন বন্ধনে জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। নিবৃত্তির নিষ্ফলতা বিবাহকে পাশে পরিণত করে।

তাই আবার যদি বিবাহকে সুন্দর ও সুখকর করতে হয় তবে তার বন্ধন যেমন সহজসাধ্য হবে মোচনও ঠিক তেমনি ধরণের হওয়া চাই। মনের গরমিল যেখানে স্পষ্ট, বাইরের চটক সেখানে ফাঁকি। নারী যে বিবাহে প্রস্তুতী নয় সেখানে মনের গরমিল ঘট্‌লে বিচ্ছেদই একমাত্র কর্ত্তব্য। অপর ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততির মুখ চেয়ে কেবল যৌনতৃষার তাড়নে নর-নারী বিবাহবন্ধন থেকে তত সহজে মুক্তি নিতে পারবে না। পিতামাতার মনের বিকার যেখানে সুস্পষ্ট সেখানে সন্তানের মানসিক ও শারীরিক অধোগতিও নিশ্চিত। তাই পিতামাতা যদি পরস্পরের মধ্যে আর কোন আকর্ষণই না দেখতে পায়,—এমন কি অপর কারুর প্রতিও যদি ক্ষণিকের জন্যে আসক্ত হয়ে ওঠে, তবু সন্তান-সন্ততির মঙ্গলকল্পে যতদিন প্রয়োজন ও সম্ভব বিবাহিত জীবনের কোমলতা রক্ষা করা তাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

তাই মনে হয়, প্রবৃত্তিকে নিষ্পেষণ না ক'রে তাকে সুচালিত করলে বর্ত্তমান বিবাহ সুখকর হবে। তার জন্যে প্রচলিত সুনীতি হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, বদলাতে হবে, কিন্তু তা'তে পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। বিজ্ঞান ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে এবং মানুষের নূতন-বিলাসী মন অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছে, আরো অনেক তথ্যসন্ধানে রত। এক্ষেত্রে যদি নূতন অভিজ্ঞতার ফলে বিবাহকে সামাজিক সংস্কার ব'লে না মেনে তাকে ব্যক্তিগত সমস্যার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায় তবে কিছু ভুল হবে না। এখানে সমাজের ও আইনের প্রাধান্যকে যতটা কমানো যাবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ হবে ততই সরল।

এমনি উপায়েই সমাজ ও আইনের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে নর-নারী একদিন বিবাহিত জীবনের সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রী প্রচার করবে এবং তারই ফলে তাদের সখ্যও হবে নিবিড় এবং আনন্দও হবে অতুলনীয়।

শ্রীপদ্মা বসু

আধুনিক কাব্য

মডার্‌ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখ্‌তে অনুরোধ করা হয়েচে। কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বল্‌তে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক্‌ আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চল্‌ত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্ণ্‌স্‌ থেকে তার সুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ডস্বার্থ কোলরিজ শেলী কীট্‌স।

সমাজে সর্ব্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে—রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটা তিলক কেটে চল্‌লে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্ণ্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এলো সে যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জ্জি এসে উপস্থিত। "কুমুদ-কহ্লার সেবিত সরোবর" হচ্চে সাধু-কারখানায় তৈরী সরকারী ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে বুলি সরিয়ে পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হ'য়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে "ধিক্‌"।

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া সুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জ্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে তর্জ্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক্‌, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্চে ব্যক্তিগত খুসির দৌড়। ওয়ার্ডস্বার্থ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন, সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলীর ছিল প্ল্যাটোনিক

ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্ম্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্য্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীটসের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্য্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম ক'রে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরুপ-করণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্প-কলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েচে, প্রিয়শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্য সংসার রচনা করত তার রচনা-কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্কে জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিষ ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না, চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জান্‌ত তরুণীরা, নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা, তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোলো তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখ্‌ছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা, মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়, শেলীর ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠ-কেরও নিজের হ'য়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়, সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান, সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে

সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয়, সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্চে উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হোলো আধুনিকতা।

কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্য-ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েচে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার ঠোঁটে রং লাগানো হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসঙ্কোচে। বল্‌তে চায় মোহ জিনিষটাতে আর কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ি নক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেচে, বল্‌চে মূলে মোহ নেই, আছে কার্ব্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গীতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেচি একথা কবুল করতেই হবে। ইসারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয় সত্যের আভরণ সেটাকে ত্যাগ করতে পারিনি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙীন আলো এসেচে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে লেগেচে, ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সঙ্কোচ লাগে? এই সঙ্কোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই? সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে আচ্ছন্ন করে না তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্য্যকে কি নিঃস্ব হ'তে হয় না?

কিন্তু আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিষটা জীবনের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেচে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু ক'রে কাজ, হুড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে মানুষ একদিন রয়ে বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাৎ দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারী আদর্শে কাজচালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হোলো কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা

জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সঙ্গীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ। জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয় সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হ'লে আজ কোন্ লক্ষ্য ধ'রে কোন্ রাস্তায় বেরোবে? নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা এ এখন আর চল্‌বে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয় সম্বন্ধবন্ধনে নয়। আমি কি ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিষটা স্বয়ং ঠিক মতো কি সেইটেই বিচার্য্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য-ব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চল্‌চে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখ্‌চেন—I am the greatest laugher of all—বল্‌চেন আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্য্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, এ্যাপলো দেবতার চেয়ে। Than the frog and Apollo এটা হোলো ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে ক'রে সাজিয়ে কথা কইচে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হোত সমুদ্র তা হ'লে এখনকার যুগ আপত্তি ক'রে বল্‌তে পারত ওটা দস্তুরমতো কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উল্টো ছাঁদের দস্তুরমতো কবিয়ানা হোলো ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয় একথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ এ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাইনে। এমন কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্ হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু অতি বড়ো

বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে হাসি সূর্য্যের, যে হাসি ওক্ বনস্পতির, যে হাসি এ্যাপলোর, সে হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েচে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙীন ছিল আজ সেটা ফিকে হ'য়ে এসেচে, সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না বস্তু চাই। ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং বল্‌লে প্রায় বারো আনা বেশি বলা হয়। একটি অধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে সম্ভাষণ করেচেন সেটাকে তর্জ্জমা ক'রে দিই। তর্জ্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে—চেষ্টাও সফল হবে না।

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি—
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজচে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েচে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্ত্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্চে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো,—
তোমার ঐ মিলে-মিশে যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
        তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
        তার ঝকমকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম, কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেককালের যে মাধুরী, তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্দ্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয়, তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তাহলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়? তার জোর হচ্চে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো। ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেচেন লাল চটি জুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যা-বেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইচে, ভিতরে পালিশকরা

কাঁচের পিছনে লম্বা সার ক'রে ঝুলচে লাল চটিজুতোর মালা like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হোলো, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া, তারা জিজ্ঞাসা করবে, "মানে কি হোলো, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, না হয় হোলোই বা তার রং লাল।" উত্তরে বলতে হয়, "চেয়েই দেখ না।" "দেখে লাভ কি ?" তার কোন জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে—সে থাক্‌তে পারল না, ব'লে উঠ্‌ল, "দেখ্‌ চেয়ে রে, কী সুন্দর।" এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেসচিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে লাফালাফি করতে লাগ্‌ল। বুড়োরা ধমক্ দিয়ে বল্‌লে, স্থির হ'য়ে বোস্। তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে ব'লে উঠ্‌ল, "কী সুন্দর।" কবি বল্‌চেন, শুনে I was mildly abashed।

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও, একই ভাষায় বল্‌তে কুণ্ঠিত হোয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক—নিছক দেখা, এর পংক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলঙ্কারের উপর নয়। কেননা অলঙ্কারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্চে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে

বিবিধপ্রকারে উৎপাত সুরু ক'রে দিলে। সে বল্‌লে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয় মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয় যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মান্‌লে না, মান্‌লে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বল্‌তে চায় আমি দ্রষ্টব্য। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিসির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্ম্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ সে হ'য়ে উঠেচে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনীকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারিনে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর, কেউ কাজের কেউ অকাজের, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল ক'রে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই রকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হ'য়ে থাকে তো আর কোনো জবাবদিহী নেই, যদি না হ'য়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে শুধু থাকে ভাবলালিত্য তাহলে সেটা বর্জ্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম্ম মেনেচে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এই রকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখ্‌চেন,—

এঘরে ওঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা
ধোঁয়াটে দিন পোড়া বাতি,।শেষ অংশে ঠেক্‌ল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা শার্সি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠ্‌চে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুক্‌চে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার মদের গন্ধওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্চে :—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েচ কম্বলটা,
চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্চ, দেখচ রাত্রিতে:প্রকাশ পাচ্চে

হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা' দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই ঃ—

His soul stretched tight across the skies
that fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জ্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগ্‌ল।—বল্‌লেন,—

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling;
The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিঁকল না। এইখানে কূপমণ্ডুকের মক্‌মক্ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ব্বিকার নন্। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্চে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেচেন সেটা এত কড়া—

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্চে, যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্চে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেককালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙীন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেচেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয় কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি নাও ফোটে তাহলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যটাকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে—এই বিশ্বের

সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না কিন্তু অধিকাংশ জগৎ সংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোম্যান্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তারপরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হ'তে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হ'য়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে অনাবৃত আকাশে পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্ন রকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে, কেউ বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে আকৃতি, তারও অন্তরে কেউবা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে, মনে করে না গূঢ় ব'লে কিছুই নেই, মনে করে না যা প্রতীয়মান তাতেই সব কিছু নিঃশেষে ধরা পড়চে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত কিছু আদব ও আব্রু, তা সাংঘাতিক সঙ্কটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হ'য়ে গেল, দীর্ঘকাল যে সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্ত্তে দীর্ণবিদীর্ণ হ'য়ে গেল; মানুষ যে সকল শোভন রীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জান্‌ত তাকে দুর্ব্বল ব'লে আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল, বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধ'রে নিয়েছে।

কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বল্‌তেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তালঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বল্‌ব না ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বল্‌ব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখ্‌বে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারি। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হোলো। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদাভাষায় তিনি লিখ্‌চেন :—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিইনে। আমার মন নিঃস্তব্ধ।
যে আর এক আকাশে আর এক পৃথিবীতে
বাস করি—
সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচ গাছে ফুল ধরে
জলের স্রোত যায় বয়ে ॥

আর একটা ছবি :—

নীল জল··········নির্ম্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেচে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল
তারা বাড়ি ফিরচে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর একটা :—

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে শাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগচে না।
টুপিটা রেখে দিয়েচি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার পরে।

একটি বধূর কথা :—

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো তাতে কপাল ঢাকৃত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।

চাঙকানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হোলো যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হোত না,
অন্ধকার কোণে থাকৃতুম মাথা হেঁট করে,
তুমি হাজারবার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুরকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুন। বুঝলুম প্রেমের আয়ু ধুলোকে ছাড়িয়ে যায়।
মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত থাকতে পারতুম আমার আসনে,
নীরব জাগরণের তোরণেও ভরসা থাকৃত মনের মধ্যে।
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল,—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হল্‌দে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্চে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকৃতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙফেঙশার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেণ্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তারপরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখচিনে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। ষ্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিষটা আধুনিক হোত। কেননা সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুকনো চিংড়ি মাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে? এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুট্‌কি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, "এটা কী হোলো?" একেলে কবি উত্তর করত, "এমনতরো হয়েই থাকে।" "অন্যটাও তো হয়।" "হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর সৌখীন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।" সেকালে কাব্যের বাবুগিরি

ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে সেটা পচামাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখচে ও দেখাচ্চে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধূলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ব-বিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে, বলে আসল জিনিষটা এতদিনে ধরা পড়েচে। সেই ঢেলা সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়চে। বিষয়টি এই :— বুড়ি মারা গেল—সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলমিলি-গুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এদিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনার টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠ্‌বে, তাহলেই কি যথেষ্ট হোলো? এ কবিতাটা লেখবার গরজ কি নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন? একটি 'মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তাহলে বলব এ খবরটা দেবার মতো বটে কিন্তু তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্‌ট্‌ এলো, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে, মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েচে, তাহলে বলতে হবে নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তাহলে সন্দেহ করব তারো মেজাজে পোকা পড়েচে। যদি বলা হয় আগেকার কবিরা বাছাই ক'রে কবিতা লিখ্‌তেন অতি আধুনিকরা বাছাই করেন না সে কথা মান্‌তে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুক্‌নো পোকায় খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাৎ এই যে, এঁরা সর্ব্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার সখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিষ খায়, দূষিত জিনিষ ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিষে তাদের পক্ষপাত, তাতে ফল হয়, অভালো জিনিষেই তাদের পক্ষপাত পাকা হ'য়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তাহলে শুচি জিনিষে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়? কোনো কোনো

গাছে ফুলে পাতায় কেবলি পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না—প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব সাধনা ব'লে বাহাদুরী করতে হবে?

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করচেন :—

রিচার্ড কোডি যখন সহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত,
ছিপ্‌ছিপে যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন, গুড্‌ মর্ণিং, আমাদের নাড়ি উঠত চঞ্চল হ'য়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব,
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা কিছু এঁর চোখে পড়ত, মনে হোত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এদিকে আমরা যখন মরচি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটেনা,
গাল পাড়চি মোটা রুটিকে,—
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।*

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয়, তার পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেচেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেচেন মাটির নীচে গলিত দেহকে কেমন ক'রে পোকায় খাচ্চে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংসরসরক্তের কদর্য্য সমাবেশ সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতি-শাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্য সাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় এই রকম

* মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জ্জমা করতে হোলো, কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি ত বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেচে। কিন্তু এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগ্‌ল শ্মশানের হাওয়া,—এমন কথা সে খুসি হ'য়ে বল্‌তে সুরু করেচে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা ?

মন যাদের বুড়িয়ে গেচে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হ'য়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়, গাঁজিয়ে ওঠা পচা জিনিষের মতো যত কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে, লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ ক'রে তবে তার বলি-রেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক'রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এযুগ বাস্তবকে অবমানিত ক'রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক্‌ মন এমন বিগ্‌ড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ করো তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উল্টো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয় অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েচে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাসান

১

কাকের ডাক, মোটরের হর্ণের শব্দ, ট্রামের চাকার ঘড়ঘড়ানি, ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়, "পাথ্‌রী চুণ, পাথ্‌-থ্‌রী চূ—ণ"। ভোরের কল্‌কাতা চিড়্‌বিড়ে আলোয় তেতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কোলাহলের ভুড়ভুড়ি ভাঙ্‌তে থাকে।

সমস্ত রাত ধ'রে কে যেন দেহটাকে খাটের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, রোজ রাত্রে যেমন বাঁধে। কনুয়ে ভর দিয়ে আধখানা শরীর তোলে ত বাকী আধখানা দ্বিগুণ ভার হয়ে বিছানার সঙ্গে লেপ্‌টে থাকে, রোজ যেমন হয়। কিন্তু আজ ফিললজির টুটরিয়াল। কাল প্রায় সারাটা রাত সুইন্‌বার্ণের অ্যাটালাণ্টা নিয়ে কাট্‌ল, বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে এর পর দেরি করলে টুটরের কাছে মুখ থাক্‌বে না।

ফিললজির টুটর। অবিনাশের মনটা ভোরের আলোরই মতন একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতার জ্যোতিঃতে ভ'রে উঠ্‌ল। ভারি চমৎকার মানুষটি! কি কারণে যে চমৎকার তা সে জানে না, কিন্তু তার ভারি ভালো লাগে। সপ্তাহে দুদিন ত মোটে এক ঘণ্টা ক'রে দেখা হয়, আজ অবধি একটা কথাও হয়নি তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ক্লাসঘরের দোরগোড়ায় প্রোফেসার লাহিড়ীকে দেখ্‌লেই তা'র মনটা অকারণে খুসি হয়ে ওঠে। কেমন্‌ ছেলেমানুষের মতো কচি মুখ, হাসি-হাসি ভাব, দৃষ্টিমাত্রে তা'র নিজেরও মুখে একটি সলজ্জ হাসির ছোঁয়াচ এসে লাগে। সেই হাসিটুকু দিয়েই নীরবে নতশিরে তাঁকে সে সম্ভ্রমভরা অভিনন্দন জানায়।

ফিললজির মতো নীরস কাঠখোট্টা একটা জিনিস, কিন্তু উনি যখন পড়ান, মনে হয় সেতার বাজ্‌ছে। তন্ময় হয়ে শুন্‌তে হয়, তাঁর দিক্‌ থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

তাঁর দিকে চেয়ে থেকে থেকে অবিনাশের মনে হয়, যেন ওঁর মনের ভিতরটা ওঁর মুখশ্রীর মতোই স্নিগ্ধোজ্জ্বল। যেন ওঁর চিন্তাগুলি চমৎকার দামী রেশমে বাঁধা, প্রত্যেকটির গায়ে সোনার জলে নাম লেখা। বাইরের আলোর তীব্রতা রঙীন কাচে ছাঁকা হ'য়ে তাঁর মনের মধ্যে স্নিগ্ধ হয়ে পড়ে। বাইরের ধূলি-মলিনতা সেখানে ঢুক্‌তে পায় না। সব-কিছু সেখানে সারাক্ষণ তক্‌তক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

অবিনাশ শিয়রের কাছে কেরাসিন কাঠের টেবিলটার উপর থেকে অমৃতবাজার-পত্রিকায় মোড়া ফিললজিটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল। গভীর প্রীতির সঙ্গে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে একটা-দুটো ক'রে তার পাতা-কয়েক

ওল্টাতেই চোখে-কানে যেন নেশা লাগ্‌ল; ঘুম ছুটে গেল। মনে মনে একটি ক'রে sentence পড়ে, ট্যুটরের কণ্ঠস্বর কানে বাজ্‌তে থাকে। তার মন যেন তারপর আর নিজের কণ্ঠে কথা কয় না, ট্যুটরের কণ্ঠস্বর দিয়ে তার কণ্ঠে সুর ফোটাতে হয়।

কাল রাত্রে ময়লা পাঞ্জাবীটা সাবান-কাচা ক'রে মশারির দড়ির ওপর মেলে দিয়েছিল, বিছানা ছেড়ে উঠে মুঠোয় ক'রে অনুভব ক'রে ক'রে দেখ্‌ল সেটা ঠিক শুকিয়েছে কি-না। তারপর টেনে টেনে লাট ভেঙে সেটাকে আরো ভালো ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে, চোখেমুখে জল না দিয়েই বই নিয়ে এসে ব'সে গেল।

বিছানার শিয়রের দিক্‌টা তার চেয়ার, তৈলচিহ্নিত বালিশটাকে তখনকার মতো ঠেলা মেরে সরিয়ে রাখ্‌তে হয়। তক্তপোষের গা ঘেঁসে কেরোসিন কাঠের একটা নড়বড়ে টেবিল, বই রেখে পড়া যায় কিন্তু লিখ্‌তে গেলে হাত যত নড়ে টেবিল নড়ে তার চেয়ে বেশি। পায়ের কাছে কাঁসার গেলাসে ঢাকা একটা জলের কুঁজো, সাবধানে পা রেখে বস্‌তে হয় উল্টে দেবার ভয়ে।

কিন্তু ভয় কি ঐ একটা? অবিনাশ ত্রস্তে একবার পাশের খাটটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। গোপাল তখনো ঘুমচ্ছে। যদি অবিনাশের কপাল-জোর থাকে, আরো ঘণ্টাখানেক সে ঘুমবে। তার মধ্যে তাড়াহুড়ো ক'রে সকালের পড়া যেটুকু কর্‌বার ক'রে নিতে হবে। রাত্রের পড়ার জন্যে ভাব্‌তে হয় না বেশি, কেননা সাড়ে এগারোটার শেষ সিনেমা না দে'খে গোপাল প্রায়ই বাড়ী ফেরে না। যেদিন সিনেমায় যায় না, সেদিন রাত আরও বেশি করে। তারপর এসেই জুতো-জোড়া লাথি ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুলে, জামাকাপড় না-বদ্‌লেই বিছানায় চিৎপাত হয়ে প'ড়ে টেনে ঘুম দেয়। কিন্তু ভোরের বেলাটা সে যদি কোনওপ্রকারে একবার জাগে তবে সেদিনকার মতো সব কাজ একেবারে মাটি। ঘরের মধ্যে আকবরের নওরতন সভা ব'সে যাবে একেবারে, কার সাধ্য বইয়ের পাতায় মন রাখ্‌তে পারে। প্রোফেসার লাহিড়ীর স্বপ্নময় প্রভাবকে তার অট্টহাসির শব্দ এখনই ভোঁতা ছুরীর মতো ঘস্‌ড়ে ঘস্‌ড়ে কাট্‌তে থাক্‌বে। ভগবান্ করুন ও ঘুমোক আরও ঘণ্টাদুই।

অবিনাশের ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌ল, গোপালের বিছানার ওপাশের জান্‌লাটা একটু খোলে। চোখ তার ভালো নয় প্রায় কোনোকালেই, পয়সার অভাবে চশ্‌মা নেওয়া হয় না, একটু আলো কম হ'লে ভারি পড়্‌তে কষ্ট হয়, দুচোখ ভ'রে জল আসে। বন্ধ দরজা-জান্‌লায় মেসের ঘরে তত বেলাতেও প্রায় রাত্রিরই মতো অন্ধকার। কিন্তু পাছে চোখে

আলো লেগে গোপাল জেগে ওঠে, এই ভয়ে সে আর উঠ্‌ল না। না-হয় একটু কষ্টই হবে, কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। বইয়ের ওপর আরও একটু ঝুঁকে প'ড়ে পড়া কর্‌তে লাগ্‌ল। ছোট হরফের ফুটনোটগুলো আঙুল বুলিয়ে পড়্‌তে হয়, কপালের ওপর ভুরুদুটো একসঙ্গে এসে ঠেকে, উপায় নেই।

একটা দরকারী খাতা বের কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে, টেবিলের সেদিক্‌টা একগাদা বিলিতি ছবির কাগজে একেবারে ঠাসা। গোপালের সম্পত্তি। রাত্রের ঝোঁকে আত্মপর ভেদ করেনি। Photoplay, Dance, Film Fun, London Life, Bal de Moulin Rouge-এর Souvenir আরও কত-কি। মলাটের ছবি দেখ্‌লেই আঁৎকে উঠ্‌তে হয়। অবিনাশ সেগুলির থাক্ না ভেঙে ওপরের দিকটা একটুখানি ফাঁক ক'রে ক'রে আল্‌গোছে কেবল নামগুলো প'ড়ে দেখ্‌লে। সম্ভবতঃ তার হাত একটু কাঁপ্‌ছিল, সব-শুদ্ধ সরিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে দুপ্‌ ক'রে শব্দ হ'ল। গোপাল ডান কাতে শুয়েছিল, বিকট মুখভঙ্গী ক'রে গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুল। অবিনাশের বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, মনে মনে পড়া কর্‌তেও এরপর তার ভয়, কি-জানি তার মনের গলার আওয়াজ শুনেই গোপাল যদি জেগে ওঠে।

ততটুকুরও দরকার হ'ল না। গোপাল জাগ্‌ল। চোখ তাকিয়েই সটান দেহটাকে স্ক্রুয়ের ধরণে একটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে তুলে উঠে বস্‌ল—একেবারে পদ্মাসনে যোগী সন্ন্যাসীর ভঙ্গীতে। বল্‌লে, "কি কপাল! এত ফিকির ক'রে সব গুছিয়ে আন্‌ছি, আর মাঝ থেকে ঘুমটাই গেল ভেঙে! স্বপ্ন আরও দেখ্‌ব, কিন্তু Merlene Dietrich-কে চুমো খাওয়া, সে কি আর ইচ্ছে কর্‌লেই ঘট্‌বে?"

অবিনাশ ফিললজির পৃষ্ঠার উপর প্রায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌ল।

গোপাল বল্‌লে, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। আমার যেমন বুদ্ধি, তাই এত লোক থাক্‌তে তোমায় বল্‌ছি এসব দুঃখের কথা। তুমি পড়, পড়; কি পড়্‌ছ ওটা?" ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বল্‌তে লাগ্‌ল, "কি পোষাক পরা ছিল জানো? টাইট্ শাদা undies, মাথায় একটা টপ হ্যাট্, ব্যস্ আর কিচ্ছু না। ফাইন্ দেখাচ্ছিল, যাই বল।"

অবিনাশ ফিললজিটা সরিয়ে রেখে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের পোএটিক্যাল্ ওয়ার্ক্‌স্ টেনে নিল।

গোপাল বল্‌লে, "ওরে আমার যাদু রে, একটা বাইবেল ঘরে রাখনি? একখানা শ্রীমদ্ভাগবৎ? ও কুঁজোটাতে কি রেখেছ, কালিঘাটের গঙ্গার জল? নিজের চারদিকটাতে ভালো ক'রে ছিটিয়ে নাও, আমি যাচ্ছি। ভজুকে ডেকে ব'লে দেব একটু গোবর এনে দিতে?"

অবিনাশের চোখদুটো ছলছল ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু কোন্ কথার কি-রকম ক'রে জবাব দিতে হয়, কলেজে কেউ তাকে তা শেখায়নি। সে চুপ ক'রে রইল। গোপাল উঠে পড়্‌ল। গুন্‌গুন্ করতে করতে পরণের কাপড়টাকে লুঙির মতো ক'রে ঘুরিয়ে প'রে নিল। মশারির দড়ির ওপর ঝুলানো জামাটার পকেট হাত্‌ড়ে সিগারেট্-কেস্ বা'র ক'রে সিগারেট্ ধরাল, তারপর বেরিয়ে যাবার মুখে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে আবার একবার সে অবিনাশের দিকে ফিরে তাকাল। অবিনাশের বুকটা দুর্‌দুর্ করতে লাগ্‌ল।

গোপাল বল্‌লে, "ভয় নেই, ভজুকে সত্যিই গোবর আন্‌তে বল্‌ব না। কি আর এমন হয়েছে, স্বপ্ন বই ত কিছু নয়? সত্যিকারের exploits যদি দুটো-একটা তোমাকে শোনাই, গোবরছড়ায় তাহলে আর কুলোবে না, এই অপবিত্র মেস্ ছেড়ে বাকী জীবন পিঁজ্‌রাপোলে গিয়ে বাস করতে হবে।"

অবিনাশের জীবনের সব-চেয়ে বড় সমস্যা গোপাল। গোপাল তার জীবনাকাশের ধূমকেতু। আর কতটুকু নিয়েই-বা তার এই আকাশ, মেসের এই অন্ধকার ঘরটার দেয়ালগুলোর মধ্যেই তার প্রায় বারো-আনার ঠাঁই হয়, বাকী চার-আনা কলেজে। গোপাল আর প্রোফেসার লাহিড়ী, এই দুটি মানুষকে নিয়ে সে ভাবে। তার বৈচিত্র্যহীন ছোট সুখদুঃখের জীবনের দুইদিকে এই দুটি মানুষের পাহারা, ভিতরটা প্রায় বই দিয়েই ঠাসা।

স্নানের ঘর থেকে গোপালের গলা শোনা গেল, "এই সুরেন্, আমি যাচ্ছি কয়েক হাত খেল্‌ব, আমাকে partner ক'রে নিও কেউ-একজন।"

অবিনাশের আশা হয়, হয়ত পাশের ঘরে ব্রিজের আড্ডা বস্‌বে, গোপালের হাত থেকে রেহাই পাবে সে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যে। কিন্তু তার কপাল মন্দ, মুখ ধুতে গোপালের দেরি হয়ে গেল, সুরেনের ব্রিজের আড্ডায় তার ঠাঁই হ'ল না। সে ঘুরে ঘুরে লোক জুটাল, তারপর নরেশ, বিলাস, অমর আর সে হুড়-মুড় ক'রে অবিনাশের পড়ার জায়গায় এসে ঢুকে পড়্‌ল। অবিনাশ বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে অত্যন্ত কাতরভাবে তাদের দিকে তাকাল, কিন্তু তাদের কারও দয়া হ'ল না। নরেশ বল্‌লে, "ড্যামিট্, কাল সরস্বতী-পূজো, অনধ্যায়।' আজকে থেকে প্র্যাক্‌টিস্ না করলে তোমার মতো বইয়ের পোকা, কাল্‌কে ঠিক ফেল্ করবে।"

অমরের দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নেই। হাতের Green Mansions খানার থেকে চোখ না তুলেই বল্‌লে, "সরস্বতী-পূজোয় অনধ্যায়, এ না হ'লে তোমাদের জাতের এ দশা হবে কেন? বিশ্বকর্ম্মা পূজোর দিনে দেশশুদ্ধ লোকের কর্ম্ম নেই। কি এর মানে বল্‌তে পার?"

তাস-জোড়াকে বার-সাতেক ভেঁজে বিলাস গোপালকে দিয়ে সেটা এবার কাটিয়ে নিচ্ছিল, বল্‌লে, "এও আর বুঝলে না? সাইমন কমিশন যখন এসেছিল, কি হয়েছিল? হরতাল হয়নি? এও আমাদের এক-রকমের হরতাল। যে-দুটি দেবতার নাম করলে, তাঁদের রাজত্বে খুব যে সুশাসনে আছি তা-ত বলা যায় না। নাও, এবার বই রাখো, তাস দিচ্ছি।"

অবিনাশ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো ব'সে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাদের খেলা দেখ্‌ল, দুএকবার উঠ্‌তে গেল, কেউ না কেউ হাত ধ'রে টেনে তাকে বসিয়ে দিল।

নরেশ বল্‌লে, তুমি আম্পায়ার। গোপাল বল্‌লে, কেউ দেখ্‌ছে না জান্‌লে খে'লে আমার সুখই হয় না। কিন্তু ক্রমে তাদের তন্ময়তা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। অবিনাশ কখন যে উঠে গোটা-দুই বই হাতে ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তখন আর তা'রা তা লক্ষ্য করলে না। অমর খেলায় কোথায় কি finesse-এর ভুল করেছে, নরেশ তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে। অমরের হাত থেকে Green Mansions খানা কেড়ে নিতে গিয়েছিল, অমর বলেছে, ডামী হবার সময় ছাড়া বাকী সময়টা সে ত পড়ে না, বইটার কোনো দোষ নেই। নরেশ জবাবে বলেছে, ড্যামিট—।

তর্কের শেষ হয় না। ক্রমে যে জিনিস খেলা ব'লে সুরু হয়েছিল তা দস্তুরমতো গুরুতর ব্যাপার হয়ে ওঠে। হাতাহাতি বাধ্‌বার উপক্রম হয়, একলা বিলাস দুই হাত দিয়ে কোনোগতিকে দুজনাকে ঠে'লে থামিয়ে রাখে।

দূরে একটা পার্কের খানিকটা রৌদ্রপ্লাবিত শ্যামলতা ছাতের ওপর থেকে চোখে পড়ে, আল্‌সেয় ভর দিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে অবিনাশ দাঁড়িয়ে রইল। আজ কি যে তার হ'ল অকস্মাৎ, পড়াতে মন বস্‌বার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আর রইল না।

সুদূর শৈশবের কোন্ একটি বিস্মৃতপ্রায় আসন্ন সরস্বতী-পূজা বারম্বার তার মনের আনাচে-কানাচে উকিঝুঁকি দিতে লাগ্‌ল। ছাড়াছাড়া স্মৃতির টুক্‌রো।...সরস্বতী-প্রতিমাকে চুম্‌কির কাজ করা বেগুনী রঙের কাপড় পরানো হচ্ছে।...নিভাঁজ বিপুল একটা আঁচলে দেবী-প্রতিমা ঢাকা প'ড়ে গেল, এত যত্নে গড়া সুন্দর মূর্ত্তিটির মুখটুকু ছাড়া কিছু আর চোখে পড়ে না, পদ্মের পাপড়ির উপর পদ্মের মতো টলটলে পা-দুটিও না, এতদিন ধ'রে কারিগরের এত পরিশ্রমের কি যে অর্থ রইল কে জানে?... পানকো-বিলের ধারে নৌকোয় নৌকোয় ছেলের দল ঘুর্‌ছে লাল খাগের সন্ধানে, নলখাগ্‌ড়ার বনে ফর্‌র্‌র্ ফর্‌র্‌র্ ক'রে ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে।...

কাচের দোয়াতগুলোকে ক্ষারজলে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, ভোরবেলার প্রথম দোয়া দুধ তাতে ভ'রে সেই দুধে খাগের কলম ডুবিয়ে দেবীর পায়ের কাছে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।···মনে পড়্তে লাগ্ল, ভোর রাত্রে কুকুর এবং চৌকিদারের পাহারা এড়িয়ে চৌধুরীদের পলাশ-বন উজাড় ক'রে ফুল নিয়ে আসা হ'ত।

ছাতের একপাশে রান্নাঘর। দরজার বাইরে ব'সে ভজু একটা ভেট্‌কি মাছকে চাক চাক ক'রে কেটে ক'খানা হ'ল গুনে দেখ্‌ছিল। ভেতর থেকে ফোড়নের গন্ধ। মেথর কলতলা ঝাঁট দিচ্ছে তার শব্দ আস্‌ছে। অবিনাশ জোর ক'রে মনটাকে সেদিক্ থেকে ফিরিয়ে নিল।

সার সার গাছ। মাঝে মাঝে এক-একটাতে লঘুশ্যাম নব-পত্রোদ্গম হয়েছে। মৃদু হাওয়ায় পাতাগুলি ঝিরঝির ক'রে কাঁপ্‌ছে, আলো প'ড়ে চিক্‌চিক্ ক'রে জ্বল্‌ছে, যেন কোন্ অদৃশ্য দেবী-প্রতিমার অঙ্গে সবুজ-চুম্‌কির কাজ করা আঁচল। অবিনাশ ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, কোন্ গাছটার কি নাম। দেখ্‌লে, কোনোটাই তার চেনা নয়, কৃষ্ণচূড়া ছাড়া। ঐ সুন্দরী তন্বীর মতো দৃপ্ত গাছটির কি নাম যদি জানা থাক্‌ত। একটা ইংরেজি কবিতা মনে পড়্‌ল, ভাব্‌লে হয়ত ঐ গাছটার ইংরেজি নাম হবে 'পপ্‌লার'। ভারি সুন্দর নাম পপ্‌লার, নামের মধ্যে ওর বায়ুতাড়িত পল্লবের পতপত যেন শুন্‌তে পাওয়া যায়। মনে মনে ইংরেজি কবিতাটার কয়েকটা চরণ আবৃত্তি কর্‌তে লাগ্‌ল।

The poplars, in long order due,
With cypress promenaded...

সবটা মনে নেই, ভারি বিরক্ত লাগ্‌তে লাগ্‌ল। যাবে একবার নীচে? দে'খে আস্‌বে শেষের লাইন-ক'টা?···পাশের বাড়ীর চিলকোঠার ওপাশ থেকে একটা পাখী ডেকে ডেকে খুন হয়ে যাচ্ছিল। অবিনাশের হঠাৎ মনে পড়্‌ল, সেটা সত্যিই কোকিল। মনে পড়্‌ল, এটা বসন্তকাল, পাখীটা স্পষ্টই কুহুকুহু ব'লে ডাক্‌ছে।

কিন্তু কোকিলকে বেশীক্ষণ মনে রইল না, কলেজের বেলা হচ্ছে। অভ্যাসক্রমে দূরে গির্জ্জার ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, আটটা বেজে সাড়ে-সাঁইত্রিশ মিনিট। ছ'বছর ধ'রে দেখ্‌ছে, আটটা বেজে সাড়ে-সাঁইত্রিশ মিনিট। কেউ কাঁটাটাকে ঘুরিয়ে ন'টা বাজিয়ে রাখে না? রোজ তাহলে বারবার ক'রে ঘর গুনে সাড়ে-সাঁইত্রিশ পড়্‌তে হয় না। চাকর-বাকরকে হুকুম কর্‌তে, ডাক্‌তে তার ভালো লাগে না, নিজেই এগিয়ে গিয়ে অতি নরম সুরে ভজুকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "ক'টা বেজেছে বল্‌তে পার ভজু?"

আঁস ওঠাতে ওঠাতে ভজু বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। আমাদেরও সব হয়ে গেল বাবু।"

রাস্তার ওপাশে বাথ্-টালি দিয়ে মোড়া শিবমন্দিরটার সাম্‌নে থেকে করপোরেশনের গাড়ী একটা ডাষ্ট্‌বিন্ খালি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে ফুটপাথের ওপর ব'সে একটা লোক আদুল গায়ে চুল ছাঁটাচ্ছে। তেতে-ওঠা রোদটা একেবারে সোজা তার ছাঁটা ঘাড়টার ওপর এসে পড়েছে। সে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, ঘাড়টা সরাতে চাচ্ছে, কিন্তু তার নাপিত কিছুতেই তাকে নড়্‌তে দেবে না, দুহাত দিয়ে চেপে মাথাটাকে সোজা ক'রে রাখ্‌ছে। শিবমন্দিরটার দিকে মুখ ক'রে মুদিতনেত্রে অবিনাশ অদূরাগতা বাগ্‌দেবীকে মনে মনে প্রণাম কর্‌লে, তারপর কলেজ যাবার জোগাড় কর্‌তে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

২

কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখে, বিপর্য্যয় কাণ্ড। তক্তপোষ, টেবিল, বাক্স-তোরঙ্গ, জলের কুঁজো, বইখাতাপত্র সমস্ত সে-ঘর থেকে বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। ধূলিমলিন দারিদ্র্যচিহ্নিত ঘরটা স্নাত বৈধব্যের মতো একটি স্নিগ্ধ শোভায় ভ'রে উঠেছে। যেদিক্‌টায় তার খাট থাক্‌ত সেখানে থরে থরে পদ্মফুল সাজিয়ে দেবীর পাদপীঠ রচিত হয়েছে। আর একটি অতিকায় শ্বেত শতদল পদ্মের মাঝখানে এলায়িত দেহপল্লবের মৃদুভার রক্ষা ক'রে কুন্দধবল দেহা হাস্যস্ফুরিতাধরা দেবী বীণাপাণি সরস্বতী।

হঠাৎ অবিনাশের বুকটায় কিসের একটা দোলা লাগ্‌ল। ও মুখটিতে, ও হাসিটিতে কি আছে যার জন্যে পলকের দেখায় চোখে চির-পরিচয়ের স্বাদ এসে লাগে? মুহূর্ত্তে প্রোফেসার লাহিড়ী, গোপাল, তার কলেজ-পড়াশোনা-পরীক্ষা, তার জীবন-জোড়া যে-ব্যর্থতাকে সে নিজে জানে না, তার অবসাদ সবকিছু সেই মধুর জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রতার মধ্যে একবিন্দু অন্ধকারের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেল। সে কেবল অনুভব কর্‌লে, তার অনাদিকালের পরিচিত কোন্ পরমাত্মীয়ের আগমন হয়েছে, অমৃতগন্ধী বাতাসকে একটু অবহিত হ'লেই সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন অনুভব করা যায়, যে-ঘরটা সারাক্ষণ গোপালের কুৎসিত বাক্যভঙ্গী এবং নীরস হাসিতে মুখরিত হয়ে থাক্‌ত সেখানে কি এক অপরূপ সুর-অবকাশের স্তব্ধতা যেন বিরাজ কর্‌ছে।

সরস্বতীর দুপাশে সখী নেই ব'লে বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে গোপাল অত্যন্ত কঠিন সমালোচনা সুরু করেছিল। আম্‌তা আম্‌তা

ক'রে অবিনাশ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আমার বইটইগুলো কোথায় ?"

গোপাল বল্লে, "আছে কোথায় উপরে সিঁড়ির ঘরে বোধহয়, দেখগে।"

অবিনাশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সিঁড়ি বেয়ে উপরে এল, কিন্তু বইয়ের খোঁজ আর করল না। একটি সুঠাম সুললিত দেহভঙ্গী, চিরপরিচয়ের নিবিড় মমত্বমাখানো প্রসন্ন একখানি মুখ, কুসুম-পেলব আলোহিত দুটি-সুকুমার চরণকমল তার সমস্ত উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে জেগে রইল।

সে-রাত্রে ছাতের সিঁড়ির ঘরে তার শোবার জায়গা হ'ল। গোপালের জন্যে ভাবনা নেই, রাত্রে বাড়ী না থাক্লেই হ'ল। অনেক রাত-অবধি মশার কামড়ে এবং শৈশবের-স্মৃতির-ভাণ্ডার-উজাড়-করা অনভ্যস্ত নানা চিন্তায় অবিনাশের চোখে কিছুতেই যখন ঘুম এল না তখন চোরের মতো চুপি চুপি নেমে এসে নিজের ঘরের দরজাটা সন্তর্পণে ঠে'লে খুলে সে ভেতরে ঢুক্ল। আলো জ্বাল্তে ভরসা হ'ল না, চোরেরই মতো লুকিয়ে ঘরের একটা কোণে জড়সড় হয়ে সে ব'সে রইল। ক্রমে সে ঘরের মধ্যেকার অতি-নিবিড় অন্ধকার তার চোখে অভ্যস্ত হয়ে আস্তে লাগ্ল। হঠাৎ একসময়ে সে দেখ্লে, অনায়াসেই ঘরের সবকিছু সে প্রায় স্পষ্ট দেখ্তে পাচ্ছে। কুন্দকান্তি দেবীপ্রতিমার অঙ্গ থেকে যেন একটি অস্ফুট শুভ্র আলো নির্গত হচ্ছে ; তাঁর পাদুখানির লোহিতাভা সে আলোয় আরো যেন স্নিগ্ধতর হয়ে চোখে পড়্ছে। তখন সেই সুপ্তিব্যাপ্ত-গভীর নির্জ্জনতায়, রুদ্ধ ঘরের সেই রহস্যময় আধ-আলো অন্ধকারে, এই পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রাণ-স্বরূপিণী বাণী বাগীশ্বরী নির্ব্বাক্ স্তব্ধতায় বাহুবিস্তার ক'রে অবিনাশের সৌন্দর্য্য-তৃষিত অন্তরকে স্পর্শ করলেন।

তার কি মনে হ'ল সে জানে না, কেবল অনুভব করল, সহসা তার সমস্ত অন্তর মধুময় হয়ে উঠ্ল। তার অস্তিত্ব ভ'রে, তার দেহের সমস্ত অণুপরমাণুকে স্পন্দিত ক'রে, দেবীর সহস্রতন্ত্রী বীণা স্বর্ণিম ঝঙ্কারে মুখরিত হতে লাগ্ল। স্নিগ্ধ পারিজাতগন্ধী বাতাস বইল, নিরানন্দ জীবনের জানা অজানা সমস্ত প্রকোষ্ঠ ভ'রে উৎসবের আলো জ্বল্ল, পাখী গাইল, মর্ম্মবৃন্তে সুবাস-এবং-শোভায়-সমাবৃত সহস্রদল পদ্মের বিকাশ হ'ল, এবং উষারাগরঞ্জিত দেবী পরম করুণাভরে কোরকগুচ্ছের মতো সুকোমল নিজের অতুলন দুটি চরণ সেই বিকশিত পদ্মের ওপর স্থাপন করলেন। অবিনাশের সর্ব্বশরীর কাঁপ্তে লাগ্ল, আকুল ভাবাবেগে, অশ্রু-আপ্লুত নয়নে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে বারম্বার সে নিজেকে লুণ্ঠিত করতে লাগ্ল।

এই অবস্থায় কখন্ যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। যখন জাগ্ল,

তখনো রাত্রি প্রভাত হয়নি, মেসের ছেলেদের তখনো জাগ্তে বহু বিলম্ব আছে। আজ আর তার দেহে নাগপাশের বাঁধন জড়ানো নেই, শিরায় শিরায় রক্তগতির স্বচ্ছন্দ সঞ্চার সে যেন অনুভব করতে পারছে। লঘু দেহমন নিয়ে সে উঠে বস্ল। সকলের অগোচরে এমন একান্ত ক'রে একটি মধুময় রাত দয়া ক'রে চরণাশ্রয়ে কাটাতে দেবার জন্যে প্রাণভ'রে দেবীকে সে ধন্যবাদ জানালে। তারপর তাঁর সম্মুখে করজোড়ে ধ্যানাসনে নিস্পন্দ হয়ে ব'সে রইল। তার ভয় ছিল, কখন্ অন্যেরা ঘুম ভেঙে উঠে পড়্বে এবং তাকে সেই অবস্থায় দেখ্তে পেয়ে পরিহাসে জর্জ্জরিত করবে ; কিন্তু প্রাণ ধ'রে সে চ'লে যেতেও পারছিল না। দেবীর প্রসন্ন মুখের স্মিতহাস্য একেবারে তার অন্তরের অন্তরতম কোণটিকে পর্য্যন্ত কি এক পুণ্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল, তার দে'খে দে'খে তৃপ্তি হচ্ছিল না। সুকুমার পা-দুখানির অতি সুললিত-সংস্থান, লোহিতাভ পদতল, সুবিন্যস্ত সমুজ্জ্বল নখররাজি, সমস্তই কি এক অপরূপ যাদুমন্ত্রে তার গভীরতম অস্তিত্ব অবধি মুগ্ধতার সঞ্চার করেছিল। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে কিছুতেই তার সাধ্যে কুলচ্ছিল না।

পাশের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হতেই সে উঠে পড়্ল। পরিতোষ রোজ সকালে গঙ্গায় নাইতে যায়, অবিনাশকে বেরিয়ে আস্তে দে'খে বল্লে, "আজ খুব সকাল-সকাল উঠেছ দেখ্ছি যে। পড়াশোনা ত আজ আর নেই, যাবে একটা ডুব দিতে ?"

রাত্রির অনধিকার-চর্চ্চায় অবিনাশের নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। তাই পরিতোষের এই সাদর আহ্বানে সে একসঙ্গে আরাম অনুভব করল এবং কৃতজ্ঞ হ'ল, কিছুতেই 'না' বল্তে পারলে না। ধোয়া কাপড় ও গামছা খুঁজে বার ক'রে একচাপ্ড়া তেল মাথায় ঘস্তে ঘস্তে সে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়্ল।

এর আগে কখনো আর সে গঙ্গায় নাইতে আসেনি। দেখ্লে, ঘাটে তত সকালেই বহু লোকের সমাগম। কুয়াসাচ্ছন্ন রহস্যময় প্রভাত, গঙ্গার প্রখর নিঃশব্দ রহস্যময় প্রবাহ, বহু স্নানার্থীর ধ্যানগভীর রহস্যময় সমাগম, এসমস্ত মিলে তার চিত্তের ওপর কি এক তপঃস্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাব বিস্তার করলে। একটি বিপুল শ্রদ্ধার ভারে তার হৃদয় বারবার নুয়ে নুয়ে পড়্তে লাগ্ল। কোন্ এক আবেগময় আরাধনার ভাষাহীন মন্ত্র তার সমস্ত চেতনা ভ'রে মন্দ্রিত হতে লাগ্ল।

স্নানার্থী এবং স্নানার্থিনী। কেহ বা তরুণী, এবং সুন্দরী। অবিনাশ হঠাৎ অনুভব করলে, নিজেরই অগোচরে কখন্ তার তৃষিত দৃষ্টি তাদের মধ্যে দুটি অলক্তরঞ্জিত সুকুমার চরণপল্লবের সন্ধান করছে। নিজেরই

কাছে লজ্জিত হয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ডুব দিল। আজ সমস্ত কাজেই সে একটি আশ্চর্য্য উৎসাহ বোধ করছিল। আজকের মতো তার জীবন অর্থময়, আজকের মতো একটি চূড়ান্ত সার্থকতার নীড় অদূরে তার জন্যে বাঁধা হয়ে আছে। দুর্ব্বল দেহটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে সে অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে সাঁতার কাট্‌ল। তারপর পরিতোষের ডাকাডাকিতে উঠেপ'ড়ে কাপড় ছেড়ে ট্রাম ধর্‌তে চল্‌ল।

বাড়ী ফিরে দেখ্‌ল, তার সেই নিরানন্দ নোংরা ঘরটাকে আর চেনা যায় না। ফুলপল্লব-আলিপনা, ধূপধূম-চন্দন। বহুকণ্ঠে মধুচ্ছন্দ আরাধনার মন্ত্র গুঞ্জরিত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়গুলোকে ফে'লে রেখে সেও এসে সকলের সঙ্গে নতশির হয়ে ব'সে পড়্‌ল। মন্ত্রের প্রতিটি শব্দ সাবধানে স্পষ্ট ক'রে সে উচ্চারণ কর্‌ল, কণ্ঠস্বরে আবেগ ভ'রে দিল, দুহাত ভ'রে ফুল তুলে তুলে অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রীতিতে সেগুলিকে মণ্ডিত ক'রে দেবীর পায়ে অর্ঘ্যাঞ্জলি অর্পণ কর্‌ল।

সকলে মিলে যখন হুড়োহুড়ি ক'রে উপরে খেতে গেল, সে ইচ্ছে ক'রেই তাদের সঙ্গে গেল না। আজ উৎসবের ভিড়ে তার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য কর্‌বে না।

ছাতের সিঁড়িতে শেষ পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে সে উঠে গিয়ে দরজাটাকে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে এল।—তারপর গতরাত্রির মতো ক'রে দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। তার নিরানন্দ উৎসবহীন জীবনে এই একটিমাত্র উৎসব প্রতিবৎসর আসে, যথেষ্ট উৎসাহ সহকারেই তাতে সে যোগ দেয়, আনন্দের শেষ রসবিন্দুটিকে পর্য্যন্ত তার উৎসব-রস-পিপাসু তরুণ চিত্ত সেই ক'টি মুহূর্ত্তের কাছ থেকে আদায় ক'রে নেয়। কিন্তু আজকের মতো এমন পরিপূর্ণ উৎসব আর তার জীবনে কখনো আসেনি। এ যেন তার মধ্যেকার কোন্ অপরিচিত সুপ্ত সত্তাকে গম্ভীর উদাত্ত সুরে আহ্বানে করেছে। সে আহ্বানে তার চিরকালের অসীম সম্ভাবনা দুঃসহ আনন্দ-বেদনায় আজ সাড়া দিয়েছে।

এতদিন যাঁকে প্রতি বৎসর সে পূজা করেছে, যাঁর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছে, মন্ত্রে যাঁকে অভিনন্দিত করেছে, তিনি তার উৎসবেরই প্রতীক মাত্র ছিলেন, সে-উৎসব থেকে আলাদা ক'রে তাঁর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আজ এ এক বিশেষ আবির্ভাব। ইনি শুধু দেবী নন, ইনি বিশেষ ক'রে তার দেবী। তার কোনো-একটি বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে তার জীবনপদ্মে নিজের চরণ রক্ষা করেছেন। এই বিশেষ আবির্ভাবটিকে বুঝ্‌বার, তাঁকে বিশেষভাবে অন্তরে বরণ ক'রে নেবার সামর্থ্য

এই বিপুল পৃথিবীতে আজ একমাত্র তারই আছে, আর কারও নেই। দেবীর স্মিত প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ল যেন একমাত্র তারই জন্যে বিশেষ ক'রে আজকের এই হাসি। কত-জন্মান্তর ধ'রে ঐ মুখটির ঐ হাসিটুকুর জন্যে সে যেন সাধনা করেছে, আজ বহুপুণ্যফলে সিদ্ধি তার দ্বারে সমাগত। তারই ঘরটিতে, তারই নিজের অধিকৃত স্থানটিতে দেবীর পীঠস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, যে এটাও যেন আকস্মিক ঘটনা নয়, দেবীর কোন্ স্নেহরহস্যময় মধুর ইচ্ছাকে সে যেন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখ্‌তে পেলে।

কলেজে তার স্থান সকলের শীর্ষে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আজ দর্পের সঙ্গে সে উপলব্ধি কর্‌লে, দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার অধিকার আর-সকলের চেয়ে তার কত বেশী। তার পূজাতে দেবীর তাই বিশেষ প্রসন্নতা। তার স্বভাবতঃ বিনয়ী মন আজ দেবতার কাছে আত্মনিবেদনের আশ্রয়ে নিজের চূড়ান্ত অহঙ্কারকে চরিতার্থ কর্‌লে। সহসা নিজেকে নিজেরই কাছে তার অতি বিস্ময়কর রকমের বড় মনে হ'ল। দেবতার কাছে একটি পরম নিবিড় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্ময়রূপে নিজেকে যেন সে দেখ্‌তে পেলে। তখন কোথাও লজ্জাভয়ের অন্তরাল আর রইল না, স্বাধিকারের গর্ব্বে এগিয়ে গিয়ে দেবীর মনোরম দুটি-পাদপদ্মের নীচে করতল এবং উপরে ললাট স্পর্শ ক'রে সে ব'সে রইল। সেই অতি-অন্তরঙ্গ স্পর্শে তার সমস্ত দেহে ভাবাবেগের শিহরণ বিদ্যুৎ স্রোতের মতো সঞ্চারিত হ'ল। তার মনে হতে লাগ্‌ল, তার দুর্ব্বল দেহ সেই শিহরাবেগ যেন বেশীক্ষণ বহন কর্‌তে পার্‌বে না, যেন সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌বে, কিন্তু সে মধুর মূর্চ্ছাও তার কাছে আজ পরম রমণীয় ব'লে মনে হতে লাগ্‌ল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মেসের ছেলেরা প্রায় সকলেই অন্যান্য মেসে-হষ্টেলে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে চ'লে গেল। বাইরের নিমন্ত্রিতরা যদি কেউ আসে, তাদের অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে একজন কারও বাড়ীতে থাকা দর্‌কার, এই অজুহাতে অবিনাশ থেকে গেল। যাবার জায়গা তার ছিলও না। অমর ব্রাহ্মসমাজ-ঘেঁসা মানুষ, একখানা ইংরেজী উপন্যাস নিয়ে নিজের ঘরে দরজায় খিল দিয়ে রইল। সকালের অর্পিত-পুষ্পাঞ্জলি দুপুরের গরমে শুকিয়ে আস্‌ছিল, বারবার জলসেচন ক'রে অবিনাশ সেগুলিকে তাজা রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। ধূপের আগুনকে একমুহূর্ত্ত নিব্‌তে দিল না।

বিকেলের দিকে বাইরের লোক দুএকজন যারা এল, প্রতিমা-দর্শন ক'রেই চ'লে গেল, বাড়ীতে বিশেষ কেউ নেই দে'খে দেরী কর্‌ল না। সমস্ত সন্ধ্যা নিস্তব্ধ একান্তে তার বহু তপোলব্ধ সম্পদ্ দুটি রাতুল চরণের সান্নিধ্যে অপূর্ব্ব একটি মাধুর্য্যের আবেশ নিয়ে তার কাট্‌ল। তারপর রাত্রি।

গোপাল এসে মুরুব্বিয়ানা চালে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, "এত আর কেন? এম্‌নিতেই ত আমাদের সঙ্গে মা-সরস্বতীর সৎমায়ের মতো ব্যবহার, এর ওপর তুমি যদি এ রেট্‌-এ তোয়াজ চালাও তাহলে আমরা হতভাগারা আর ত্রিসীমানায় ঠাঁই পাব না।"

তেজেশ বল্‌লে, "যাই বল ভাই, ইডেন হস্টেলের ঠাকুর এবার যা চমৎকার হয়েছে, এমন আর কোথাও হয়নি। একবার দেখ্‌লে আর-কোনো ঠাকুরের দিকে তাকাতে শুদ্ধু ইচ্ছে করে না।"

অবিনাশের স্বপ্নের চমক ভাঙে। মৃণ্ময়ী দেবীপ্রতিমার উপর থেকে জ্যোতিঃর প্রলেপ মুছে মুছে যায়। খড়িমাটির ওপর তেঁতুলবীচির গর্জ্জন, পায়ের তলায় কোনো-এক-জায়গায় আঠাল মাটির গায়ে তাড়াতাড়িতে অথবা অনাবশ্যকবোধে মূর্ত্তিকারের তুলির পোঁচ পৌঁছয়নি। প্রাণপণে সে তার মাধুর্য্যের ধ্যানটিকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌বার জন্যে চোখ বোজে।

গোপাল বল্‌লে, "তিন গেলাস সিদ্ধি খেয়ে মাথাটা চম্‌চম্‌ কর্‌ছে। ফ্লাশ কে কে খেল্‌তে চাও এসো, আজ হার্‌ব ঠিক করেছি।"

দলবল নিয়ে গোপাল বেরিয়ে গেল, তবু ঘরের ভিড় কম্‌ল না। শীতলাপ্রসাদ মুখভরা পানের ওপর আর-একটা খিলি জোর ক'রে চাপিয়ে উটের মতো ঊর্দ্ধগ্রীব হয়ে বল্‌লে, "পাদ্রী বেটারা এবার আচ্ছা জব্দ। হস্টেলের ছাত্ররা ভোর রাত্রে উঠে একেবারে chapel-এর গায়ে ঠাকুর নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে বাদ্যভাণ্ড শুনে সবাই-ত একেবারে থ। ল্যাংটন-সাহেব পুলিশকে টেলিফোন করেছিল ব'লে পরশু থেকে কলেজশুদ্ধ ছেলে strike কর্‌বে ঠিক করেছে।"

সমরেশ বল্‌লে, "আমাদের কলেজটা যত অজ পাড়াগেঁয়ের আড্ডা। strike কাকে বলে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, মানে বল্‌তে পার্‌বে না। সব ম'রে আছে।—প্রাণ নেই রে ভাই, প্রাণ নেই!"

অবিনাশ চোখ বুজে ব'সেই ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কান-দুটোকেও যদি কোনো উপায়ে বন্ধ করা যেত ত মন্দ হত না। যখন অসহ্য হ'ল, রান্না হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে উপরে গিয়ে দেখ্‌লে, অমরবাবু ছাড়া আর সবাই হয় বাইরে খাবে, নয় খাবে না ব'লে সে রাত্রের মতো উনুন জ্বলেনি। ভজু বল্‌লে, "অমরবাবুর লেগে চায়ের দোকান থেকে আলুর চপ আর ডবল ডিমের 'মাম্‌লেড' আস্‌ছে। আপনার আস্‌বে বাবু?"

খানিকটা কাঁচা ছানা আনিয়ে চিনি দিয়ে খেয়ে সে জল খেল। মাংস ডিম সে খায় না তা নয়, কিন্তু আজকের দিনটা কোনোদিকে কোনো অশুচিতা কর্‌তে তার ইচ্ছে কর্‌ল না।

খেতে খেতে ভজুকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "তুমি অঞ্জলি দিলে না, ভজু?"

ভজু বল্‌লে, "আজ্ঞে বাবু, আমরা কি আর সে কপাল ক'রে এসেছি যে মা-সরস্বতী ঠাক্‌রুণের পায়ে ফুল দেব? অম্‌নি দূর থেকে গড় করেছি।"

এই নিরক্ষর মাতৃকৃপা-বঞ্চিত হতভাগ্যের কল্পিত দুঃখ স্মরণ ক'রে অবিনাশের দুই চোখ সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "না, না, ফুল দেবার অধিকার থাক্‌বে না কেন? ভক্তিতে দেবতার অসম্মান হয় না। আর বিদ্যা কি কেবল বই প'ড়েই হয়? আজকের দিনে যে পড়াশোনা করা বারণ তার মানেই হচ্ছে—"

ভজু মনে মনে সেদিনকার বাজারের দস্তুরী পাওনার হিসাবটা গুছিয়ে নিতে লাগ্‌ল।

রাত্রে গতরাত্রিরই মতো ব্যবস্থা। ছাতের ঘরের ধূলিবালুভরা মেঝেতে খানিকক্ষণ মশার কামড় খেয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে অবিনাশ উঠে পড়্‌ল। তখনো মেসের ছেলেরা সকলে ঘুময়নি। পাশের ঘর থেকে নরেশের চীৎকার শোনা যাচ্ছে, "তুমি ইস্কাবন খেল্‌লে কি ব'লে, ড্যামিট? দেখ্‌ছ, পরপর ক্রমাগত ইস্কাবন আমি discard কর্‌ছি।" অমর বল্‌ছে, "আহা না হয় ভুলই খেলেছি, তাই নিয়ে এত চেঁচামেচি কর্‌ছ কেন?" "আমার খুসি আমি চেঁচাব, তোমার কি?" "না, তুমি চেঁচাতে পাবে না।" "হ্যাঁ, একশোবার চেঁচাব, তোমাকে ভয় করি নাকি, ড্যামিট।" "অভদ্র।" "রাস্কেল।"

এবারে কানে আঙুল দিতে বাধা ছিল না। অবিনাশ দুই-হাতে কান চেপে একটি অপলক ধ্যানদৃষ্টির দীপারতিকে দেবীপ্রতিমার সম্মুখে জ্বালিয়ে ধ'রে ব'সে রইল।

ঐ মুখটিকে এরই মধ্যে কত আপনার ব'লে যে তার মনে হচ্ছে! সে শৈশবে পিতৃমাতৃহারা। যদি তার মা বেঁচে থাক্‌তেন, নিশ্চয়ই তাঁকে তার এইরকম আপনার মনে হ'ত। সে ছবি আঁক্‌তে জানে না, কিন্তু তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, অনভ্যস্ত হাতে তুলি চালিয়ে সে যেন অনায়াসে ঐ অপরূপ লীলায়িত দেহভঙ্গী, পরিপাটি পা-দুটির ঐ বিশেষ ধরণের একটি সুন্দর সুললিত সমাবেশ, প্রতিটি সুকুমার পদাঙ্গুলির অতি স্নিগ্ধ করুণ লাবণ্যকে বারম্বার চিত্রপটে রূপ দিতে পারে। কিন্তু এমন ক'রে তার সমস্ত অন্তর ঐ মাধুর্য্যের অমৃতরসে ভ'রে ওঠা সত্ত্বেও কিছুতেই তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। কি হলে যে তৃপ্তি হয়, তাও সে বুঝ্‌ছিল না।

হঠাৎ আবার অতি নিবিড় ভাবাবেগের প্রেরণায় দেবীপ্রতিমার পা-দুখানিতে করস্পর্শ কর্‌তে গিয়ে মনে হলো, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। তার পরিচিত-অপরিচিত আর কেহ কোথাও এমন ব্যবহার কর্‌ছে, সে

ভাব্‌তে চেষ্টা করল। তার সমস্ত উন্মুখ চিত্ত সহসা নিদারুণ সঙ্কোচ-কুণ্ঠায় যেন নিজেরই মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে গুটিয়ে গেল। ক্রমে তার লজ্জা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল, এতক্ষণ দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়নি, এতক্ষণ যিনি ছিলেন তার ভাবাবেগের সৃষ্টি এবারে তিনি সত্যই জীবন্ত এবং জাগ্রত। তার এই পাগ্‌লামী কেউ দেখ্‌ছে না ভেবে সে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল, সহসা সচকিত হয়ে উপলব্ধি কর্‌লে, দেবী স্বয়ং দেখ্‌ছেন! কেন যে তারপর তার ভয় ভয় করতে লাগ্‌ল, তা সে জানে না। তাড়াতাড়ি সে-ঘর ছেড়ে সে পালিয়ে এসে বাঁচল।

ছাতের ঘরটায় অন্ধকারে একলা ব'সে ব'সেও বহুক্ষণ তার ভয় গেল না। তারপর যখন ক্লান্ত দেহমনের ওপর নিদ্রার লঘু আবেশ নেমে এল, সে স্বপ্ন দেখ্‌ল, গঙ্গায় নাইতে গিয়েছে। স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে সোপানাবলী অতিক্রম ক'রে যিনি উঠে যাচ্ছেন, শুভ্র তাঁর দেহের জ্যোতিঃ, সুকোমল সুন্দর দুটি পা থেকে মাধুর্য্য যেন রক্ত হয়ে ফেটে পড়্‌ছে।

৩

পরের দিন ভাসান। সেদিনও কলেজ ছুটি। শাস্ত্রমতে অনধ্যায় নয়, কিন্তু অবিনাশের পড়ার কথা মনে হ'ল না। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথমে মনে হ'ল, এ দুদিন সে স্বপ্ন দেখ্‌ছিল। এতখানি মাধুর্য্য কি তুচ্ছ সূত্র ধ'রে কোথা দিয়ে তার জীবনে এসে পড়েছিল, এ যেন বাস্তব নয়, আগাগোড়াই ফাঁকি। আজকে স্বপ্নের ঘোর অনেকটাই কেটে গিয়েছে। পূজাশেষে আজ দেবীমূর্ত্তি প্রাণহীন, কোনো আরাধনা আজ আর তাঁর পাওনা নয়, আজ তাঁকে নিতান্ত সাদা চোখে নূতন ক'রে মোহমুক্ত ভাবে দেখে নেবার কৌতূহল তবু তাকে পাশের ঘরটায় টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করল।

প্রতিবৎসর যে-দৃষ্টি নিয়ে দেবীকে সে দেখেছে, আজও তাই দেখ্‌তে চাইল এবং কৃতকার্য্যও হ'ল। সুন্দর গড়ন, সুনিপুণ শিল্পরচনা। মনে পড়্‌ল কত অধ্যবসায়, স্বভাবজ কি আশ্চর্য্য নির্ভুল রূপদৃষ্টি দিয়ে নিরক্ষর শিল্পী একে গড়েছে। কোথাও তার নিজের নামটা এঁকে বসিয়ে দেবার কথা তার মনে হয়নি। তার এত সাধের এবং সাধনার এই রচনাকে আজ সবাই মিলে গঙ্গার অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌বে। অনন্ত-কালের পৃথিবীতে তার কোনো চিহ্ন আর থাকবে না। কোনো মুজিয়মের বেদীতে তার ঠাঁই হবে না, কিম্বা কোনো শিল্প ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, পৃথিবীর কোনো কবি কোনোদিন তাকে নিয়ে কবিতা লিখ্‌বে না। তবু শিল্পী যে, তা নিয়ে সে এতটুকু ক্ষোভ কর্‌বে না, একবার সেকথা সে ভাব্‌বেও না।

এখন, এই মুহূর্ত্তটিতে সে কি করছে কে জানে? হয়ত কাছাকাছি পূজো নেই তাই হাঁড়ি গড়্‌ছে, কিম্বা কল্‌কে। সে কাজেও হয়ত তার সমানই আগ্রহ, সমানই অধ্যবসায়।

মেসের সব ছেলেরা মিলে ভাসানের জোগাড় কর্‌ছে। হৈ হৈ হুল্লোড়। কাল এদের এত উৎসাহ ছিল কোথায়? অবিনাশ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, আচ্ছা, এরা সবাই ত বোটানী পড়ে না, কীট্‌স্‌ও ত কেউ কেউ পড়ে। একবারও কি এদের একটু কষ্ট হচ্ছে না? এমন অপূর্ব্ব সুন্দর একটা জিনিসকেও জলে ফে'লে দিয়ে আস্‌তে এত উৎসাহ? এ কি বর্ব্বরতা!

আজ যখন মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, পাগ্‌লামীর কোনও অবশেষ কোথাও কিছু আর নেই, তখন সে অনুভব কর্‌লে, এই দেবী-প্রতিমার মধ্যে সত্যকার দেবীত্ব যদি কিছু নাও থাক্‌ত, শুদ্ধমাত্র অপরূপ শিল্পসৃষ্টি হিসাবেই একে তার অন্তরের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সে নিবেদন কর্‌তে পার্‌ত। ঐ দুটি পায়ে ললাটস্পর্শ করিয়ে তার নিজের তৃপ্তি হত। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের সোনার কাঠির স্পর্শেই হৃদয়ে উৎসবের জ্যোতিঃর উৎস খুলে যেত। আজ যে আসন্নবিচ্ছেদব্যথায় হৃদয় ভারাতুর, সে কেবল ইনি দেবী ব'লে নয়, ইনি বিশেষ ক'রে তারই দিকে বরাভয়-মণ্ডিত প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেছিলেন ব'লেও কেবল নয়, ইনি মনোহরণ রূপ নিয়ে তাকে দেখা দিয়েছিলেন সেই কারণটাই যেন সবচেয়ে বড়।

নরেশ আর বিলাস ভবানীপুর থেকে লরী সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে চ'লে গেল। অমর ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু সেও আজ উৎসাহ ক'রে এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বীণাপাণির বন্দনা ক'রে গান রচনা করেছে, সারা সকাল বক্স্‌ হার্‌মনিয়াম নিয়ে গানে সুর দিয়েছে। পাশের ঘরে কোরাসে তার রিহার্সাল চল্‌ছে। গোপালের হাতে মিছিলের আর সমস্ত আয়োজনের ভার। এক জায়গায় একটুক্‌রো লাল সালুতে তুলো বসিয়ে কলেজের নাম ও মেসের ঠিকানা লেখা হচ্ছে। বাঁশের কাঠামোর গায়ে রঙীন কাগজ, সালু আর রাংতা জড়িয়ে দেবীর চতুর্দ্দোলা তৈরি হচ্ছে। কেবলমাত্র কোরাসের কীর্ত্তনেই গোপালের মন খুসি নয়, বীণাযন্ত্র-হাতে পট্টবাসপরিহিত নির্ম্মাল্যবলয়-শোভিত কয়েকটি সুন্দর-কান্তি যুবককে সেই সঙ্গে সে একটু নাচিয়ে নিতেও চায়। তাই নিয়ে তর্ক। বল্‌লে, "থাক্‌ত সত্যিই সব ভার আমার হাতে, দেখিয়ে দিতাম প্রোসেশান কাকে বলে। তোমাদের কারু খোসামোদ কর্‌তাম, তোমরা ভেবেছ? এমন নাচের দল নামাতাম, পথে পেলা কুড়িয়ে বড়লোক হয়ে যেতে।"

অবিনাশ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, অনেক আলোর ত জোগাড় হল, কিন্তু কোন্

ক্ষ্যাপামির একটুকু ফাঁকে এই যে একটু আলো তার জীবনে দুদিনের জন্যে এসে পড়েছিল, তা এবার নিব্‌বে। মনকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ল, কি আর এমন! সম্বৎসর ঘুরে এলেই ত আবার পূজো। কিন্তু হায়রে, যে যাবে সে ত আর ফির্‌বে না! আত্মাকে অমর ব'লে মানুষ মৃত্যুর মধ্যেও ত এইরকম ক'রেই সান্ত্বনা খুঁজেছে। প্রিয়জনকে হারায়, ভাবে সে রইল, আবার দেখা হবে, কিন্তু যে-রূপের আলোয় তাকে জীবনে পেয়েছিল, যে-চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তাকে আত্মার আত্মীয় ব'লে জেনেছিল সেই রূপের আলোকে সেই দৃষ্টি দিয়ে তাকে যে আর দেখ্‌বে না, তাই জেনেই তার সেই আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়াস বারম্বার ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। অবিনাশেরও ব্যর্থ হ'ল।

ভাব্‌লে, ওদের একবার ব'লে দেখ্‌লে হয় না? সরস্বতীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া না-দেওয়া পূজকের ইচ্ছাসাপেক্ষ; কি হয় যদি এই মূর্ত্তিটির বদলে আর-একটি সংগ্রহ ক'রে এনে তারা ডুবিয়ে দিয়ে আসে? কুমোরটুলীতে উদ্বৃত্ত প্রতিমা একটিও কি আর এখন পাওয়া যায় না? টাকাটা খুসি হয়েই তাহলে সে দেয়। কিন্তু মুখ ফুটে এমন কথা কাউকে কি বলা যায়? কি ক'রে ওদের কাছে নিজেকে সে পাগল প্রতিপন্ন কর্‌বে? এম্‌নিতেই তার লাঞ্ছনার শেষ নেই, এরপর তাহলে প্রাণধারণ করাই তার দুরূহ হয়ে উঠ্‌বে।

ভাব্‌লে, হায়রে! এ কেমন দেবতা, জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভ'রে যিনি থাক্‌বেন না। যাঁর আগমন সুদূর দেশের অতিথির মতো, ভালো ক'রে দৃষ্টি বিনিময় না হতেই যাঁকে বিদায় দেবার পালা। তারপর এক বৎসর ভুলেও যাঁর কথা আর কেউ ভাব্‌বে না। ঘটা ক'রে আলো জ্বেলে বাজনা বাজিয়ে সর্ব্বশেষে জলে ডুবিয়ে সম্বৎসরের জন্যে যাঁকে পর ক'রে দিয়ে আস্‌তে হয়। মানুষের আরাধনা-বৃত্তিকে নিয়ে এ কি অমানুষের মতো নিষ্ঠুর ছেলে-খেলা?

নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লে, এটা ভারতবর্ষ। এখানে দেব-আরাধনার ক্ষেত্রেও সংযমকে স্বীকার করা হয়েছে। অতিরিক্ত ভাবাবেগকে গৃহীর জীবনের অনেকখানি অধিকার ছেড়ে দিতে ভারতবর্ষের চিত্তশীলতা তাই লোকশিক্ষার জন্যে চিন্তাশাসনের জন্যে এই নিষ্ঠুরতার ব্যবস্থা। সে যে নারাজ, ভারতবর্ষের মানুষ এই ভেবে এরপর তার গর্ব্ব হ'ল। সেই গর্ব্বের আনন্দে আজকের চূড়ান্ত ক্ষতির বেদনাকে সে ভুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ল।

গোপাল অন্যদের সঙ্গে মিছিলের গন্তব্যপথ নিয়ে তর্ক সুরু করেছে। বৌবাজার হয়ে লালদীঘির দিক্ দিয়ে গঙ্গায় যেতে সে একেবারে নারাজ। ওদিকে কে আছে যে দেখ্‌বে? বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে বেরিয়ে চিৎপুর, তারপর

বাগবাজার, আরও দুটো-একটা গলির সে নাম কর্‌ল, সেই ত সনাতন পন্থা। "যদি তোমাদের পছন্দ না হয়; বল, আমি তোমাদের এসব ভূতের কীর্ত্তনের মধ্যে নেই।" অনেক কথা-কাটাকাটির পর গোপালেরই জিত হ'ল। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না-হতেই সন্ধ্যা।

এসিটিলিনের আলোয় চোখে জ্বালা ধরিয়ে, একঘেয়ে কোরাসের গানে কানে তালা ধরিয়ে, নিশান উড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে, রাজহংসের-সাজ-পরা মোটর-লরীর ওপর চতুর্দ্দোলায় দেবী-প্রতিমা বসিয়ে সবাই যখন চ'লে গেল, তখন অবিনাশের মনে হ'ল, যেন তার পরমাত্মীয় কারও মৃত্যু হয়েছে, সকলে আনন্দ ক'রে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। খুব বেশী সে শোক কর্‌ল না। অন্ধকার শূন্য ঘরটায় যেখানে দেবীর আসন পাতা হয়েছিল সেইখানটায় মেজের ধূলির ওপর, দুই হাঁটু বাহুতে বেষ্টন ক'রে তার ওপর মুখ গুঁজে সে ব'সে রইল।

তারপর সমস্ত জীবন ভরা কি নিদারুণ শূন্যতা। একটি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির জন্যে মানুষের এমন হয়?

বই নিয়ে বসে, কিন্তু পড়াশোনার কোনো অর্থ থাকে না। বেশ ত ছিল আগের দিনগুলো, প্রোফেসার লাহিড়ীকে ভেবেই বইয়ের পাতায় রসের সন্ধান সে খুঁজে পেত। মাঝখানে দুটি দিন হঠাৎ সমস্ত পড়াশোনার চূড়ান্ত অর্থটিকে স্বপ্নের মতো ক'রে পেয়ে তারপর চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলার এ কি নিদারুণ অভিশাপ তাকে লাগ্‌ল?

জীবনে আর-কোনো দেবতার সঙ্গে কোনোদিন কেউ তার পরিচয় ক'রে দেয়নি। আর-কোনো দেবতাতে তার মনও হয়ত উঠ্‌ত না। যখন তার সমস্ত চিত্তবৃত্তি উন্মুখ তখন তার যথাসর্ব্বস্ব এ কোন্ দেবতার পায়ে উজাড় ক'রে সে নিঃস্ব হয়ে গেল, যাঁর এই ত্রিভুবনে কোথাও আজ আর অস্তিত্ব নেই, গঙ্গায় বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ তার কাছে চিরকালের জন্যে যাঁর অবসান হয়ে গিয়েছে।

ব'সে থেকে থেকে উন্মনা হয়ে যায়, কি যে মাথামুণ্ডু ভাবে! মনে পড়ে তার এক মামীমা ছিলেন, অনেকটা অমনি সুন্দর ছিল তাঁর পা-দুটি। ঘোম্‌টা টেনে নতমুখে অতি ছোট ছোট ক'রে পা ফে'লে আস্তে হাঁট্‌তেন, মনে হ'ত মেঝের ধূলির স্পর্শে সে কোমলতা পীড়িত হচ্ছে। তিনি প্রথম সন্তান হতে গিয়েই মারা গেলেন। মামা এখন বিবাগী হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পৃথিবীতে বুড়ী দিদিমা ছাড়া তার আর এখন কেউ নেই, তাঁরও সঙ্গে দুতিনচার বছরে একবার দেখা হয়।

অমর আসে, ব্রাহ্মসমাজের গল্প করে। বলে, "হিন্দু মেয়েরা তবু ত

ঘোম্‌টার ফাঁকে কৌতূহল নিয়েও একটু-আধটু তাকায়, যেমন ক'রে ভালুক-বাঁদরকে লোকে দেখে। এরা নাক উঁচিয়েই আছে রে ভাই, কারুর দিকে তাকায় না শুদ্ধু। আর পর্দ্দার কথা বল্‌ছ, চিকের আড়ালটাই না-হয় উঠে গিয়েছে, এরা মনে প্রাণে পর্দ্দানশীন। সাধ্যি কি যে কাছে ঘেঁস্‌বে?"

গীতিছত্রের উৎসবের টিকিটের জন্যে ছেলেরা তার হাতে-পায়ে ধ'রে সাধ্য-সাধনা করে। সে বলে, "কোথায় পাব? এদের যা আঁটা-আঁটি! চেনা লোক না হলে টিকিট দেখালেও ঢুক্‌তে দেয় না।" তারপর এককোণে গম্ভীর হয়ে ব'সে লরেন্সের একটা কি বইয়ে মনোনিবেশ করে।

গোপাল বলে, "আরে রেখে দাও তোমার গীতিছত্র, ন্যাকা সুরে ল্যাগবেগে গান বেতালা গেয়ে দিয়ে ভারি ত একেবারে মাথা কিন্‌বে। শুন্‌তে চাও গান, এসো আমার সঙ্গে। টিকিট-ফিকিটের বালাই নেই, টাকাগুলো বাজ্‌লেই হ'ল।"

অবিনাশ কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে, যেন কলের পুতুল। সকাল বেলাটা আর ফিললজি পড়ে না, পরিতোষের সঙ্গে গঙ্গায় ডুব দিতে যায়, ব্যাকুল চোখদুটো কোথায় কি রত্নের সন্ধান করে কে জানে?......

একদিন কলেজে গিয়ে শুন্‌ল, প্রোফেসার লাহিড়ী সেদিনই শেষ তাদের ক্লাস পড়াবেন, পরশু তাঁর বিলেত যাবার দিন। অনেকদিন থেকেই যাওয়া ঠিক ছিল, ছেলেদের জানানো তিনি আবশ্যক মনে করেন নি। অভিমান ছাপিয়ে আসন্ন-বিচ্ছেদের বেদনাই তবু অবিনাশের বড় হয়ে উঠ্‌ল। ক্লাসে ব'সে আশা কর্‌তে লাগ্‌ল যাবার আগে সবাইকার কাছে তিনি বিদায় নিয়ে যাবেন, তখন অন্ততঃ তাঁর পায়ের ধুলো নেবার একটা উপলক্ষ্য হবে। কিন্তু সারাটা ঘণ্টা প্রোফেসার লাহিড়ী একবার ঘুণাক্ষরেও তাঁর বিলেত যাওয়ার কথার উল্লেখ কর্‌লেন না। যেমন চিরকাল করেন, প্রত্যেকটি শব্দ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে, তার বিবর্ত্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা ক'রে, কারুর মুখের দিকে না তাকিয়ে গড়গড় ক'রে তিনি পড়িয়ে গেলেন। তারপর ঘণ্টা শেষ হতেই দুম্‌ ক'রে বইটাকে মুড়ে "আজ এই পর্য্যন্ত" ব'লে প্রায় তিন লাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। তাঁর সঙ্গেও যে এরপর পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ-জীবনে আর দেখা হবে এমন সম্ভাবনা রইল না।

এরপর যা ঘট্‌ল তা অতি অকস্মাৎ। বিগত কয়েকদিনের ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্কের যোগ কিছু আছে পাগলেও এমন কথা বল্‌বে না। কিন্তু কথাটা না বল্‌লে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

হঠাৎ একদিন রাত্রেও অবিনাশের পড়ায় মন বস্‌ল না। গোপালের সে রাত্রে বাড়ী ফির্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তার টেবিলে গাদা-করা

পুরণো ছবির কাগজ এক বোঝা নিয়ে অবিনাশ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওল্টাতে লাগ্‌ল। হঠাৎ একটা বাংলা সিনেমার কাগজে পাতা-জোড়া একটি ছবি। সুন্দরী বীণাবাদিনী মূর্ত্তি। পরিপূর্ণ দেহ-সৌষ্ঠব, সুললিত উপবেশনভঙ্গী। অবিনাশের মনে হ'ল, তার অলস পা-দুটিতে পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য্য যেন মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে। নীচের নামটা ইচ্ছে ক'রেই সে পড়্‌ল না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বারান্দার দিক্‌কার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।

তারপর ক'দিন সুবিধা পেলেই লুকিয়ে সেই বইটিকে সে বার করে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে ছবিটিকে অপলক দৃষ্টিতে দে'খে দে'খে তার সাধ মেটে না। যাঁকে হারিয়েছে তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন এর একটু আদল আসে, কিম্বা হয়ত আসে না, এম্‌নিতেই ছবিটি তার মনোহরণ করে।

একদিন অসতর্কে গোপাল তাকে ধ'রে ফেল্‌ল। বল্‌লে, "তাই ত বলি—" কিন্তু অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যে সে বলে সেটা আর তার বলা হয়ে উঠ্‌ল না। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "আলাপ কর্‌বে? ভারি মিশুক লোক।"

অবিনাশের কানের কাছে রক্তস্রোত দামামা পিটতে লাগ্‌ল। গলাটা কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে। বাইরে দৈন্যপীড়িত, শোভাহীন, সম্পদহীন, নীরস, নিরানন্দ পৃথিবী। তার অন্তরের সিংহাসনে অন্ধকার শূন্যতা। সম্মুখে আশাহীন, উদ্দীপনাহীন, দেবতাহীন ভবিষ্যৎ। একটা ঢোঁক গিলে কি যে সে বল্‌লে নিজেই সে তা বুঝ্‌ল না। কিন্তু গোপাল বুঝ্‌ল। অবিনাশের পকেটের ভিতরটাকে বাইরে থেকে দু-আঙুলে টিপে টিপে অনুভব ক'রে তার হাত ধ'রে আচম্‌কা একটা টান মেরে বল্‌লে, "এসো, ভেসে পড়া যাক্‌।"

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

কবিতাগুচ্ছ

শূন্য-ঘর

গোধূলি অন্ধকারে
পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে।
ডাকিনু, "আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো সাড়া দেহো।"
ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা ॥

বাহিরে বাগানে পুষ্পিত শাখা
গন্ধের আহ্বানে
সঙ্কেত করে কাহারে তাহা কে জানে।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়ায় মালী।
সিঁড়িটা নির্ব্বিকার
বলে, "এসো আর নাই এসো যদি
সমান অর্থ তার ॥"

ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়
"ডুব দিয়ে দেখো সত্তা-সাগরতলায়
বুঝিতে পারিবে থাকা নাই থাকা
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া।"
কেদারা এগিয়ে দিতে কারো নাই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া ॥

মেয়াদ যখন ফুরায় কপালে
হায়রে তখন, সেবা
কারেই বা করে কেবা ॥

মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।

ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব—আরে, অতএবখানা থাক্,
আপাতত ফেরা যাক্ ॥

ব্যর্থ আশায় ভারাতুর সেই ক্ষণে
ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
দূরতর হোলো মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
আকাশ-ভরানো ধূলি
সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মুখেতে রুমাল,
ধোঁয়াটে চশমা চোখে,
মনে হোলো যত মাইক্রোব্ দল
নাকে মুখে সব ঢোকে।
তাই বুঝিলাম সহজ তো নয়
ফিলজফারের বুদ্ধি,
দরকার করে বহুৎ চিত্তশুদ্ধি।
মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হেসে উঠি হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সাম্‌নে
হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাৎ এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ।
বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে
অট্টহাস্যে সহজ করিনু,
ফিরিনু আপন দ্বারে ॥

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে তাই
না থাকার ফিলজাফি
মনটাকে ধরে চাপি।

থাকাটা আকস্মিক,
না থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।
সন্ধ্যেবেলায় আলোটা নিবিয়ে
বসে বসে গৃহকোণে
না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
আঁকিতেছি মনে মনে।
কালের প্রান্তে চাই,
ঐ বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই।
ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ,
বসিবার সেই আরাম কেদারা
পূরোপূরি নিঃশেষ।
মাস-মাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
তুই তুই মালী একেবারে সব মিছে।
ক্রেসান্থেমাম কার্ণেশনের
কেয়ারি সমেত তা'রা
নাই-গহ্বরে হারা॥

চেয়ে দেখি দূর-পানে,—
সেই ভাবীকালে যা রয়েছে যেইখানে
উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
সামান্ত তাহা অতি,—
হেথায় সেথায় বুদ্বুদ-সংহতি।
যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা।
অনাদি অতীত যুগের প্রবাহ-বহা
অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
নাই, নাই, হায়, নাই সে কোথাও আর॥

দূর করো ছাই, এই বলে শেষে
যেমনি জ্বালিনু আলো,
ফিলজফারের কুয়াশা কোথা মিলালো।
স্পষ্ট বুঝিনু, যা-কিছু সমুখে আছে
চক্ষের পরে যাহা বক্ষের কাছে
সেইতো অন্তহীন,
প্রতিপল, প্রতিদিন।

যা আছে তাহারি মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালের যে ছিলেম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেই।
বাঁধিয়া রেখেছে এ মুহূর্ত্তের জাল
সমস্ত ভাবীকাল॥

অতএব সেই কেদারাটা যেই
জানালায় লবো টানি
বসিব আরামে সে মুহূর্ত্তেরে
চিরদিবসের জানি।
অতএব জেনো, সন্ন্যাসী হবো না কো।
আরবার যদি ডাকো
আবার সে ঐ মাইক্রোব্-ওড়া পথে
চলিব মোটর রথে।
ঘরে যদি কেহ রয়
নাই বলে তারে ফিলজফারের
হবে না কো সংশয়।
তুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে ক'বে "এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোজন-বীর

অসঙ্কোচে করিবে কষে ভোজন রস ভোগ,
সাবধানতা সেই তো মহা রোগ।
যকৃত যদি বিকৃত হয়,
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর,
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা,
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীরসর।

দেহের তামসিকতা ছি ছি মাংস হাড় পেশি
তাহারি পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফ্‌তা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।

ওজন করি ভোজন করা তাহারে করি ঘৃণা
মরণ-ভীরু এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে,
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক্ না ঝঙ্কৃত
পেটের নাড়ি ব্যথায় টঙ্কৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে,—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলঙ্কৃত।

যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি
গলায় যমদৌতিকের দড়ি।
হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে
কবিরাজিও নারাজ হবে
তখন অবধৌতিকের বড়ি।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরি পথে ঢুকে
অম্লশূল-সাধন কৌতুকে।
কাঁচা আমের আচার যত
রহিবে হয়ে বংশগত
ধরাবে জ্বালা পারিবারিক বুকে।

খাওয়া বাঁচিয়ে বাঙালীদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এদেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক॥

লঙ্কা আনো শর্ষে আনো, শস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো,—তাহার পরে মৃত॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌড়ীরীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি
লোকে তার পরে মহা রাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি'।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে
"দাতা বটে ষোলো আনা।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে
ছটাক যদি বা কমে
সেই ছটাকের চাটিতে ঢাকের
গালাগালি বোল জমে।

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে
খুঁজিয়া না পাবে চাবি,
পাওনা-যাচাই কঠিন বাছাই,
শেষ নাহি তার দাবী।

রুদ্ধ দুয়ার বহুমান তার
দ্বারীর প্রসাদে খোলে,
মুক্ত ঘরের মহা আদরের
মূল্য সবাই ভোলে।

সাম্‌নে আসিয়া নম্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ—
ধন্য ধন্য গৌড়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন-দূত

হে স্বপ্নের নীরব দেবতা!
চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন নেপথ্যের অভিনয় করো প্রযোজন।
আঁধার-রহস্য-'পরে তুমি ফেলো আলোকের শিখা,
নিরুদ্ধ বাসনা সব মায়া-স্পর্শে করো উন্মোচন;
যখন মনের কথা বলিতে হৃদয়ে লাগে ব্যথা,
তীব্র আত্ম-নিপীড়নে যন্ত্রনায় কাটে জাগরণ—
তুমি আন মুক্তির বারতা।

আজি মোর তোমার সকাশে
একটি প্রার্থনা আছে। রজনীর অন্তিম প্রহরে,
অনেক চেষ্টায় যবে তন্দ্রায় জড়াবে আঁখি তা'র—
মোর মূর্ত্তি ধরে' তুমি যাবে তার শয়ন-শিয়রে,
দেখিবে সন্ধান করে তার অন্তরের অন্ধকার।
—রাত্রি ভোর হ'য়ে আসে; চুলগুলি চঞ্চল বাতাসে
এলোমেলো হ'য়ে যায়, নড়ে' ওঠে ঠোঁটের কিনার।
তুমি গিয়ে দাঁড়াইয়ো পাশে।

যেয়ো তুমি নিঃশব্দ-সঞ্চারে—
যেয়ো তুমি অলক্ষিতে, যেন স্বপ্ন নাহি মনে হয়
তার কাছে; বুঝিতে না পারে যেন তব ছদ্মবেশ।
সহসা আমারে দেখে তার পাশে—মধুর বিস্ময়,
নিমীলিত চক্ষু-পক্ষ্মে আনন্দের উজ্জ্বল উন্মেষ,
সূক্ষ্ম পলকের আড়ে রক্ত-আভা লজ্জার প্রচারে—
সব তুমি লক্ষ করো, ভাব-গাঢ় প্রতিটি নিমেষ:
সব এসে বলিবে আমারে।

তুমি তা'কে দেখে মুগ্ধ হ'বে:
—এলোমেলো কালো চুল ছড়ায়েছে সমস্ত বালিশে,
অযত্নে মুছিয়া গেছে সীমন্তের বিষণ্ণ সিন্দূর,
আরক্তিম কর-তলে কপোলের আভা গেছে মিশে';
সিন্ধুর তরঙ্গ-সম উচ্ছ্বসিত উচ্চ স্তনচূড়:
প্রতি তপ্ত অবয়বে সৌন্দর্য্যের স্বাধীন গৌরবে
প্রাণের আনন্দ-লীন;—যে আনন্দ প্রকৃতি-বধূর
বসন্তের নির্ল্লজ্জ উৎসবে।

পাশে তা'র প্রশান্ত, মধুর
ঘুমন্ত শিশুর মুখে তা'রি মুখ দেখিবে আবার;
তবু ঠিক তা'র নয়, সৃষ্টি তা'রে করেছে দু'জন।
দ্বিতীয় যে—তা'রো ছায়া স্বপ্ন-পথে এসেছে কি তা'র
শয্যা-পাশে? কী হবে তোমার সঙ্গে তা'র সম্ভাষণ?
পরাজিত ভয়াতুর ম্লান চক্ষে কম্পন অশ্রুর,
বাহিরের তমিস্রায় মিশে যাবে তুমি কি তখন?
পূর্ব্বাস্বাদ লভিবে মৃত্যুর?

হে দেবতা, বিরহী-বান্ধব!
কোনো ভয় রাখিয়ো না, বহু শিশু অপ্রেমের ফল;
অপ্রেম-দুর্ব্বল, দীন; কিছু তা'র নাহি অধিকার।
প্রেমের সহায়ে তব রজনীর স্বপ্নের ফসল;
মোর প্রতিমূর্ত্তি হয়ে মোর প্রেমে ক্ষমতা তোমার:
হবে নাকো পরাভব; আছে প্রেম তোমার গৌরব।
যাও তুমি—সুপ্ত তা'র চেতনায় করো আবিষ্কার
গূঢ় গুপ্ত মনের উদ্ভব।

এই কথা বলিবে তাহাকে ঃ
'সব আশা গেছে, প্রিয়া, তবু আছে দুর্ব্বার দুরাশা ;
যা হয়েছে, হয়ে গেছে ঃ এখনো রয়েছে ভবিষ্যৎ।
মোর সাথে চলে' এসো, একবার খেলে দেখি পাশা
বজ্র অদৃষ্টের সনে। কূটগতি পৃথিবীর পথ—
অনিশ্চিত প্রতি বাঁকে সুখ-দুঃখ-যাহা-কিছু থাকে,
সব অতিক্রমি' যাবে মোদের প্রেমের জয়-রথ
পলাতক দিগন্তের ডাকে।

'প্রেতসম অতীতের ভার—
তা'র বিষশ্বাসে কেন, হে মধুর, তুমি হ'বে মৃত ?
ফেলে দাও, ছেড়ে দাও, চেয়ে ছাখো বিস্তীর্ণ সম্মুখে ;
জীবনের তীব্র দীপ্তি-পাতে হোক্ অতীত বিস্মৃত।
একবার ভয়ে মোরা নিয়েছিনু মেনে যে মৃত্যুকে
ভেঙে ফেলে' তার দ্বার, হত্যা করে' হিংস্র অন্ধকার
মোরা দোঁহে মুক্ত হবো দুঃসাহসে আনন্দের বুকে।
আমরা বাঁচিবো এইবার।'

নিয়ে এসো তাহার উত্তর
মোর কাছে—যেখানে নিদ্রার ঘোরে আমার শরীর
পড়ে আছে মৃত-সম ; (তুমি এলে তার কাছ থেকে
মোর প্রতিমূর্ত্তি হয়ে ; মোর প্রাণ প্রণয়-অস্থির
তুমি নিয়ে গেলে।) এখন সে ছদ্মবেশ ফেলে রেখে.
এসো অশরীরী স্বর মোর মর্ম্মে অশান্ত মর্ম্মর—
সব তুমি বলো মোরে,—যা শুনেছো, যা এসেছো দেখে,
তা'রি 'পরে জীবন নির্ভর।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

দুটো কাজল আঁখি

তোমার দু'টো কাজল আঁখি, হাল্‌কা ঠোঁট,
মিঠে একটু পল্‌কা হাসি, একটু রোষ,
আধেক ফোটা কোরক দু'টি স্তনের চূড়,
ঠোঁটের পাশে তিলটি কালো, আমার দোষ ?
বুকের বসন একটু নড়ে, তাকাই কেন !
চোখে দুষ্টু হাসি, মুখে লালের ছোপ।
শ্রোণীর চলন নাচের ছাঁদে, মিষ্টি ভারী,
কান্না তোমার শিশিরঝরা কেয়ার ঝোপ।
পূর্ণ তুমি গহীন গাঙ, চপল নদী,
আমার আঁখি ডুবলো সেথা মরণ মাগি।
একটু ছোঁয়া, একটু হাসি, মিথ্যে কথা,
পাগল হল বনের তৃণ, নেইতো বাকি।
জঘন তোমার ছলন জানে, বিশ্বজেতা
গালের টোল, ঠোঁটের তিল, আঁখির বাগে
হাফেজ পাগল ! সারেঙ্‌ কাঁদে ! লাল পিয়ালা !
মদন কত ভস্ম হল, কেইবা জানে !
মৃণালবাহু, কোমল কটি, দেখতে যেন
চাঁদের আলোয় শীর্ণ নদী, রুপোর ফিতে
যূথীর গন্ধ, শুক্রতারা, ফুলের হাসি
সবাই তুচ্ছ তোমার কাছে ছন্দে গীতে।
পরশ বুকের, বাহুর বাঁধন, একটু ছল,
একটু মিছে, একটু হাসি, চোখের জল,
নয়তো শুধু, কাতর আঁখি ব্যাকুল তাজের
গড়ল ধূলায় অবাক-করা ঐ মহল্।
'মিলোর ভিনাস' নয়তো বেশি, ননীর তনু,
মোমের শিখা বড্ড ভীরু, তাহার চেয়ে,
তিলটি কালো—আমার মুখের চুমোর লালী
একটা আবার ? চোখের পাতায় ? দুষ্টু মেয়ে !

শ্রীসান্ত্বনা গুহ

সন্ধ্যা

বামদিকে গিরিশৃঙ্গ আকাশেরে করিছে আহত
শ্যামাঙ্গী দিতিরে যেন মুষ্টি তোলে ক্ষিপ্ত দৈত্যশিশু।
দুরন্ত পর্ব্বতচূড়া চোখেরে সে এড়াইতে চাহে,
মানুষের তৃণভূমি ত্যজি'—মোর হৃদয়ের মতো।

অন্যদিকে চলিয়াছে অন্তহীন ঘন অরণ্যানী,
মানুষেরও দেখি নাই অন্তহীন এত ঘন ভিড়,
মানুষের ভিড়ও কভু নয় এত অজ্ঞাত নিবিড়।
কোন্ লোকে আসিয়াছি, জানি নাকো বনানীর বাণী!

পশ্চাতে পড়িয়া আছে পাথরের একখানি হাড়
দেহে মোর রিণিঝিনি রক্তধারা স্পর্শ তার পায়।
পাথরের কী যে ভাষা! রক্ত মোর হিম হ'য়ে যায়
অজ্ঞাত ধমনী কার স্পর্শে মোরে করিছে নিঃসাড়!

রক্তের ফোয়ারা সূর্য্য অকস্মাৎ পর্ব্বতের মাঝে
ডুবে' গেল দ্রুতগতি নদীগর্ভে কুমীরের মতো।
গোধূলির ছায়া নামে আর ওঠে কারা শতশত
প্রান্তরে, বনানী আর কৃষ্ণ ক্রুর পর্ব্বতের মাঝে।

সমুৎকর্ণ অরণ্যানী, ঊর্দ্ধগ্রীব পর্ব্বতের মালা—
বিধাতার মনে আসে বাসনার বিবর্ণ আবেশ,
জলস্থলে কম্পমান সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ,
দেহ মোর হিমস্থির, চক্ষে মোর কী বিস্ময়-জ্বালা!

মনে হয় মৃত আমি, দেহ মোর মোর নহে আর।
ম্যামথেরা আসে বুঝি? প্রেম জাগে ধরিত্রীর বুকে?
একজন ছোটে আগে—মদমত্ত ম্যামথ-পুরুষ?
দেহ হিম, মন কাঁপে পরিচয়ে আদিম সন্ধ্যার!

শ্রীবিষ্ণু দে

মেঘার্ত্ত অমাবস্যা

আকাশের দুর্গ হতে পলাতকা অমাবস্যা আজ।
সমুদ্রের স্নায়ু আজ অবসন্ন—মরেছে জোয়ার
তন্দ্রাহত পরাজিত পলাতক ঢেউয়ের সোয়ার।
আজ আর প্রেম নয়। নিদ্রাহীন অন্ধকার আজ।

চিত্তের সমুদ্র আজ শান্ত স্থির বিম্ববতী দীঘি।
নক্ষত্রদেয়ালি নেই, গোধূলির দেহহীন আলো।
এ আলোতে আমি আছি, আর আছে বিশ্ব মোর পাশে,
সে বিশ্ব আমারই মূর্ত্তি—দীর্ঘছায়া সে মোর মনের।

সে ছায়ায় প্রেম নেই, সে ছায়ায় জাগে ক্লান্ত মন,
নিশাচর মন মোর জাগে আজ উগ্র অন্ধকারে।
তোমার ও চোখ আজ ভুলে' যাক্ তাদের ভাষারে।
স্পন্দিত হৃদয়ে মোর বিধাতার গর্ভ-অন্ধকার।

শ্রীবিষ্ণু দে

ক্ষণিকা

সুধু দেখা হলো, বেশি কিছু নয়
দেখা হলো পথে যেতে,
বারেকের তরে মুখ পানে চাওয়া
নয়নে নয়ন পেতে।
ফুটিলোনা মুখ নাহি হলো কথা
শুধালোনা কেহ কুশল বারতা;
কোথা কার ঘর দুঁহু দোঁহা পর
কেহ নাহি জানে কারে,—
চেনা-জনে যবে পায় অবহেলা
কেবা চেনে অচেনারে!

দুই জনা চলে দুই পথে হায়
যত যায় তত যায়,
খনে খনে বাড়ে দূর-ব্যবধান,
ব্যবধান পায়-পায়।
মন যেন তবু মানেনা বারণ
পিছু পানে ছোটে কেন অকারণ,
যা'রে দেখা হলো তারে যেন আরো
দেখিতে রহিলো বাকি,—
বুকের খাঁচায় পাখা সাপটায়
সে-কোন বনের পাখী!

সুধু দেখা হলো? বেশি কিছু নয়?
পথে-দেখা সে কি খালি?
দু' আঁখির ভুল বিজলি-চটুল
আলেয়ার আলো জ্বালি?
যে-কথা হলোনা মুখের ভাষায়
রঙিলোনা সে কি মহা দুরাশায়—
বেদনার রূপে অতি চুপে চুপ
পথিক সুজন সে কি
জীবনের পাতে দু'একটি কথা
সহসা গেলোনা লেখি'?

শামসুল হুদা

তিলোত্তমা

দেবতার ধ্যান-মূর্ত্তি নিখিলের সঞ্চিত সুষমা
তুমি, তিলোত্তমা,—
অপমান-কণ্টকিত মৃণালের বুকে
ছলনার রক্তপদ্ম একদিন ফুটিলে কৌতুকে!
তোমার বিলাস-বহ্নি অসুন্দরে ভস্মশেষ করি
সুন্দরের পরাজয়-কলঙ্ক-কালিমা যত আঁখির পলকে নিল হরি!

তারপর কেন তুমি স্বপ্নময়ি, মিলালে না স্বপ্নের মাঝারে?
কেন তুমি ডুবিলে না মিথ্যার অতল পারাবারে?
ওগো আকস্মিকা,
কেন জ্বালি কামনার চিরন্তনী শিখা
রচিলে আপন হাতে আপনার, দেবতার চিতা?—
স্বর্গ-স্বয়ম্বরা হ'লে, হে স্বর্গের মানসী দুহিতা!

অমর্ত্ত্যের বক্ষে যবে মণির মঞ্জীর তব বাজে,
মর্ত্ত্যের মলিন মাথা অবনত হ'য়ে যায় লাজে!

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

অনুবাদ

লহ এই ফুল রেখেছিনু যারে মর্ম্মমাঝে,
এ কুসুমটিও লহ যেটি মোর অলকে রাজে,
পরে যেয়ো চলি ; হের আজিকার স্বচ্ছরাতে
তোমার পথের চলার পুলকে তারারা মাতে।

—অজ্ঞাত ইংরেজ কবি হইতে

* * * * *

ভাল যদি বাসিতাম যবে ভালো বেসেছিলে মোরে,
পড়িতাম বাঁধা তবে তুমি আমি দোঁহে পরস্পর
সে আনন্দে, মৃত্যু যার তীব্রতার চরম শিখর।
নিঃসঙ্গ মুক্তির স্বাদ আজ মোরা জানি ভালো কোরে।
তোমারেই ভালো বেসে, আজ যবে তুমি আছ দূরে,
কী আনন্দ পাই আমি ; চিত্ত মোর উঠে ভরি' ভরি',
যেন কোন দূর তারার কিরণে ; সারা নিশি ধরি'
তুমি থাকো সংরক্ষিত অন্তরের গুপ্ত অন্তঃপুরে।

—এড্‌ওয়ার্ড অ্যাশক্রফ্‌ট হইতে

* * * * *

জানি তুমি করিবেনা শোক
আমি যবে হইব বিগত,
তোমার কবরী হ'তে খসা
অযতন কুসুমের মত।

তবু কোন ঝড়-ওঠা দিনে,
কোন এক দীপ-জ্বালা সাঁঝে,
ফুটি-ফুটি ফুলটির প্রায়
চঞ্চলিব তব মর্ম্ম মাঝে।

ম্লান হেসে মোরে মনে হবে,
হাত হতে বই যাবে প'ড়ে,
দীপ-পানে রহিবে ঝুঁকিয়া,
চেয়ে রবে কোন্ দিগন্তরে।

—সাহেদ সুরাওয়ার্দ্দি হইতে

* * * * *

তুমি ছিলে শুকতারা মরলোক মাঝে,
তার পরে নিবে গেলো জ্যোতি ;
এখন মরণ-পারে সন্ধ্যাতারা সাজে
বিতরিছ নবতর দ্যুতি।

—প্লেটো হইতে

* * * * *

বলিয়ো স্পার্টায়, এই স্মৃতিফলকের পথ দিয়ে চলো যে পথিক,
মোরা প্রাণ দিছি তারি লাগি', কামনার কিছু নাই ইহার অধিক।

—সাইমনাইডিস্ হইতে

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

পুস্তক-পরিচয়

কবি-পরিচিতি। কান্ত পাবলিশিং হাউস, ১ডি রসা রোড, ভবানীপুর। দুই টাকা।

জয়ন্তী-উৎসর্গ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলাভাষায় পুস্তক অত্যন্ত কম। এই দুইটি পুস্তক এই অভাব অনেক পরিমাণে দূর করিবে। দুইটি পুস্তকই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনাবলীর সংগ্রহ এবং কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত। 'কবি-পরিচিতি'র প্রবন্ধগুলি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদে পঠিত হইয়াছিল এবং এই পরিষদের সম্পাদনায় পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে। 'জয়ন্তী-উৎসর্গে' যে সকল প্রবন্ধ ও কবিতা স্থান পাইয়াছে বঙ্গবাণীর প্রশস্ত অঙ্গনে তাহা চয়ন করা হইয়াছে। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা, কিন্তু আরব্ধ কার্য্যের ভার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তাঁহারা বিশ্বভারতীর উপর সমর্পণ করেন এবং বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগ এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া এই অর্ঘ্য-সম্ভার কবির চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন।

'কবি-পরিচিতি'র সর্ব্বপ্রথমে রীতিমত বই আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একটি অত্যন্ত সুন্দর কবিতায় কবি তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন :—

> হে মানব, তোমার মন্দিরে
> দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
> আরতির সান্ধ্যক্ষণে :—একের চরণে রাখিলাম
> বিচিত্রের নর্ম্ম-বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম ॥

বই আরম্ভ হইয়াছে রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণের অনুলিপি লইয়া। তাহার পর "সাহিত্য-বিচার" শীর্ষক কবির একটি প্রবন্ধ। তিনি বলিতেছেন : "সাহিত্যের বিচার হচ্চে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হ'তে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নাই।" তাঁহার অভিভাষণে কবি বলিয়াছেন : "আমার কাব্য ঠিক কি কথাটি বলেচে, সেটি শোনবার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে—যাঁরা শুনতে পেয়েচেন তাঁদের কাছে।" রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার ও ব্যাখ্যাই পুস্তকটির উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পুস্তকে কবিতায় ও প্রবন্ধে কবি কি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা না করিয়া শ্রোতৃবর্গ কি বলেন তাহা শোনা যাক্।

কবির যে-সকল শ্রোতার রচনা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছেঁ, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নাম সাহিত্যিক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রবন্ধের নাম "চিত্রাঙ্গদা"। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয় "চিত্রাঙ্গদা" নয়, "চিত্রাঙ্গদা" সম্বন্ধে Thompson সাহেবের মতামত। লেখক নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। Thompson সাহেব নাকি বলিয়াছেন, "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের প্রথম অংশ অশ্লীলতার কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। তিনি আরো বলিয়াছেন :—The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude।

এই attitude সম্বন্ধে Thompson-এর উক্তি যে নিতান্তই বেরসিকের উক্তি তাহা বোঝাইবার জন্য চৌধুরী মহাশয় যে আলোচনা-জাল বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে Plato, Aristotle, কালিদাস, বামনাচার্য্য, Croce, Rollo, ভারতচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বহু প্রাচীন ও আধুনিক কবি, দার্শনিক, আলঙ্কারিক ও অধ্যাপক ধরা পড়িয়াছেন এবং ইঁহাদের অনেকে আসামী Thompson-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সকল সাক্ষীদের জবানবন্দীর মাঝে মাঝে প্রমথবাবু নিজের মন্তব্য প্রক্ষেপ করিয়াছেন এবং ঐ সকল মন্তব্যের মশলা হিসাবে "চিত্রাঙ্গদা" হইতে বাছিয়া বাছিয়া অংশ উদ্ধার করিয়াছেন। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে Thompson তো কাবু হইয়াছেনই, উপরন্তু এমন একটি প্রবন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা রসিক পাঠকমাত্রই উপভোগ করিবেন। এই রচনায় বৈদগ্ধ্যের ও পাণ্ডিত্যের যে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাংলা ভাষায় বোধ হয় এক প্রমথবাবুই করিতে পারেন। কিন্তু তবু রচনাটি পড়িয়া মন তৃপ্ত হয় না। সমগ্র প্রবন্ধটি যেন একটি বৃহৎ গৌরচন্দ্রিকা, আসল কথাটি বাদে সবই যেন তাহাতে বলা হইয়াছে। তাই মনে হয়, লেখক তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার অপব্যয় করিয়াছেন, সাহিত্য-সমালোচনার কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু যে-আলোচনা করিয়াছেন তাহার উপলক্ষ্যমাত্র সাহিত্য; লক্ষ্য কি তাহা বলা কঠিন।

রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়-লিখিত "বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে উচ্চাঙ্গের গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মহাশয় অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদ বা ব্যবহারিত্ববাদ, যথাভূতবাদ এবং পরিকল্পনা-বিবর্ত্ত সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাদ্বারা প্রবন্ধটির গোড়াপত্তন করিয়াছেন। অপণ্ডিত নিরীহ পাঠকগণ পাছে এই সকল বিবিধ "বাদ"-এর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করেন সেই জন্য অধ্যাপক মহাশয় মামুলি ভাষায় তাহাদের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন—তাই বুঝিতে কষ্ট হয় না এই আলোচনার বিষয় pragmatism, realism ও idealism। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ভারতীয় বর্ষাকবিতার মধ্যে কাব্যে realism হইতে idealism-এ উঠিবার যে-ক্রমপদ্ধতি প্রকট হইয়াছে তাহাই দেখানো। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রচণ্ড গোড়াপত্তন।

তাহার পর দৃষ্টান্ত। লেখক একেবারে বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের বিরহ এবং সুগ্রীব ও সুগ্রীবাণীর মিলন বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বর্ষার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে pragmatic attitude নাকি অত্যন্ত ক্ষীণ, যদিও pragmatic atmosphere-এর অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্মীকি শুধু আদি কবি নয়, আদিম কবি; তাই বোধ হয় এই চমৎকার অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদের আব্‌হাওয়া তাঁহার কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেন না।

অধ্যাপক মহাশয় তাহার পর আরো দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং তাহা আহরণের জন্য সমুদ্র পাড়ি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার মতে বর্ষাকাব্যে idealism-এর চরম পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতায়। "ঝমঝমে একঘেয়ে বৃষ্টির ধারা" রবীন্দ্রনাথের মনের একতারায় ঘা দেয় এবং তাহা সর্ব্বদা বাজিয়া উঠে। কেমন করিয়া বাজে? অবশ্য "পিড়িং পিড়িং করিয়া", কেননা ধ্বনি-রসিক অধ্যাপক মহাশয় onomatopoetic ভাষায় তাহাই লিখিয়াছেন।

যাহা হউক, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি কবিতা' হিসাবে খুবই উপভোগ্য। সেগুলির তিনি যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন তাহা স্থানে স্থানে স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় কাব্য-রসিক তাহাতে সন্দেহ নাই—শুধু দুঃখ হয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূতের বোঝা তিনি নামাইতে পারেন নাই। চৌধুরী মহাশয়ের মতো পাণ্ডিত্যের সহিত বৈদগ্ধ্যের সহজ সম্মিলন তিনি করিতে পারেন নাই, তাই প্রবন্ধটির পূর্ব্ব-অংশ সাহিত্য হিসাবে অপাঠ্য, এবং উত্তর-অংশ উপভোগ্য হইয়াছে অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তব্যের আকর্ষণে নয়—উদ্ধৃতাংশসমূহ ও তাহাদের অনুবাদের জন্য।

সাহিত্য-বিচার হিসাবে 'কবি-পরিচিতি' পুস্তকটির শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প"। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মূল বিষয়গুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা, (১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানব-মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ—এবং এই চারিটি পর্য্যায়ের প্রত্যেকটির অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জাতীয় বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সহজেই নীরস হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রীকুমারবাবুর রসগ্রাহিতার ও বর্ণনাভঙ্গীর গুণে তাঁহার প্রবন্ধে তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে লেখক যে আশ্চর্য্য রসের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার আস্বাদনের আনন্দ তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন; ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীকুমারবাবুর বিশ্লেষণমূলক আলোচনার ঠিক বিপরীত রীতি দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রের "ছিন্নপত্র" প্রবন্ধে। এই পত্রগুলির মূল সুর কি তাহা সোমনাথবাবু সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "উন্মুক্ত আকাশের আলো থেকে, নদীজলকল্লোল থেকে, দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল ধরণী থেকে কবির পুলকিত চিত্ত যে অমৃত গ্রহণ করেচে, এ চিঠিতে আমরা তারই আস্বাদ পাই। সহজবোধ দিয়ে তিনি সুন্দরকে উপলব্ধি করেচেন, মনের দ্বার খুলে রেখে তিনি আলোকে গগনে তরুলতায় সেই সুন্দরের বাণী শুনেচেন, হাটের হট্টগোলে এই বোধশক্তি যখনই ক্ষীণ হয়েচে, নদীতীরে উষার আলোকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, তারাখচিত আকাশের তলে তাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেচেন।"

প্রকৃতির সহিত কবির এই নিবিড় পরিচয়ের কথাই শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই পরিচয় কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে নীহাররঞ্জন কবির বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন কবিতা হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। নীহাররঞ্জন যাহা বলিতে চান তাহার মর্ম্ম এই—"বিশ্বজীবনের অপূর্ব্ব রহস্যময় অনুভূতিই" কবির কাব্যের ও জীবনের প্রধান প্রেরণা। এই বিশ্বজীবন ও বিশ্বদেবতা এক নহে। "অনেক সময়—বিশেষত 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যের' যুগে—বিশ্বজীবনের অনুভূতি বিশ্বদেবতার অনুভূতির মধ্যে হয়তো বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু এই অনুভূতিকে ঠিক এক বলা চলে না।—এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' কি তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার আতিশয্য সত্ত্বেও তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। তবে দুটি কবিতার তিনি যে অর্থ

করিয়াছেন তাহাতে আপত্তি হইতে পারে। একটি কবিতা 'মানসী'র "ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে"; আর একটি 'পূরবী'র "বলেছিনু ভুলিবনা"। এই দুইটি কবিতার প্রেরণা কি বিশ্বজীবনের অনুভূতি? যে জীবন-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন লিখিয়াছিলেন:

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাকো নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্ত্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মম, পরাণ-বল্লভ!
তোমার কোমল-কান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবন তরীতে
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

এই কবিতা দুইটি যে তাঁহারই উদ্দেশে রচিত তাহা ভাবিতে নিতান্তই কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয়।

এই বইতে আরো দুইটি প্রবন্ধ আছে—শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর "ঘরে-বাইরে" ও শ্রীযুক্ত গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের "বলাকার যুগ"। প্রথম প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য নয়। দ্বিতীয়টিতে লেখক বলিতেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ এই কালটিতে (অর্থাৎ 'বলাকা' লিখিবার সময়) এ সরল দৃষ্টিটি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর গানে সহজ সুরটি খোয়া গেছে। এই জন্যই তাঁর কাব্য রচনায় গানের চাইতে গমক বেশী, সুরের চাইতে কথা এত অধিক।" ইহার সরল অর্থ অবশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ আর তেমন ভালো কবিতা লিখিতে পারেন না। কিন্তু গিরিজাবাবু সাবধানী লোক, সরল অর্থে কথা বলেন না, তাই লিখিতেছেন:—"একে শক্তির decadence বা decline বল্‌লে অন্যায় করা হবে।" তথাপি "একথা আমাদের মান্‌তেই হবে যে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক মতবাদের অনেক নীচে এখানে চাপা পড়েছেন।" এইরূপ সমগ্র প্রবন্ধটিতে লেখক এক অর্থে কথা বলিতেছেন, বলিয়াই ভাবিতেছেন, বোধ হয় কবির নিন্দা করা হইল, তৎক্ষণাৎ আর এক অর্থে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দোষক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন।

'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পুস্তকটির সম্যক্ পরিচয় দেওয়া কঠিন—তাহার কারণ পুস্তকটির কোন ঐক্য নাই। অবশ্য বহু বিশিষ্ট লেখকের রচনা পুস্তকটিতে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু এই রচনাগুলি অধিকাংশস্থলেই বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত। কিন্তু শুধু সাহিত্য-সমালোচনার মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার করিলে চলিবে না। যে-অনুষ্ঠানের সম্পর্কে এই পুস্তকটির সূচনা তাহা বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয়; এই অনুষ্ঠানের স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তকটিও বাংলাসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবার দাবি রাখে।

কিন্তু এই কথা বলিয়া 'জয়ন্তী-উৎসর্গ'কে উপেক্ষা করিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হইবে, কেননা ইহাতে এমন কয়েকটি রচনা আছে যাহার সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই রচনাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য"। আধুনিক বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে কোন কথা বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে বাদ দেওয়া চলেনা—কেননা আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন তাঁহারা। মোহিতলাল তাই তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথমেই এই দুই মনীষীর কথা আলোচনা

করিয়া বাংলাসাহিত্যে এবং বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি তাহাই নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোহিতলালের মতে "আর কোনো সাহিত্যে কোনো একজনের সৃষ্টি-শক্তি এতখানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তাহাও লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন: অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার গভীরতম অনুভূতিদ্বারা যে-সত্যের স্পর্শ লাভ করা যায় কবি বহিঃ-প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় তাহারই আভাস পাইয়াছেন। তাই মোহিতলাল লিখিয়াছেন: "রবীন্দ্রনাথ এই অন্তর-গহনের দীপশিখাকেই বস্তু-পরিচয়ের মানস রঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরসধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন।" কিন্তু লেখক দুঃখ করিতেছেন যে "আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে-পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছি ততখানি সঞ্জীবিত হই নাই।" তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের "কাব্যকলার মূল প্রেরণা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কল্পনাকে স্ব-তন্ত্র মুক্তির সন্ধান দেয় নাই" এবং "রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি নাই।"

মোহিতলাল একটি কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন—তাহা এই যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান "ভাবের রূপ-সৃষ্টি, কোনও প্রকার mysticism নয়। তাঁহার কবিচিত্ত ভাব ও বস্তুর যখন যেটাকে আশ্রয় করিয়া যত বিচিত্র রসের সৃষ্টি করুক তাহাতে idealism থাকিলেও mysticism নাই।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোহিতবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই ঠিক্, কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে mysticism কি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে? এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার "চতুরঙ্গ" প্রবন্ধের গোড়াতে যাহা বলেন তাহা বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়—"তাঁহার কাব্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে যাহা মরমী কবিদের কাব্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না। মরমী কবি পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে অরূপের সন্ধান করেন, ইহার বিচিত্রতার মধ্যে এক বিরাট একক আত্মার স্পন্দন শুনিতে পান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মরমী কবিতার এই বিশেষ সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্য, তাহার রূপের অফুরন্ত মাধুর্য্যও ফুটিয়াছে।………তাঁহার কাব্যে অসীম ধরা দিয়াছে সীমার মধ্যে, অনন্ত তাঁহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে খণ্ড সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে।"

মোহিতলালের আরও দুই একটি মত উদ্ধার করা যাইতে পারে যাহাদের সম্বন্ধে তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা আছে। অনেকস্থলে ভাষার জটিলতার জন্য তাঁহার কথার অর্থ ঠিকমত বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রধান বক্তব্য সুপরিস্ফুট। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তারিত ও চিন্তাশীল আলোচনা ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় কেহ করেন নাই।

মোহিতলাল ব্যতীত আর একজন লেখক 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পুস্তকে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়াছেন—"রবীন্দ্র-কাব্য-জিজ্ঞাসা" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি সুলিখিত; লেখক রসগ্রাহী ও চিন্তাশীল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার মতামত অনেক সময়ই অপরিণত বিচারশক্তির পরিচায়ক। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যকে

লেখক বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপ সম্বন্ধে 'বস্তুতন্ত্র' বিশেষণটি বহুপ্রয়োগের ফলে শুধু পুরাতন নহে নিতান্তই সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাহাই হোক্, এইরূপ একটি সঙ্কীর্ণ বিশেষণদ্বারা একটি সমগ্র মহাদেশের বিচিত্র সাধনাকে কি ব্যাপকভাবে অভিহিত করা চলে? আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন: "মানুষের অন্তরের সকল বিচিত্র অনুভূতিকে এমন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে এমন সুন্দর, সরস ও সার্থক অভিব্যক্তি দিতে কালিদাস ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কেহ আছে বলিয়া মনে হয়না।" এই উক্তিটিও অত্যন্ত অযথাভাবে ব্যাপক। লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমান্টিক আদর্শের ও ভাবের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, "কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্যের সকল লক্ষণই ষোল কলায় বর্ত্তমান।" তিনি কি বলিতে চান Shelley, Wordsworth বা Coleridge-এর কবিতার সকল বৈশিষ্ট্য কালিদাসে পাওয়া যায়? আর একস্থলে তিনি বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদা রোমান্টিক আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই সাহিত্য-বিচার করিয়াছেন এবং "সাহিত্য-বিচারে তাঁহার এই রোমান্টিক পক্ষপাত অতিশয় সুন্দর এবং লিরিক্যাল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার 'জয়-পরাজয়' গল্পে।" কেননা, রাজসভায় পুণ্ডরীকের কাছে 'রোমান্টিক' কবি শেখরের পরাজয় ঘটিলেও, রবীন্দ্রনাথ "সুচতুরভাবে শেখরের জয়-ঘোষণাই করিয়াছেন।" এই জাতীয় অপরিণত মতামত সম্বন্ধে তর্ক করিতে গেলে বিস্তৃত প্রবন্ধের আয়োজন করিতে হয়। কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও অরুণকুমারের প্রবন্ধটি উপভোগ্য, কারণ তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী সরস।

ভাষার মাধুর্য্যে এবং সহজ রসগ্রাহিতায় এই পুস্তকটির শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ শ্রীমতী আশা দেবীর 'সৌন্দর্য্যে রবীন্দ্রনাথ'। লেখিকা জটিল তর্কের সৃষ্টি করেন নাই, গুরুভার তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই, সংক্ষিপ্ত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শুধু এই কথাই বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'পুরোধা পরিচয়' তিনি কবি—সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা। এই প্রসঙ্গে লেখিকা সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি তাহা যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে শুধু রসগ্রাহিতার নয়, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় যে তিনি কবি এই কথা শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়ও "কবি রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক কুড়িপাতা প্রবন্ধে বিস্তর বাক্যব্যয় করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া যে তিনি ঋষি নন, পাছে কেহ এরূপ ভুল ধারণা করিয়া বসে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কেন ঋষি লেখক বহু দুর্দ্ধর্ষ যুক্তির প্রয়োগে তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা, "সর্ব্বোপরি, তাঁহার ঋষিত্বের সব চেয়ে বড় চাক্ষুষ অভিজ্ঞান তাঁহার সুদর্শন চেহারা।" শুধু তাহাই নয়—"শান্তিনিকেতনে, প্রত্যূষে অথবা প্রদোষে কবিগুরুকে একা মাঠের মধ্যে অথবা ছাদের উপরে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই ঋষিত্ব কত বড় সত্য।" এই জাতীয় বহু অকাট্য প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন—তাই তিনি মনে করেন "রবীন্দ্রনাথ ঋষিও বটেন।" রবীন্দ্রনাথ সব, কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি কবি এই হইল নীহাররঞ্জনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সহজ কথাটি জগতে প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রভূত আয়াসে বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা পূর্ব্বক এই বিপুল প্রবন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে "কবি অপেক্ষা ধ্যানবলে বলীয়ান্ কেহ নাই, কবি অপেক্ষা জ্ঞানবলে

বলীয়ান্ কেহ নাই। বিশ্বভুবন সবই তিনি জানেন। তিনি আমাদের সখা, তিনিই আমাদের পরম বন্ধু" এই শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া প্রচণ্ড নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘোষণা করিতেছেন :—

"———রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।"

'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পুস্তকটির আর একটি প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রনাথের নাটক"—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুমারবাবু রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন না। এই মতে অনেকেই আপত্তি করিবেন—কোন বড় শিল্পীসম্বন্ধেই সকলে একমত হইতে পারেন না। ভাবিকালের বিচারে হয়তো শ্রীকুমারবাবুর মতই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, হয়তো করিবে না। কিন্তু তাঁহার মত যাহাই হউক, শ্রীকুমারবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভালো করিয়া লিখিয়াছেন—সাহিত্য-সমালোচনা করিতে হইলে এই ভাবেই করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেকেই উচ্ছ্বাস করেন, সাহিত্যিক বা ব্যক্তিগত কারণে বা অকারণে তাঁহাকে গালি দিতেও লোকে ছাড়ে না; শ্রীকুমারবাবু যে-ভাবে প্রকৃত সমালোচকের রীতিতে তাঁহার নাটকের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

'জয়ন্তী-উৎসর্গে' আরও বহু প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে—সেইগুলির আলোচনা এস্থলে করা সম্ভব নহে। তাই কয়েকটিমাত্র প্রবন্ধের পরিচয় দিয়া এই আলোচনা শেষ করা হইল। কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতাটি নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষায় এইরূপ কবিতা সচরাচর পড়িতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাটিও সুন্দর।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

আধুনিকী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত (মডার্ণ বুক এজেন্সি)

তিন কারণে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের আধুনিকী-প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রথমত তাঁর মতো অগাধ পাণ্ডিত্যে আমি বঞ্চিত; দ্বিতীয়ত এই পাণ্ডিত্য এত অস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে যে লেখকের বক্তব্য-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হ'তে পারিনি; এবং তৃতীয়ত তাঁর ও আমার দৃষ্টি এমনি বিপরীতমুখী যে, কোনো বিষয়ে আমাদের একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কাব্য ও কাব্যবিবেচনা ভিন্ন পর্য্যায়ের বস্তু। কাব্যের বেসাতি আবেগকে দিয়ে; সুতরাং তার আবেদন বুদ্ধির তোয়াক্কা রাখে না, দেহের দৌত্যে একেবারে গিয়ে অন্দরে হাজির হয়। এবং বুদ্ধিতে জাতিবিচার থাকলেও, দেহ যেহেতু সাম্যবাদী, তাই পাঠক বিধর্ম্মী হ'লেও, কবির পায়ে মাথা নুয়তে সে বাধ্য। পক্ষান্তরে কাব্যবিবেচনা তর্কাধীন, কারণ তার দেনাপাওনা সত্যকে নিয়ে; এবং সত্যমাত্রেই প্রামাণ্য। অন্তত আমি এখনো কোনো ধ্রুব-সত্যের সন্ধান পাইনি। কাজেই সমধর্ম্মী-ব্যতীত সমালোচকের পসার জমে না। কথাটা প্রথমে হেঁয়ালির মতো শোনালেও, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, প্রস্তাবনাকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে না-মেনে নিলে, নৈয়ায়িকের জারিজুরি নিতান্ত নিঃসার।

কারণ যাই হোক্, নলিনীকান্ত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে যে-প্রভেদ নির্দ্দেশ করেছেন, সে-ভেদজ্ঞান আমার কাছে, কেবল অসঙ্গত নয়, বিপজ্জনক ব'লেও বোধ হয়। তাঁর মতে পুরাতন সাহিত্য মানুষের দেবত্ব-ব্যঞ্জক, আর আজকালকার সাহিত্যিক মানুষের পশুত্ব-প্রচারে বদ্ধপরিকর। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তকে আমি অমূলক মনে করি, কারণ মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলোই যদি তার পশুত্বজ্ঞাপন করে, তবে এক ভিক্টোরিয়ার বকধার্ম্মিক যুগ ছাড়া, সকল কালে এবং সকল দেশে ঠিক ওই প্রবৃত্তি-গুলোর বর্ণনাকল্পেই অধিকাংশ সাহিত্যের সৃষ্টি। স্কুলপাঠ্য-হিসেবে মহাভারতের কাটতি নেই এবং শত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও বাইবেল আজো কুমারীভোগ্য হ'তে পারেনি। এরিষ্টফেনিস্ থেকে উত্থিত হ'য়ে, পেট্রোনিয়স্, রাব্‌লে, বোকাচ্যো ইত্যাদিকে নিয়ে, পাশ্চাত্য প্রহসনের যে-ধারা উনবিংশ শতকের মরুভূমিতে এসে অদৃশ্য হয়েছিলো, তার সঙ্গে অলকনন্দার উপমাও বোধ হয় অশোভন।

স্বমতের সমর্থনে নলিনীকান্ত চণ্ডীদাসের চারটি লাইনের পাশে এক নামহীন আধুনিক বাঙালী কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত আধুনিক লাইন কটি হাল-আমলের বাঙলা কবিতার প্রতিনিধি হ'তে পারে কিনা জানি না। তবে আশা করি, আজকালকার উল্লেখযোগ্য কবিরা আর 'ব্রণ'-শব্দকে 'উন্মন', 'যৌবন', 'চুম্বনের' মিল-হিসেবে ব্যবহার করেন না। কিন্তু এই ভয়াবহ মিলটিই যদি আধুনিক অধঃপতনের একমাত্র চিহ্ন না-হয়, তাহলে মানতেই হবে যে মিথুনের অলজ্জ বিবরণে প্রাচীনেরা অর্ব্বাচীনের বহু অগ্রে। সংস্কৃত কবিরা নারীকে তো শাপভ্রষ্ট দেবতা ব'লে বিবেচনা করতেন না-ই, এমন-কি তাঁদের চোখে আসল দেবীরাও ছিলেন কামাগ্নির ইন্ধনমাত্র। হোমারের মহাকাব্যে দেখি, ট্রয়বিজয়ী বীরেরা তাদের সেনাপতিকে হারিয়ে মানুষের অমর আত্মার সম্বন্ধে মুখর হ'য়ে ওঠে না, তারা নীরবে নিরত হয় খাদ্যাহার-সংগ্রহে। সফোক্লিসের অতিমানুষ অমৃতের পুত্র নয়, অন্ধ নিয়তির ক্রীড়নকমাত্র; শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে 'দ্বিপৃষ্ঠ পশু'-র উল্লেখ সুলভ; গলিত শবের বর্ণনায় ওয়েব্‌ষ্টার বোদ্‌লেয়র্‌কেও টেক্কা দিয়েছেন। স্মলেট্, ফিল্‌ডিঙ, ষ্টর্ণ্, ক্রেবিইয়ঁ, ল'াক্লো, রেস্‌তিফ্ দ লা ব্রেতঁ, এমন কি আবে প্রেভস্ৎ সুদ্ধ, প্রেমে কোনো নিরিন্দ্রিয় সঙ্গমের পরিচয় পাননি ব'লেই আমার বিশ্বাস।

আসল কথা হচ্ছে, পরাবিদ্যার নিকষে সাহিত্যকে কষতে গেলে এই রকমের প্রমাদ অনিবার্য্য। সাহিত্যের ধর্ম্ম থাকতে পারে, কিন্তু সে-ধর্ম্ম পারত্রিক নয়, ঐহিক, এ-কথাও নিতান্ত নিশ্চয়। 'বলাকায়' রবীন্দ্রনাথ অরূপের অনেক খোঁজ খবর নিয়েছেন; কিন্তু তাই ব'লেই ওই কাব্য 'ক্ষণিকার' চেয়ে মহৎ, এমন অভিমত দুঃসাহসিক। বাস্তবিক পক্ষে এই দুটি পুস্তকের উৎকর্ষ ওদের প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে রূপায়ণের উপর। অর্থাৎ কবির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আবেগ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে ব'লেই পার্থক্য ধরা পড়ে; কিন্তু কবির মনোভাব যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই পাঠকের কাছে সমানভাবে ব্যক্ত, তাই কাব্যসম্পদে ও-দুটির তুল্যমূল্য। প্রকৃতপক্ষে কাব্যবিচারে এই অভিব্যক্তি-রীতিই হচ্ছে মূল কথা; বক্তব্য নেহাৎ নগণ্য। অবশ্য নিখুঁত রূপের সঙ্গে সঙ্গে যদি সুমহান তথ্যের সাক্ষাৎ পাই, তবে আপত্তির কিছু থাকে না; কিন্তু শুধু বক্তব্য বিরাট হ'লেই যদি কাব্য গরীয়ান্ হ'য়ে উঠতো, তবে লঙফেলোকে আমরা হেরিক্-এর উপরে আসন দিতে বাধ্য হতুম, তবে কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-

রচয়িতা নবীনচন্দ্রকে ফুলের ফসল-প্রণেতা সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে বড় বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকতোনা।

সাহিত্যের প্রাণবস্তুর আলোচনা এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক; এবং নলিনীকান্ত এই ব'লে আপত্তি করতে পারেন যে, আধুনিক সাহিত্যের মূল্যনির্দ্ধারণ তাঁর অভিপ্রায় নয়, তাঁর উদ্দেশ্য কেবল বর্ত্তমানের পদানুসরণ। এ-কথার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষি যোগাড় করা হয়তো শক্ত হবে। কিন্তু যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, আধুনিক শিল্পকে "দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প" থেকে আলাদা ক'রে, তাকে "পশু-পিশাচের, প্রেত-প্রমথের, জিন-দানার শিল্প" আখ্যা দেওয়ায় কোনো মূল্যবিচারের চেষ্টা নেই, আছে কেবল পারিভাষিক শুদ্ধি, তবু এ-কথা ভুললে চলবেনা যে, সাহিত্যকে সমাজতন্ত্রের পাদপীঠ-রূপে ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নয়। সংস্কৃত কাব্যের দোহাই দিয়ে প্রাচীন হিন্দুর লাম্পট্য ইতিপূর্ব্বেই ঘোষিত হয়েছে। জীদ্-এর খানকতক বইকে অবলম্বন ক'রে, আধুনিক ফ্রান্সে "উৎকট কামের" অনাসৃষ্টি আবিষ্করণও ঠিক তেমনিতর ব্যর্থ। এটা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, আর্ট ফটোগ্রাফ নয়, আলেখ্য। অবশ্য আলেখ্য কখনো সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেশকে জয় করতে পারেনা; কিন্তু সকল প্রকৃত আর্টিষ্টই অখণ্ডতার খাতিরে তাঁদের চিত্রে অনেক সময়ে এমন অতিরঞ্জন বা অবদমন আমদানী করেন যার জোড়া শুধু একালে নয়, কোন কালেই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

উপরন্তু জাতীয় ব্যাধির পরিমাপকার্য্যে যদি সাহিত্যই একমাত্র মানদণ্ড হয়, তবে যন্ত্রটাকে মুর্গীহাটার মনিহারী দোকান থেকে না-কিনে, তার জন্যে কোনো নামজাদা কারখানার দ্বারস্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এমন মনে করার কোনোই উপায় নেই যে ফরাসী সাহিত্যে নলিনীকান্তের দৌড় শুধু কামিল্ মোক্লের্ অথবা রণে মার্ঁ পর্য্যন্ত। কিন্তু যে-দৃষ্টি দিয়ে তিনি বোদ্‌লেয়র্-এর স্বর্গাভিলাষ আবিষ্কার করেছেন, সেই চোখে র্‌ঁ্যাবো, ভের্লেন্, মালার্মে বা ভালেরির দিকে চাইলেই আধুনিক জগতের অভীপ্সা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতো। তবে এ-সম্বন্ধে আমার অনুমান একেবারে ভুল হ'তে পারে, কারণ যে-প্রুস্ৎ-এর "অস্পষ্টতার মধ্যে" নলিনীকান্তের শ্বাসরোধ হ'য়ে আসে, সেখানে আমি দেখি একটা অপূর্ব্ব আলোকের উদ্ভাস, যে-লাতিনদের তিনি 'অন্তর্জ্ঞান'- অথবা ইন্‌টুইসান্-চালিত মনে করেন তাদের কলায় আমি পাই অতিমাত্রিক বিচারবুদ্ধির পরিচয়, এবং যে-কালিদাসকে তিনি সংযত রূপায়ণের পুরোধা ব'লে ভাবেন, তারি শকুন্তলার অসংহত উচ্ছৃঙ্খলতায় আমার গায়ে জ্বর আসে।

কিন্তু এ-সমস্তই তো পক্ষপাতের কথা, এবং মানুষমাত্রেই ওই দোষে দুষ্ট। কাজেই রুচিভেদের বিষয়ে আর বাক্যব্যয় না ক'রে, কোথায় তিনি আমি একমত সে-খবর দেওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। নলিনীকান্ত ঠিকই বলেছেন যে, পশ্চিমের বর্ত্তমান সাহিত্য পশ্চিমের বর্ত্তমান জিজ্ঞাসার উপযুক্ত উত্তর। সুতরাং সে-উত্তর যতই অপ্রত্যাশিত হোক, তার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। কিন্তু আমাদের মণ্ডূক-ভুক্তিত কূপে সেই পরদেশী কুমীরকে খাল কেটে ডেকে আনলে, সুশৃঙ্খলার চেয়ে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য বিপ্লবমাত্রেই নিন্দনীয় নয়, কিন্তু বিপ্লবকে বৈনাশিকতার কবল থেকে বাঁচাতে হ'লে, তার পিছনে একটা চেতনার তাগিদ, একটা সৃষ্টির আকৃতি, একটা সামঞ্জস্যের সংস্কার থাকা অত্যাবশ্যক। নিছক নকল নরের কাজ নয়, সে শোভা পায় বানরকে। যে-কলায় অন্তরের কোনো প্রয়োজন লক্ষিত হয়না, সে-কলা কৃত্রিম,

সে-কলা অচিরে পরিণত হয় কৌশলে। ঠিক এই ভাবে না বললেও, আমার বিশ্বাস, এই মহাপ্রমাণ উপদেশের উক্তি-পুনরুক্তিতে 'আধুনিকী' মুখর।

কিন্তু কেবল এই জন্যেই নলিনীকান্ত আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন নন। পড়ার অভ্যাস এ-দেশে খুব বিরল না-হ'লেও ভাবার চেষ্টা এখানে অপ্রচল। সুতরাং নলিনীকান্তের মতো যিনি বিদ্যাকে পাণ্ডিত্যাভিমানের নিমিত্তমাত্র না-ক'রে তাকে লাগান স্বাধীন চিন্তার পদসেবায়, তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে পারি বা না-পারি, তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আমরা বাধ্য।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

India's Mission in the World—Anilbaran Roy.
Published by the Hindu Mission, Kalighat.

একখানি ক্ষুদ্রকায়া পুস্তিকা। শ্রীঅরবিন্দের নানা পুস্তকের ও নানা প্রবন্ধের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার খ্যাতনামা পুরুষ, সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি যাহা লিখিবেন, তাহা সর্ব্বদাই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এই অতিসংক্ষিপ্ত পুস্তিকা কেন লিখিয়াছেন। প্রকাশকের নাম দেখিয়া হয়ত বা কেহ সন্দেহ করিবেন যে, ইহা একটা mission বিশেষের tract (প্রচার পত্রিকা) মাত্র। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য্যের সহিত শ্রীঅরবিন্দের নাম সংশ্লিষ্ট থাকা এত অস্বাভাবিক যে এ সংশয় নিমেষমাত্রও মনে স্থান পাইতে পারে না। আমরা আজ কল্পনাচক্ষে ভাবী ভারতরাষ্ট্রের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, সে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি ত অরবিন্দই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। আমাদের হৃদয় আজ সেই সমগ্র বিরাট মূর্ত্তির দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখিবার অবকাশ আমাদের কোথায়? সুতরাং, ভারতের mission কি তাহা আমাদের স্থির করিতে হইলে, এক অখণ্ড দেশ-মাতার কথাই ভাবিতে হইবে। খণ্ড খণ্ড জাতি বা সম্প্রদায়ের বিক্ষিপ্ত কার্য্যক্রম আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায়-বিশেষের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ আমাদের নমস্য সন্দেহ নাই, কারণ mission সকলেরই আছে। যেমন মহাজাতির মহান্ mission আছে, তেমনই জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, পরিবার, এমন কি মনুষ্যমাত্রেরই নিজের নিজের mission আছে। নির্ঝরিণীর সহিত মহানদের যে সম্বন্ধ, হয়ত এই খণ্ড খণ্ড mission-এর সহিত রাষ্ট্রের mission-এরও সেই সম্বন্ধ। তথা, রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা গতির সহিত মহামানবের mission-এর সম্বন্ধ একই রূপ। ঋষিকল্প মহাপুরুষের ধ্যেয় বস্তু সমগ্র বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টির উন্নতি অধোগতি তাঁহার ধ্যান বিষয়ের বহির্ভূত। অনিলবরণবাবুর মত সাধনাশ্রমবাসীর নিকট হইতে আমরা এই প্রত্যাশা করি যে, তিনি আমাদের লৌকিক দেশসেবার সহিত আধ্যাত্মিক বিশ্বপ্রেমের সামঞ্জস্য করিয়া দিবেন। কিন্তু এ কার্য্য করিতে গিয়া যদি তিনি আমাদের নব অর্জ্জিত রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আরও খর্ব্ব করেন, যদি মুখে ভারত বলিয়া তিনি মনে হিন্দুভারতের চিন্তা করিতে শিক্ষা দেন ত তাঁহাকে শিক্ষক পদে বরণ করা কঠিন হইবে। আলোচ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথম আপত্তি। India's

mission নাম দিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতে হিন্দু ব্যতিরেকেও যে অন্য বহু সম্প্রদায় আছে তাহাদের উল্লেখ দুই-এক স্থানে ভিন্ন প্রায় নাই। (২৭ ও ৩৭ পৃষ্ঠায় যৎসামান্য আছে)। গ্রন্থকার কোথাও দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই যে, ভারতীয় রাষ্ট্র-গঠনের জন্য হিন্দু আদর্শের সহিত মুসলমান বা খৃষ্টান আদর্শের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য কিরূপে করিতে হইবে। হিন্দুর বর্ণাশ্রম, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ, গীতার অবতারবাদ জড়িত উপদেশ এ সব ভারতের অহিন্দুরা কেন গ্রহণ করিবে? মুসলমানের বা খৃষ্টানের ত নিজের সবই আছে। সে কেন Aryan Culture বা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার নামে নৃত্য করিবে? তাহা হইলে ভারতের mission কি মুসলমানদিগের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করা, ছলে বলে কৌশলে ভারতীয় অহিন্দুকে হিন্দুর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করান? এ দুরূহ বিষয় অনিলবরণবাবুর আলোচনা করা উচিত ছিল। তিনি ত এক সময় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা রূপে সকল সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গীর আব্দার, মুসলমানের আব্দার, পঞ্চম জাতির আব্দার, এ সকলের নিন্দা ত আমরা অহরহ করিতেছি। উচ্চবর্ণের হিন্দু ভারতের ইতর সব জাতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এ দেশে রাষ্ট্রগঠন যদি করিতে হয় ত কনিষ্ঠের আব্দার সহিতে হইবে। কিন্তু যদি দেখি জ্যেষ্ঠও আব্দার আরম্ভ করিয়াছে, ত যজ্ঞ পণ্ড হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ভারতের কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য মহাজাতিসংঘটন। যদি আমরা জগৎকে কার্য্যতঃ কোন দিন দেখাইতে পারি যে, ভারতের হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান আপন আপন ধর্ম্মে অনুরাগী থাকিয়াও দ্বেষ মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়াছে, রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার জন্য একমন একপ্রাণ হইয়াছে, তবেই আমাদের mission সার্থক হইবে, আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। তখন 'রাষ্ট্রের নূতন পরিপূর্ণ আদর্শ লইয়া ভারত জগৎ সমক্ষে আবার উচ্চ শির হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস আমাদিগকে এই মহাব্রতের দিকে ধীরে ধীরে লইয়া আসিয়াছে। পরন্তু দুর্দ্দিনে যে হীনতা, অক্ষমতা সঞ্চয় করিয়াছি, আজ তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। যে স্বার্থত্যাগ ও সংযম প্রয়োজন তাহা ভারতের জাতিমাত্রকেই অভ্যাস করিতে হইবে। অহিংসা অপেক্ষাও মহত্তর যে গুণ, মৈত্রী, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। এই সাধনায় অচল অটল হইয়া পথ দেখাইবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হিন্দুর নবীন উদ্যম, নবীন শক্তি, কোথা হইতে আসিবে তাহা গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয় এত সংক্ষেপে সারিয়াছেন যে, তাহা হইতে তাঁহার দেশবাসী কোনও উপকার পাইবে না। শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা এই পুস্তিকার স্থানে স্থানে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কিন্তু জহুরীর নিপুণতার অভাবে এ রত্নরাজিও যেন অপেক্ষাকৃত ম্লান দেখাইতেছে। কোথাও কোথাও বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্য রচিত সংক্ষিপ্তসারের মত বোধ হয়, যেন কণ্ঠস্থ করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। কোথাও বা আদালতে উকীলের অভিভাষণের মত পক্ষপাতদোষদুষ্ট। বিরুদ্ধমত খণ্ডন মাত্রই দূষণীয় নহে। তবে ইংরেজীতে যাহাকে বলে tilting at a windmill, অর্থাৎ বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা, তাহা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। পণ্ডিত জওয়াহের লাল বা মহাত্মা গান্ধী, কেহই উৎকট সাহেবিয়ানা কিম্বা অন্ধ ধর্ম্মহীনতার উপাসক নহেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-প্রাণতা ইহাঁদের বা অন্য কাহারও অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। উপরন্তু গ্রন্থকার নিজেই আক্ষেপ করিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্ম-প্রাণতা আজ একটা প্রাণহীন কঙ্কাল

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাও তিনি বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন যে, কেবল প্রাচীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাদ্বারা ভারতের সমস্যা মিটিবে না। তবে কাহার বিরুদ্ধে এত তর্কের অবতারণা? এই রাজা মহারাজা নবাব বেগম অধিষ্ঠিত দেশে, এই পুরোহিত মোল্লা, গুরু মহান্ত অধিরূঢ় সমাজে, বল্‌শেভিক বিপ্লবের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং বল্‌শেভিকবাদ খণ্ডন করিবার উগ্র প্রয়াসও নিষ্প্রয়োজন। লেনিন বা মার্ক্সের নাম জানে এরূপ লোকই বা এদেশে কয়জন? আর এই মহাপুরুষের পন্থা অনুসরণ করিতে চাহে বা পারে যাহারা, তাহারা ত নিতান্ত মুষ্টিমেয়। তবে এই বহুজনমান্য জগদ্‌বিখ্যাত মনীষীদিগকে দানবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সার্থকতাই বা কোথায়? বৌদ্ধ ধর্ম্মের বা শঙ্করপ্রবর্ত্তিত মায়াবাদের হীনতা প্রচার করিবারও প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। গণতন্ত্রে বহুমতের অত্যাচার, socialism-এ স্বতন্ত্রতার নাশ এ সবেরই গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধীজীর চরখার উপর শ্লেষ ত আছেই। এক ক্ষুদ্র পুস্তিকার ৭০ পৃষ্ঠার মধ্যে এত শত্রুর বিলোপ সাধন সম্ভব নহে। ফল হইয়াছে যে, মূল কথা, মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অনেক অবান্তর তর্ক বিতর্ক শ্লেষের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছে। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়কে সাহায্য করিবার জন্য এ পুস্তক ত লেখা হয়ই নাই, কিন্তু হিন্দু পাঠকও ইহার মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন না যে, তাঁহাকে কি করিতে বলা হইয়াছে। অহঙ্কার নিন্দনীয়, তাহা পরিহার কর, স্বার্থ বলি দিয়া স্বদেশের কার্য্য কর, সকল কর্ম্মের ফল ভগবৎ চরণে অর্পণ কর, এইরূপ উপদেশ অনেক আছে। কিন্তু এ উপদেশ ত হিন্দুর কি ভারতবাসীর মৌরসী সম্পত্তি নহে। ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ একথাও বোধহয় সকল যুগে সকল দেশে শোনা গিয়াছে। এই সমস্ত শাশ্বত সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া, শুধু ভারতে রাষ্ট্র কেন, ভূতলে স্বর্গের সৃষ্টি করা যায়। আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ-ভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত আধ্যাত্মিক সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, এ কথা বারম্বার বলায় লাভ কি? কথার ভেল্কী লাগাইবার লোক আজও ভারতে অনেক আছে। যে গভীর তমোরূপ পঙ্কে ভারতবাসী নিমগ্ন, তাহা হইতে উদ্ধারের পথ কেবল কর্ম্মের মধ্য দিয়া। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথা কতবার বলিয়া গিয়াছেন। দুটী বাক্য তিনি সময়ে অসময়ে তাঁর দেশবাসীকে শোনাইতেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এবং "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। এই একই উপদেশ সেকালে শ্রীঅরবিন্দের মুখেও কতবার শুনিয়াছি, "কর্ম্মযোগিন্"-এও পড়িয়াছি। আলোচ্য পুস্তকে একথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে যে অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন "নিয়ত কর্ম্ম কর অর্জ্জুন, অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ," এই উপদেশই আজ ভারত সকল সাধকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করে। এই কর্ম্মই তাহার মুক্তি, এই কর্ম্মের মধ্যেই তাহার সকল জড়তা, সকল ভেদবুদ্ধির অবসান হইবে।

আর একটু বক্তব্য আছে। অনিলবরণবাবু যে alien ideals বা বিজাতীয় আদর্শের এত নিন্দা করিয়াছেন, আশা করি তাহা spiritual বা আধ্যাত্মিক আদর্শ নহে। আত্মারও জাতিভেদ আছে এ কথা বলিলে অতি বড় দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরেজীতে religion বলিতে যে ধর্ম্ম বুঝায় তাহা সনাতন সার্ব্বজনিক ও ধ্রুব। যে পরধর্ম্মকে গীতা ভয়াবহ বলিয়াছেন তাহা ব্যক্তিগত বা জাতিগত কর্ত্তব্যের সমষ্টিমাত্র। হিন্দুর নিকট একথা পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন আছে। পুস্তিকার শেষের দিকে বলা হইয়াছে যে, "ভারত যদি তাহার এই সুযোগ হেলায় হারায়, যদি ভারত পরকীয় আদর্শ

বা পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যচ্যুত হয়,. তবে অন্য কোনও দেশ এই কার্য্য মাথায় তুলিয়া লইবে ও জগৎকে তাহার চরম আধ্যাত্মিক পরিণতির দিকে লইয়া যাইবে।” যদি তাহাই হয় ত জগতের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে? ভারত যাহা পারিল না, অন্য দেশ তাহা করিল ইহাতেই বা ক্ষোভের কারণ কি আছে? সমস্ত পৃথিবী যাহা পাইবে ভারতই বা তাহার ফললাভে কিরূপে বঞ্চিত হইবে? আধ্যাত্মিক জগতে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে কি?

ভারত এক হউক, মহান্ হউক, রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ করুক এই তাহার mission। তাহার পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনে জাতি ও ধর্ম্মগত সকল দ্বেষ লয় প্রাপ্ত হউক, তাহার কীর্ত্তি ও সফলতা দেখিয়া সমস্ত জগৎ শিখুক যে ভেদ অনিত্য, অভেদই সত্য ও শাশ্বত।

গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। তাঁহাকে বিন্দুমাত্র অসম্মান দেখান আমার অনভিপ্রেত। আশা করি আমার সমালোচনা তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Africa View—JULIAN HUXLEY, (Chatto and Windus).

মধ্য আফ্রিকা আফ্রিকা-মহাদেশের একটি বৃহৎ অংশ; এখানে বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূচনা এখনও হয় নাই। পৃথিবীতে এই একটিমাত্র মহান ভূখণ্ড এখনও অবশিষ্ট আছে যেখানে পুরাতনের ধ্বংসব্যতিরেকেও নূতন সভ্যতার অভ্যুত্থান সম্ভব। ইহার অধিবাসীদিগকে সভ্য করিয়া তুলিতে ইংলণ্ডেরই সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, কারণ উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী অধিকার আকারে ব্রিটিশেরই সমতুল্য হইলেও, তাহার অধিকাংশই সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত। এবং ভারতীয় ও আরব সভ্যতা কেবলমাত্র পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূভাগেই আবদ্ধ। তাহার প্রভাবও অত্যন্ত ক্ষীণ। তা ছাড়া সে-প্রভাব ব্রিটিশের রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতে অচিরে ক্ষীণতর হইবে, মনে হয়। কিন্তু মধ্য আফ্রিকায় সভ্যতা বিস্তার করা হয়তো ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যরবি আজ মধ্যাকাশ হইতে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে: বর্ত্তমান জগৎব্যাপী অর্থসঙ্কটের আবর্ত্তে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যলক্ষ্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী, এই অবস্থায় ইহা আশা করা যায় না যে, ইংলণ্ড উপস্থিত লাভ ত্যাগ করিয়া এরূপ কোনো মহৎ পরীক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে যাহার ফল লক্ষিত হইবে বহুযুগ পরে।

প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ জুলিয়ান্ হাক্স্লির ‘এফ্রিকা ভিউ’ গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি মধ্য আফ্রিকাবাসীদের জন্য এমন সভ্যতা কামনা করেন না যাহাতে তাহারা বস্তিবাসী কুলীমজুরে পরিণত হইবে। তাঁহার বিশ্বাস, এরূপ ঘটিলে তাঁহার মাতৃভূমির কলঙ্কের অন্ত থাকিবে না।

হাক্স্লি প্রারম্ভেই তাঁহার স্বদেশবাসীদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, আফ্রিকান নিগ্রোসমষ্টি উপেক্ষার বা অবজ্ঞার পাত্র নহে। তাহাদের মধ্যে সকল প্রকার য়ুরোপীয় ভাবের আভাস আছে; তাহাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভ্যন্তরে

মনুষ্যজনোচিত সকল বৃত্তি লক্ষিত হয়। আফ্রিকায় পিগ্‌মি এবং বুস্‌ম্যান ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহৎ সমাজ, প্রশংসনীয় বিধি-ব্যবস্থা, নিজস্ব আইন এবং স্বতন্ত্র বিচার-পদ্ধতি আছে। মালিকীয়ানা স্বত্ব, ব্যবস্থাসভা, নীতিশাস্ত্র, গ্রাম্য ও জাতীয় শাসন, এমন কি অল্প পরিমাণে শিক্ষার বিস্তার এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিও দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত বিশাল রাজ্যের ইতিহাস এবং রাজবৃত্তিভোগী ঐতিহাসিকের খবরও শোনা যায়।

হাক্স্লি আশা করেন যে “এফ্রিকা ভিউ”-এর পাঠকেরা নেটিভ্ সম্বন্ধে বিশদরূপে জানিলে নিজেদের জাতীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি বর্জ্জন করিতে পারিবেন। কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয় গোঁড়ামি ঘুচিলে অথবা কতিপয় প্রাণীবিদের বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য জাগিলেই কি ইংলণ্ডের জনমত জেনারেল স্মাট্‌স্-এর “শ্বেত মেরুদণ্ড” প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপেক্ষা করিতে পারিবে? উক্ত শ্বেত মেরুদণ্ডের অর্থ এই—কেনিয়া হইতে ভাঙ্গানিকার মধ্য দিয়া নায়াসাল্যাণ্ড্ এবং রোডেসিয়া হইয়া দক্ষিণ এফ্রিকা পর্য্যন্ত সংলগ্ন উপনিবেশের উপযুক্ত যে উচ্চ ভূমিখণ্ড আছে তাহা শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত করা। এই স্থানে নিগ্রোদের গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখাই ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসের প্রধান অভিসন্ধি।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন হাই-কমিসনর একটি সরকারী পত্রে প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সম্প্রসারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে তখন রাজনৈতিক দাবা খেলায় যত কম চালে সম্ভব সাদাকে দিয়া কালোকে মাৎ করাই গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই সময় হইতে ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিয়াছে। এমন কি জমী ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা কতকগুলি বিলাতী সিণ্ডিকেট্ প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের সংখ্যা এখনও অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠে নাই তাহার কারণ শ্বেতাঙ্গদের বিশ্বাস যে, দরিদ্র স্বজাতীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্ত্ব ও প্রভুত্ব দেশীয় লোকের চক্ষে খর্ব্ব হইবে। অকিঞ্চন শ্বেত ও কৃষ্ণের মধ্যে আর্থিক প্রতিযোগিতাও এই প্রসারের পরিপন্থী। সমস্যা সমাধান কল্পে জেনারেল স্মাট্‌স্ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নেটিভ শ্রমজীবিদের স্ত্রীপুত্রের জন্য নিম্নভূমিতে একটী আবাসস্থল নির্দ্ধারিত থাকিবে। সেই সীমার মধ্যে প্রত্যেক নিগ্রো আবদ্ধ রহিবে। এমন কি যাহারা শ্বেতাঙ্গদের বাগানে কুলীমজুরের কার্য্য করিবে উচ্চভূমিতে তাহাদের সস্ত্রীক প্রবেশও নিষিদ্ধ হইবে। ইহাতে নেটিভ গ্রামের মধ্যে অপুত্রক নারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

হাক্স্লি বলিয়াছেন যে, আফ্রিকাবাসী য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন এই প্রস্তাবের পক্ষে। তাহারা নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও অপছন্দ করেন, কারণ তাহাতে নিগ্রোজাতির রাজনৈতিক অভীপ্সা জন্মিতে পারে। হাক্স্লি এই মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রতিবাদ উক্ত প্রস্তাবটী স্বার্থদুষ্ট বলিয়া নহে। তিনি মনে করেন, জেনারেল স্মাট্‌স্-এর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে আফ্রিকার স্বকীয় সভ্যতা বিকসিত হইতে পারিবে না। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে আস্থাহীন যে কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উক্ত উপায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া উচিত। কিন্তু হাক্স্লির অসুবিধা হইতেছে যে, তিনি নিজে শ্বেত উপনিবেশের পক্ষপাতী। তবে তিনি মনে করেন যে, এই উপনিবেশের বিস্তৃতি ধীরে ধীরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহার মতে শ্বেত-

কৃষ্ণের স্বার্থ সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী নহে। নেটিভ চীফ্ ও গ্রামবৃদ্ধের দ্বারা তাঙ্গানিকা প্রদেশে শ্বেতাঙ্গদের যে পরোক্ষ-শাসনের ব্যবস্থা আছে হাক্স্লি তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নেটিভগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছু না লইয়াই স্বকীয় সমাজ গঠনে সক্ষম হইবে; ফলে তাহাদের স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাসের কোন বাধা থাকিবে না।

হাক্স্লির এই বিশ্বাস কিন্তু নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে হয়। নেটিভ চীফদের মারফতে তাঙ্গানিকার সুশাসন সম্ভব হইয়াছে, কারণ সেখানকার শ্বেত অধিবাসীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, সুতরাং গভর্ণমেন্টের চাপ অল্প। উপরন্তু তাঙ্গানিকা একটি Mandated Territory, অর্থাৎ উহার উন্নতি-অবনতির হিসাব-নিকাস পেশ করিতে হয় লীগ্ অফ্ নেশন্স্-এর নিকটে। এক্ষেত্রে কোনো স্বার্থ-সংঘাত নাই, কাজেই যদি কোনো স্থানীয় চীফ্ জাতীয় আচার অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রজাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে চাহেন, তবে সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে যে সাহায্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ এইরূপ সাহায্য করিবার জন্যই উক্ত কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই অফিসাররাই যদি কেনিয়াতে বদলি হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারাই নেটিভদিগকে শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারোপযোগী দ্বিপদ জন্তু ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করেন না।

সে যাহা হউক, শ্বেতাঙ্গদের পরোক্ষ প্রভুত্বের সমর্থন করিতে গিয়া হাক্স্লি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—নেটিভদের সভ্যতা কৃষিপ্রধান হইবে। নিগ্রো নাগরিক ও কৃষকই হইবে দেশের মেরুদণ্ড। তাহারা নিজ নিজ ভূমি কর্ষণ করিবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রামে মনোরম গৃহে বাস করিবে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতিকর সহরে সারা দেশ ছাইয়া যাইবে; চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিবে সাপ্তাহিক হাট ও ছোট ছোট পঞ্চায়েৎ। নিগ্রো পরিচালিত আদালত, হাঁসপাতাল, স্কুল, ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশময় আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত থাকিবে। ইহাতে সমগ্র জাতির একাত্মবোধ জন্মিবে, অথচ স্ব স্ব আচার-ব্যবহার, উচ্চারণরীতি, প্রাদেশিকতা, পোষাকপরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিবে—যেমন ব্রিটিশ যুক্তরাজে ওয়েল্স্, হাইল্যাণ্ড ও ডেভনবাসীদের আছে। তিনি মানস চক্ষে দেখিয়াছেন, বহু প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে মোটার ও বাস পরিপূর্ণ। সেই রাজপথগুলিই বিভিন্ন সহরকে যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে। সহরে যাহারা আছে তাহারা মোটামুটি শিক্ষিত, বেতারবিলাসী, সংবাদপত্রপাঠক ইত্যাদি।

এই স্বপ্নচিত্রের সার্থকতা বোঝা শক্ত। হয়তো অন্যান্য স্থলে আফ্রিকাবাসী মিশনারী ও য়ুরোপীয়দের কুকীর্ত্তির যথার্থ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি যে ভীষণ ছবি আঁকিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই স্বপ্নচিত্র সেই কলঙ্ক কালিমার বর্ণসামঞ্জস্য করিবে ভাবিয়াই তিনি সুদূর ভবিষ্যতের শরণ লইয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, আসল ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুসভ্য কেনিয়ার পথে-ঘাটে বে-পরিমার্জ্জিত নিগ্রো কুলিমজুরদের ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় তাহারা অন্য রকমের এবং কেনিয়ার প্রত্যেক গ্রামেই প্রগতির যে সাড়া শুনা যায় তাহাতে বোধ হয় যে পশ্চিমের জ্ঞান, ধনলিপ্সা, খ্রীষ্টধর্ম্ম, পুস্তক, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র ও সস্তা সৌখিনি দ্রব্যের প্রভাবে দেশের অন্তঃস্থলে ঘুণ ধরিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, সমগ্র আফ্রিকা যদি এই নব্য জ্ঞান ও অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে তবে তাহার

পরিণাম হইবে শোচনীয়, অন্ততঃপক্ষে য়ুরোপীয় দেশগুলির তুলনায়। পশ্চিমের নূতন মনোভাবের পিছনে যে বহুশতাব্দীসঞ্চিত সংস্কার ও সবল জনমত আছে, তাহাই তাহাকে স্থিতিশীল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব যদি কোনো নূতন খেয়াল পুরাতনকে ধ্বংস করিতে চাহে, তাহাতে সমাজের ডালপালা বিনষ্ট হইলেও, মূলে আঘাত লাগে না। কিন্তু আফ্রিকা এখনো সেই জগতে বিরাজমান যেখানে প্রবৃত্তি অদৃষ্টচালিত, বিজ্ঞান জাদুবিদ্যার অন্তর্গত, সংস্কার শিশুসুলভ; আফ্রিকান নিগ্রো এখনো মাটির সঙ্গে এত ঘনিষ্ট সূত্রে বাঁধা আছে যে, কোনো দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে হয়তো তাহার বাঁচা দুষ্কর হইবে।

স্থানীয় শ্বেতাঙ্গেরা অবশ্য নিগ্রোদের সাহেবিয়ানার চেষ্টার সমর্থন করেন না। কিন্তু এই প্রয়াস মর্ম্মান্তক হইলেও, অনিবার্য্য বলিয়া হাক্স্লি তাঁহাদিগকে সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধিতে নবীন বলিয়াই নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গ প্রবীণদের অনুকরণ করিতে বাধ্য। যুক্তিটার সঙ্গে আমরা ভারতে সুপরিচিত। এদেশের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ইঙ্গবঙ্গেরাও এমনি করিয়াই য়ুরোপীয়দের উপহাস্য হয়। কিন্তু ইহা ভুলিলে অন্যায় হইবে যে, পশ্চিমের আত্মশ্লাঘার পিছনে যতদিন বাহুবলের ইসারা থাকিবে, ততদিন এই অনুকরণ অবশ্যম্ভাবী। এখানকার মিশনারী বিদ্যালয়ে যেমন আর্য্যামি শিক্ষা দেওয়া হয়না, তেমনি আফ্রিকান পাঠশালাতেও কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার ও ক্রিশ্চান ধর্ম্মের প্রকীর্ত্তিই প্রচারিত হয়। অথচ সেই আদর্শকে নিগ্রোরা যখন নিজেদের জীবনে ফলিত করিতে চাহে, তখনই স্থানীয় য়ুরোপীয়দের গাত্রদাহ জাগে। হাক্স্লি অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরা নিগ্রো ক্রিশ্চান অপেক্ষা নিগ্রো মুসলমানদেরই অধিক পছন্দ করেন। যে নিগ্রো লিখিতে পড়িতে পারে তাহার চাকরি পাওয়া সহজ নহে; এমন কি লেখা পড়া জানার অপরাধে সুযোগ্য সুদক্ষ্য নেটিভের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে বলিয়াও শুনা যায়।

আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে হাক্স্লির ধারণা খুব উচ্চ নহে। ভারতীয় বাসগৃহের আশে পাশে বিছানা কাপড় শুকাইতে দেখিয়া হাক্স্লি সম্ভবতঃ স্তম্ভিত হইয়াছেন। পশ্চিমের প্রথায় অপরিচ্ছন্নতা গোপন করাই সুরুচির পরাকাষ্ঠা এবং অপরিষ্কার বস্ত্রকে ধৌত করিয়া রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া অমার্জ্জনীয় নোংরামি। সেই জন্যই বোধ হয় হাক্স্লি স্থির করিয়াছেন যে তিনি যত জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভারতীয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু হাক্সলি যদি কখনও কোনো ভারতীয় গৃহস্থের গৃহে যাইতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁর এ-বিশ্বাস থাকিত না। ভারত নারীর শুচিতার সহিতও, তিনি নিশ্চয়ই পরিচিত নহেন। তিনি দেখিয়াছেন পাঞ্জাবী রেলমিস্ত্রিদের বস্তি। কিন্তু এখানকার অপরিচ্ছন্নতার জন্যও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী শ্বেতাঙ্গ স্যানিটারি অফিসার।

হাক্স্লি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবাসী পূর্ব্বে আফ্রিকায় পদার্পণ না করিলে, সে দেশের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইত না। মুখ্যতঃ তাহাদের সহায়তায়ই য়ুগাণ্ডা রেলপথ প্রতিষ্ঠা হয়। তবু তিনি ভারতবাসীদের আফ্রিকায় থাকা পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, ইহারা যত শীঘ্র আফ্রিকা ত্যাগ করিবে, ততই মঙ্গল। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার কোনো বিদ্বেষ নাই বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। কিন্তু তবু তিনি ভারতীয়দের আফ্রিকা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিতে চাহেন, কারণ তাঁহার মতে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের

মধ্যে ইহাদের অবস্থিতি আফ্রিকার সমস্যাকে জটিলতর করিতেছে। ইহাতে আমাদের আপত্তি করা বৃথা; যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী তাহার স্বদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব না অর্জ্জন করিবে, ততদিন পূর্ব্ব আফ্রিকার সমস্যার মধ্যে তাহার প্রবেশচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আফ্রিকায় প্রাচ্য সভ্যতার বিস্তৃতি সম্বন্ধে কোনো মতামত শুনা যায়না। সম্প্রতি অধ্যাপক টমসন্ অবশ্য অনুমান করিয়াছেন যে, ভারতে যে পরিমাণে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে অচির ভবিষ্যতে ভারতীয়গণ পূর্ব্ব আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হইবে এবং ক্রমশঃ সে মহাদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ছড়াইয়া যাইবে। হাক্স্লি এই অভিমত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। "আফ্রিকা ভিউ"-তে তিনি কয়েকবার স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতীয় বালক যে সকল পরীক্ষা অবলীলায় অতিক্রম করে, য়ুরোপীয় বালকেরা তাহাতে কেবলি ধাক্কা খাইতে থাকে। কিন্তু ইহার জন্য নাকি ভারতীয় বালকের বুদ্ধি প্রশংসনীয় নহে, দায়ী পরীক্ষা এবং শিক্ষাপদ্ধতি। এরূপ চলিলে বহুসংখ্যক শিক্ষিত কৃষ্ণকায়দের উপরে মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কালে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া তিনি ভয় পাইয়াছেন।

এতক্ষণ হাক্স্লির সহিত মতভেদের কথাই বলিলাম, কিন্তু তাঁহার চারিশত পঞ্চাশ পাতা ব্যাপী আফ্রিকা চিত্রে শিক্ষনীয় বা উপভোগ্য বস্তুর অভাব নাই। আফ্রিকা সম্বন্ধে বহু পুস্তক আজ বাজারে মিলে, এরূপ অন্তর্দৃষ্টি অধিকাংশ গ্রন্থেই বিরল। সাধারণ পর্য্যটকের চক্ষে আফ্রিকার স্বরূপ ধরা পড়েনা। তাঁহারা দেখেন আফ্রিকার প্রকাণ্ড হ্রদসমূহ, শুষ্ক তৃণাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তর, অত্যাশ্চর্য্য পর্ব্বতশ্রেণী, মৌচাকসদৃশ অতি ক্ষুদ্র কুটীরপূর্ণ গ্রামগুলি, জিব্রা ও হরিণের পাল, বর্শাধারী দীর্ঘ কৃষ্ণ উলঙ্গ পুরুষ; চর্ম্মাবৃত, খদিরবরণী হাস্যমুখী রমণীবৃন্দ। কোথাও বা 'সি-সি' মক্ষিকা পরিবৃত বিরাট্ ভূখণ্ড অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে, কোথাও বা ছোট বড় নানাজাতীয় আগ্নেয়গিরি বহ্ন্যুৎপাত করিতেছে, কোথাও হ্রদের জল লবণাক্ত, কোনোস্থান নিরক্ষবৃত্তের সূর্য্যের প্রখর প্রতাপে দগ্ধ। দূরাগত সিংহগর্জ্জন, ঝিঁঝিঁ-পোকার অবিশ্রাম আর্ত্তনাদ, বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সারারাত্রব্যাপী অদ্ভুত নৃত্য-উৎসব, এই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য মানুষের মনে একটা অজানিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মনে হয়, সেখানে প্রকৃতি অসুস্থ, আকাশ বাতাস রোগের দীর্ঘ ছায়ায় আচ্ছন্ন। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে হাক্স্লি ব্যতীত অন্য কেহ পিশাচসিদ্ধি ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ফলিত বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও বর্ত্তমান যুগের রাজনীতি পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারে এরূপ দরদী ও সুস্থ দৃষ্টি প্রসার করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কর্কটের প্রেমনিবেদন, হায়নার কদর্য্যতা প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ বহু বিবরণও তাঁহার পুস্তকখানিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। পশু পক্ষী, লতা পাতা, ফুল ফল, তীরের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহের ফিজিকাল জিওগ্রাফি ইত্যাদিও তাঁহাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার বর্ণনায় ইংরাজী সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হইবে। বইখানির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ হইতেছে স্থানীয় সকল সম্প্রদায়গুলির বিশিষ্ট আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির বিশদ বর্ণনা। এলিমেন্টেটার নিকটে খনন করিয়া পুরাকালের যত দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ তিনি এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বর্ণনায় সেই ইতিহাসহীন মহাদেশ এক অত্যাশ্চর্য্য প্রাক্-ইতিহাসে মণ্ডিত।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

রেখা-চিত্র—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। গুপ্ত ফ্রেণ্ড্স্ এণ্ড্ কোম্পানী, মূল্য দেড় টাকা।

ইতি—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, মূল্য দেড় টাকা।

পুতুল ও প্রতিমা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, মূল্য দেড় টাকা।

বন্ধুবরণ—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, মূল্য দেড় টাকা।

বুদ্ধদেব-বাবুর ভাষার সুন্দর একটি স্বচ্ছন্দতা আছে। যে-কথা তাঁহার বলিবার তাহা বেশ অনায়াসে এবং পরিপূর্ণভাবে বলা হইয়া যায়। লিখনভঙ্গীতে কোথাও আড়ষ্টতা নাই। মীড়গুলি অধিকাংশ কোমলের পর্দ্দায়, কানে বেশ গানের মতো বাজে। বহুকাল পূর্ব্বে মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে কতকটা এইরূপ ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাইতাম, কিন্তু মনে হইতেছে, বুদ্ধদেবের ভাষায় মাধুর্য্যের মসলা-সংযোগ কোথাও কোথাও কিছু বেশী হইয়াছে। "চঞ্চল বাতাসে ক্ষীণ শেফালি-শাখার মতো ঈষৎ শিহরিয়া"—সুন্দর, কিন্তু তারপরেই "তুমি বলিলে, উঃ একটু শীত করছে না?" শুনিবার জন্য মনটা প্রস্তুত থাকে না।

ভাষা এবং সুর লইয়া সুরু করিয়াছি, তাহার কারণ লেখক ঐ-দুটি উপকরণ দিয়াই বেশীর ভাগ ছবি আঁকিয়াছেন। গল্প বলিতে সাধারণতঃ যাহা বোঝায়, এই লেখাগুলিকে ঠিক সে পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। সেদিক্ দিয়া বইটির রেখাচিত্র নামকরণ সার্থক হইয়াছে। প্লটের কাঠামো, চরিত্র-বর্ণনার বর্ণসম্পদ, মানবজীবনের গভীরতর সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা হইতে আহরণ করা আলোছায়ার বৈচিত্র্য, ইহার সমস্ত-কিছুকেই বুদ্ধদেব এই বইখানিতে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। অত্যন্ত হাল্কা হাতে ছবি আঁকিয়াছেন, হৃদয়কে কোথাও স্পর্শ করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই।

কিন্তু যদিও রেখার সাহায্যে আঁকা ছবি, অত্যন্ত ঘন-সন্নিবেশের রেখা। যবনিকা যেখানেই উত্তোলন করিয়াছেন, তুচ্ছতম খুঁটিনাটিটিও প্রকাশের আলোয় পরিপূর্ণ করিয়া ধরা পড়িয়াছে। যেন কেবলমাত্র রেখার ঘন-বিন্যাসের দ্বারাই লেখক আলোছায়ার values গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। যেখানে আহারটা মুখ্য নহে সেখানে যেমন আনুসঙ্গিক উপকরণ অজস্র হইয়া উঠিতে কোনো বাধা থাকে না, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। আসর জমিয়াছে, রস জমে নাই। কোথাও এমন রহস্যময় আব্ছায়া কিছু থাকে নাই যাহাকে আশ্রয় করিয়া মনটা বইয়ের পাতা ছাড়িয়া একমুহূর্ত্ত উদাস হইতে পারে।

এই-ধরণের রেখাচিত্র etching-জাতীয় জিনিস, কিছু মন্দ নহে; কিন্তু সর্ব্বত্র খুব সুবিচারের সঙ্গে এই রচনা-পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় নাই। যেমন "ছায়াচিত্র" গল্পে। একজন প্রেমার্ত্ত যুবক কিছুক্ষণের জন্য ট্রেনে একদল অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে, তারপর নামিয়া গেল। এইটুকু পরিসরের পটভূমিকায় বুদ্ধদেব অনেক খুঁটিনাটির সমাবেশ করিয়াছেন। খুঁটিনাটি হিসাবে সেগুলির মূল্য থাকিত যদি সেই প্রেমার্ত্ত যুবকের কোনো-একটি বিশেষ mood বা দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া সেগুলিকে আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সেই যুবক প্রণয়িনীকে ছাড়িয়া চলিয়াছে, না রেস্ জিতিয়া ফিরিতেছে, তাহা বুঝিবার উপায়

নাই। পড়িতে পড়িতে সহজেই এ প্রশ্ন মনে জাগে, প্রেমে যাহার এমন তন্ময়তা যে নিজেকে গ্রহান্তরবাসী বলিয়া মনে করিতেছে, এমন কি প্রায় চলন্ত ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িয়া প্রেমাস্পদের কাছে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার পক্ষে এতক্ষণ ধরিয়া এমন অব্যাহতভাবে এত খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করা কি সম্ভব? নিজে যে-ট্রনে যাইতেছে সমস্ত পথ সে-ট্রেনের সব-ক'টি মানুষের প্রতিটি কথাবার্ত্তা সে ত অবহিত হইয়া শুনিলই, পাশ দিয়া যে-ট্রেনটি "চক্ষের নিমিষে দৃষ্টির বহির্ভূত" হইয়া গেল তাহারও কোন্ কক্ষে কে বিড়ি ধরাইল, কে ওষুদের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে, কেই বা নভেল পড়িতেছে তাহারও কিছুই তাহার চোখ এড়াইয়া গেল না। এমন কি নভেলটা যে ডিটেক্‌টিভ্ নভেল তাহাও সে লক্ষ্য করিল!

পৃথিবীর যে-সুখদুঃখের সঙ্গে সুগভীর একাত্মতা জন্মিলে অপরকে হাসাইবার এবং কাঁদাইবার ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জ্জন করা যায়, আলোচ্য বইখানি পড়িয়া মনে হইল না সে-সুখদুঃখ লেখককে কোথাও স্পর্শ করিয়াছে। কেবল যে হাসাইতে কাঁদাইতেই তিনি নারাজ তাহাও নহে, দুএকজায়গায় ছাড়া কোনো-একটি বিশেষ moodও তাঁহার লেখাতে কোথাও রূপ ধরিয়া ওঠে নাই। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যে আত্মহত্যার আয়োজন করিতেছে, সেও বেশ নির্ব্বিকারভাবে সব হিসাব খতাইয়া, গুছাইয়া, প্রতিটি খুঁটিনাটি চিন্তা করিয়া, তাহা করিতেছে। করিতে পারে না তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু সে করার মধ্যে কোনো রসের উপাদান নাই।

সমস্ত গল্পগুলির আলাদা করিয়া আলোচনার স্থান নাই। মোটামুটি ভাবে মনে হইল লেখকের আসল যে দৃষ্টি তাহা সহানুভূতির দৃষ্টি নয়, সেইজন্যই তাহা পরিহাসের দৃষ্টিও নয়, তাহা শ্লেষের দৃষ্টি। অধিকাংশ চরিত্র লেখকের শ্লেষের ভাগ পাইবার প্রয়োজনে জন্মলাভ করিয়াছে; কোথাও সে শ্লেষ প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকট: বাকী যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা সুন্দরী তরুণী। এইটুকু বলিলে বইটির মূলনিহিত design যাহা তাহাকে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াই উদ্‌ঘাটিত করা হইয়া যায়। একটি সুন্দরী তরুণী সম্বন্ধে মুগ্ধতা এবং পৃথিবীর বাকী প্রায় সমুদয় মনুষ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞা, এই টানা-পড়েনের সহায়তায় গল্পের জাল বোনা হইয়াছে।

কিন্তু গরীব গোবেচারি কেরাণীদের লইয়া শ্লেষ আর ভালো লাগে না, স্ত্রীজাতিকে লইয়া শ্লেষ ভালো লাগে না। পৃথিবীতে অপরাধের অভাব নাই, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নাই।

সাহিত্যে শ্লেষের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু বহুদর্শিতা না থাকিলে, জীবনের বিচিত্র বহুমুখীনতার তাহার সমস্ত সম্পদ্ এবং নিঃস্বতার সঙ্গে মর্ম্মান্তিক পরিচয়ের যোগ স্থাপিত না হইলে শ্লেষকে রসবস্তু করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। শ্লেষের প্রয়োজনে যে শ্লেষ তাহা stale হইতে বাধ্য, যেমন বুদ্ধদেবের হইয়াছে। অবজ্ঞা প্রকাশ সহানুভূতির শ্যামলতার বুকে জন্মগ্রহণ পাইয়াছে, কিন্তু ভাষায় জোর বাঁধে নাই। করে নাই বলিয়া তাঁহার শ্লেষের হাসি কাগজের ফুলের হাসির মতো নিরর্থক হইয়াছে।

"দুঃখ" গল্পটি এই বইয়ে না ছাপিলেই ভালো হইত। এই গল্পটির treatment আলাদা, যদিও দুঃখবস্তু ইহার মধ্যে কোথাও রূপ ধরে নাই। এষ্টেটের রাণী গভীর

রাত্রিতে তৈল-সহযোগে কেশচর্য্যা করেন এবং এজন্য প্রতি রাত্রিতে একটি বালিকা দ্বাদশীর তলব হয়, কেমন গলাধঃকরণ যায় না। বুড়া দর্জি লটারীতে একশো টাকা জিতিয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া কাঁদিতে চায় কাঁদুক, কিন্তু ছেঁড়া কোটের পকেট হইতে একতাড়া দশটাকার নোট বাহির করিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এটা বাড়াবাড়ি। তদুপরি গ্রন্থকারের narrator বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন, তিনি সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাধা দিতেও চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাধা দিবার সময় পাইলেন না। দশটাকার দশখানা নোট একসঙ্গে বা আলাদা করিয়া টানিয়া ছিঁড়িতে একজন বুড়া দরজির কত সময় লাগিতে পারে লেখক তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। মূক-বধির কন্যার সিক্তবস্ত্রে বাড়ী ফিরিবার লজ্জায় মাথা খুঁড়িয়া কপাল রক্তাক্ত করা অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক। দৈহিক লজ্জার এতখানি বোধ মূক-বধির কন্যার থাকে কি?

"জ্বর" গল্পটিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় পাই, এবং ইহার শেষটুকু সুন্দর একটি মোচড় খাইয়া গল্প হইয়া উঠিয়াছে। "গৃহ" গল্পটিতে কল্পনা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, যদিও করুণ-কল্পনার পাশে পানের পিক্ খাপছাড়া লাগে। এই দুটি গল্প মোটের উপর ভালো লাগিয়াছে। "মেজাজ" নামক গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু সে-সংবাদ বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় না থাকিয়া বইয়ের ভূমিকায় কেন? অনুবাদকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইবার অন্য অসংখ্য উপলক্ষ্য মিলিত।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যে-সব ইংরেজী শব্দ বহুব্যবহারে রূপান্তরিত হইয়া বাংলা বনিয়া গিয়াছে, যেমন ষ্টেশন ষ্টোভ প্রভৃতি, সেগুলিকে স্‌টেশন, স্‌টোভ লিখিয়া কি লাভ হয়? Phonetics-এর দোহাই মানিয়া স্‌টেশন না হয় বুঝিলাম, কিন্তু স্‌টেইট্‌স্‌ম্যান কেন? রেইট্, ট্রেইন্, রেইস্, পেইজ্ যদি চলে, দক্ষিণীদের র‍্যেট্‌চেড (wretched) চলিতেই বা দোষ কি?

অচিন্ত্যকুমার পৃথিবীকে সুখদুঃখের রঙে রাঙাইয়া দেখিয়াছেন, এবং সেরঙ গভীরও বটে। কিন্তু বুঝিতে পারি দুঃখের কালো রঙটার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশি, এবং এজন্য যখন চতুর্দ্দিক্‌কার পরিচিত পৃথিবী হইতে মশলা আহরণ করিয়া তাঁহার কুলায় নাই, অবলীলায় তিনি নিছক কল্পনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। শ্লেষে তাঁহার রুচি নাই, কিন্তু বুদ্ধদেবের শ্লেষের মতো তাঁহারও প্রায় দুঃখের প্রয়োজনেই দুঃখ। রসসৃষ্টির খাতিরেও ইহার একটুখানি relief স্থানে স্থানে থাকা উচিত ছিল।

ইহা স্বীকার করিব, গল্প জমিয়াছে, গ্রন্থকার নিপুণহাতে কাঠামো গড়িয়াছেন। কিন্তু রঙের তুলি যখন বুলাইয়াছেন তখন অধিকাংশক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার সৌকর্য্য রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে এই দোষ হইয়াছে যে, হৃদয়কে অত্যন্ত গভীর করিয়া আলোড়িত করিবার সমস্ত আয়োজন হাতে লইয়াও লেখক হৃদয় স্পর্শ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই পীড়ার্ত্তা বিভাকে তাহার স্বামী বিমল সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতেছে দেখিয়াও মনটা কিছুমাত্র সাড়া দেয় না। ভুলিতে পারা যায় না যে, অচিন্ত্যকুমার গল্প বলিতেছেন। কেরাণীর জীবন নিছক দুঃখের নয়, একথা জোরের সঙ্গে মনে পড়িয়া যায়, যখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিস্‌গুলিকে লেখক অন্ধকূপ, অন্ধকার খুপ্‌রি ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন দেখিতে পাই।

স্ত্রীহত্যার পাতক চিন্তার ক্ষেত্রে কোনও স্বামী কখনও করে না, তাহা না হইতেও পারে। কিন্তু গ্রন্থকারের পরিচিত কাছাকাছি বাহিরের জগতে স্ত্রীহন্তা বিমল নাই :—খুনের চিন্তা যাহারা করে তাহাদের দিয়া এত সহজে যদি খুন করানো যাইত তাহা হইলে পৃথিবীর এই নধর চেহারা থাকিত না। বিমল স্ত্রীকে হত্যা করিল ইহা কেবলমাত্র যে আমাদের ধারণায় আসে না তাহা নহে, গ্রন্থকারের নিজেরও ধারণায় আসে নাই। তাই দেখিতে পাই, জল হইতে বিমল উঠিয়া আসিলে তীরবর্ত্তী সনাতন যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় ?"—বিমল হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল ইহা বলিয়াই তিনি গল্প শেষ করিয়াছেন। সত্যকারের খুনের গল্প এত সহজে শেষ হয় না। সত্যকারের সনাতনরা খুনে-বাবুকে জড়াইয়া ধরে, ডাক-হাঁক করে, জলে ঝাঁপ দেয়। যথারীতি কুরুক্ষেত্র বাধায়।

অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত, এই দুইটি জিনিসের ব্যবহার অচিন্ত্যকুমার প্রায় সর্ব্বত্রই একটু বেশি করিয়াছেন। চারিটি গল্পের দুইটিতে দুইটি ছেলে ছাত হইতে পড়িয়া মারা গেল, দেখিয়া এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় যে জীবনে tragedy-র অভিজ্ঞতার পুঁজি সত্যই অচিন্ত্যকুমারের খুব পর্য্যাপ্ত নয়। Effect সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে জোর করিয়া tragedy গড়িয়াছেন, তাহাতে তত আপত্তি নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র এই effect-এর প্রতি অনুরাগ অনেক স্থলে উগ্র আত্মপরায়ণতার রূপ লইয়াছে। ভাষায় অস্বাভাবিকতা আনিয়াছে। সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই অত্যন্ত ক্লেভার হইয়া উঠিবার চেষ্টায় অচিন্ত্যকুমারের মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইয়া কথা কহিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র pun করে, সুন্দর উপমাবহুল ভাষা প্রয়োগ করে, প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের অনুপ্রাসের প্রতি অনুরক্তি।

নয়ত গল্প কাহাকে বলে লেখক তাহা বোঝেন। সে-পরিচয় তাঁহার শেষ গল্প "ইতি"-তে পাই। যদিও মফঃস্বলের উকিল বগলাবাবু বলেন, "এখানে বনের মশা আছে থাক্, বিলাসের মশাল চাইনে, অভিনয় আমরা চাই বটে কিন্তু অবিনয় নয়", তথাপি এই সমস্ত ছোটখাট মুদ্রাদোষ কাটাইয়া উঠিতে লেখকের বেশি সময় লাগে নাই। সত্যকারের সৃষ্টির তাগিদ্ বেগবান্ নদীস্রোতের মতো তাঁহাকে তাঁহার নিজের কাছ হইতে টানিয়া ছিনাইয়া চিরন্তন রসতীর্থের দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অতি গভীর সহানুভূতি এবং সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি হইতে সরলা-চরিত্র আঁকা হইয়াছে, গোড়ার দিকে দু'একবার চেষ্টা করিয়াও সে অচিন্ত্যকুমারের মতো হইয়া পড়িতে পারে নাই।

ইহাছাড়া অন্যত্রও রস জমিয়াছে। যেখানেই অচিন্ত্যকুমার নিজেকে ভুলিয়াছেন, যেখানেই ভাষার রাশে একটু আল্‌গা দিয়াছেন, যেখানেই চেষ্টা করিয়া সবকিছুকে ক্লেভার করিয়া তুলিবার কথা তাঁহার মনে থাকে নাই, সেখানেই তাঁহার মধ্যেকার দরদী রূপকার ছাড়া পাইয়াছে। কোনো চরিত্রকে যখন উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই অবকাশে তখন সে পরিপূর্ণ মানুষ হইয়াছে। যেমন 'ধন্বন্তরি' গল্পের রমা, 'দিনের পর দিন' গল্পের সুধীর।

ভাষা সম্বন্ধেও ঐ কথা। সবরকম সুরে তাহা বাজে। প্রকাশভঙ্গীর একটি বিশেষ জোর মনকে সর্ব্বদা সজাগ করিয়া রাখে। কিন্তু বিধিদত্ত স্বভাবজ ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিচয় এখানেও পদে পদে। ক্লেশ হয়, ভাবি, একটা তুচ্ছ অনুপ্রাস, তাহার মূল্য এত, যাহার জন্যে উন্মুখ চিন্তাধারার ঘাড় ফিরাইয়া বারম্বার তাহাকে অপথে-বিপথে লইয়া যাইতে হইবে ?

আশা করি এই phase-টা কাটিয়া যাইবে, অচিন্ত্যকুমার একদা এই-সমস্ত তুচ্ছ প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিবেন।

জীবনের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয় সহজ পরিচয়। তাঁহার দৃষ্টি কোনও একদেশদর্শিতার দ্বারা ব্যাহত নহে। জীবনকে তাহার বহুবিচিত্রতায় বিচিত্রভাবে আস্বাদ করিবার ক্ষমতা এবং সাধনা এই লেখকের আছে বলিয়া মনে হইল। বিষয়-নির্ব্বাচনের বৈচিত্র্যে, পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র সমাবেশে, ইহার পরিচয় পাই। লেখকের দৃষ্টি আন্তরিকতার দৃষ্টি বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সহজেই স্বতন্ত্র সত্তা অর্জ্জন করিয়াছে।

বর্ণনায় অতিশয়তা নাই, ভাষা নিরাড়ম্বর কিন্তু নির্দ্দোষ। সেই কারণে তাঁহার লেখা সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। রসবোধকে বৃথা প্রলোভনে বিপথেও লইয়া যায় না, তার ন্যায্য পাওনা হইতে তাহাকে বঞ্চিতও করে না।

যে-রঙ দিয়া তিনি ছবি আঁকেন তাহা জীবনেরই রঙ, জীবন্ত। তাই তাঁহার গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয় সত্যই সাগরসঙ্গমে চলিয়াছি। প্রকাণ্ড জরাজীর্ণ রহস্য-সমাকুল সাতমহলা বাড়ীটাকে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। অখিলের সঙ্গে তাহার মেসের বাড়ীটাতে কবে যেন থাকিয়া আসিয়াছি, রাঁধুনী বামুনটার নামটাই কেবল মনে নাই। 'পোণাঘাট পেরিয়ে' ছোট গল্প, কিন্তু চরিত্রসংখ্যা বহু। আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে ঐটুকু পরিসরের মধ্যে সব-ক'টি চরিত্রকে তিনি সমগ্রতা দান করিয়াছেন।

জীবনকে অন্তরঙ্গতার রূপ দিতে প্রেমেন্দ্রবাবুকে সব-চেয়ে বেশী সাহায্য করে তাঁহার dialogues। যাহার মুখে যেমন কথাটি মানায় ঠিক তেমনটি আরোপ করিবার ক্ষমতায় প্রেমেন্দ্রবাবুর সমকক্ষ লেখক খুব বেশি নাই। ব্যারিষ্টার সুবিকাশ হইতে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান জীয়ুৎ পর্য্যন্ত সকলের বাক্যালাপ ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তাহাই। একেবারে নিখুঁৎ সুন্দর।

কিন্তু এত সত্যনিষ্ঠা সত্ত্বেও লেখক অপ্রাকৃতের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্লট গড়িতে হইয়াছে, যেখানে নিজে হইতে জোড় লাগে নাই বা জোড় দিতে পারেন নাই, সেখানে প্রায় অবলীলায় অস্বাভাবিকতার শরণ লইয়াছেন। "সাগর-সঙ্গমে"র মতো এত সুন্দর গল্পের সমস্ত ভিত্তিটাই কাঁচা। দাক্ষায়ণীর মতো মানুষ, যত বড় ডাকসাইটে তেজী এবং নিষ্ঠাবতীই হউক, আটবছরের মেয়ে বাতাসীকে অজ্ঞাতকুলশীলা এবং অস্পৃশ্যা বলিয়া নদীবক্ষে তাহার শেষ আশ্রয় হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারে না। গল্পটির ভবিষ্যৎ পরিণতির দিক্ দিয়া এই ধরণের অপরাধের হয়ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহা হইলে অপরাধকারিণীকে পূর্ব্ব হইতেই অন্য ধাতুতে গড়িয়া তোলা উচিত ছিল। "হয়ত" গল্পে কল্পনা ছাড়া পাইয়াছে, প্রতিপদে ঔৎসুক্য জাগায়, বেশ একটি নূতন ধরণ, কিন্তু যে-ঘটনায় কল্পনার নিষিদ্ধ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল সেইটাই অত্যন্ত বেশি খাপছাড়া কাল্পনিক হওয়াতে contrast মারা পড়িয়াছে। লাবণ্য ঝড়ের রাত্রে নদীর উপরকার পুল হইতে পড়িয়া গিয়াও পড়িল না, প্রথমতঃ তাহার শাড়ীর প্রান্ত আটকাইল একটা বল্টুতে, তারপর সে নিজে আটকাইল তাহার শাড়ীতে। শাড়ীটা সে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিল পাছে কেহ তাহা মনে করে, এজন্য বলা হইয়াছে, সে নিম্নমুখ হইয়া ঝুলিতেছিল। অনেক চেষ্টা করিলে, অনেক যুক্তিতর্ক ব্যয় করিলে এরূপ একটা ঘটনার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করা যে যায় না তাহা নহে, কিন্তু

গল্প করিতে বসিয়া তর্কের অবকাশ দিলে রসভঙ্গ হয়। "সংক্রান্তি" গল্পে মেস ভালো লাগিয়াছে; কিন্তু অখিলের কথা যতটুকু পাই তাহাতে মনে হয়, পাশের বাড়ীর একটি অপরিচিতা মেয়ের দিকে একবার মাত্র তাকানোর অপরাধ জানাজানি হওয়ার ভয়ে সে আফিং সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিল। "দিবাস্বপ্ন" গল্পে ব্যারিষ্টার সুবিকাশ বাড়ীর ঝির গাল টিপিতেছে।—কালা বাঙালীর দেশে ইহা নানাকারণে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, প্রেমেন্দ্রবাবু ব্যারিষ্টার আঁকিতে গিয়া মুহূর্ত্তের ভুলে খাসবিলাতী এরিষ্টক্র্যাট আঁকিয়া ফেলিয়াছেন, অন্ততঃ ঝিটি বিলাতের আমদানী। প্রিসিলার দোষের মধ্যে সে বলিয়াছিল, "আমাদের পৃথিবীতে সবুজের বদলে বিধাতা অন্য একটা রঙ choice কর্‌লে কি বিপদ্ হত বল ত?" ইহাকে রমেশের মনে হইল নিছক ন্যাকামী। বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী অনুপমাকে ভাঁড়ারের পাশে ডিবিয়ার আলোয় কয়লা ভাঙিতে দেখিয়া তাহার যখন মনে হইল, এইত চিরন্তনী নারী, তখন তাহা ন্যাকামী হইল না। হয়ত হয় নাই, কিন্তু তাহার এই তুলনামূলক সিদ্ধান্তটা কেমন যেন নিজের জোরে দাঁড়ায় নাই, প্রেমেন্দ্রবাবু তাহাকে কথার বুকনির ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।

কিন্তু সব জড়াইয়া বইখানি সুখপাঠ্য। সুস্থ সুন্দর রচনা।

বধূবরণ বইখানি ভালো হইয়াছে। ছোট-খাট চিন্তা, ছোট-খাট সুখদুঃখ, ছোট-খাট কথা, কিন্তু উপলব্ধির একটি অপরিমেয়ত্ব হইতে গল্পগুলির জন্ম হইয়াছে।

জীবনের সঙ্গে গ্রন্থকারের যতটুকু পরিচয় তাহা নিগূঢ় ঐকান্তিক পরিচয়, সেইসঙ্গে সত্যকারের রসবোধ এবং রূপদৃষ্টি তাঁহার স্বভাবজ। এ-সমস্তই এই বইটিতে একটি আশ্চর্য্য সংযমের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকাশের এই সংযম, এই সমাহিত ভঙ্গী, গভীর শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

কোথাও অবান্তর একটি কথা বলা হয় নাই, অবান্তর একটি ঘটনার বিন্যাস করা হয় নাই; সব মিলিয়া কড়া পাকের সন্দেশের মতো জমজমাট। একটি কথার ইঙ্গিত কতখানি যে বলিবার ক্ষমতা রাখে, শৈলজানন্দের লেখায় বারম্বার তাহার পরিচয় পাইতেছি। সৃষ্টির মধ্যে শৈলজানন্দের আত্মবিস্মৃতি পরিপূর্ণ; নিজের রসের ভিয়ানের গভীর তলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া থাকিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। একটু মাথা তুলিয়া কবিত্ব করিবার অবকাশও তাঁহার নাই, আসর জমাইয়া বক্তৃতা করা ত দূরের কথা।

প্রত্যেকটি চরিত্র পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তাহাদের পরস্পরের ভাষা কেবল নয়, পরস্পরের চিন্তাধারা, পরস্পরের উপলব্ধি পরস্পর হইতে আলাদা। "চক্ষুদান" গল্পে বিপিনের চরিত্র ওস্তাদ কারিগরের সৃষ্টি।

ঘটনা-বিন্যাসের কারিকুরি নাই, কিন্তু ছোট গল্পের প্রাণ স্বরূপ যে প্লট তাহাকে লেখক কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। "ভঙ্গুর" ভিন্ন বাকী গল্পগুলি নিছক গল্প হিসাবেও জমিয়াছে।

"বধূবরণ" গল্পটি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিবার মতো, আগাগোড়া entertaining। ভালোমন্দ, সাধারণ-অসাধারণ সমস্ত চরিত্রগুলি পরিচয়মাত্রে মনোহরণ করে। কিন্তু সুরুতে এবং শেষে রসের balance থাকে নাই। গোড়ার দিকে এত বেশী sex appeal-এর উপর নির্ভর করার দরুণ, শেষের দিক্‌টা ফিকা হইয়া গিয়াছে।

ননীমাধবের সুদূর কৈশোর-জীবনের পাপ অলক্ষ্যে তাহার জন্য গৌরীর স্নেহলোক হইতে নির্ব্বাসনের শাস্তি বহন করিয়া আনিল, এই theme-টি চমৎকার। কিন্তু jealousy-র যতটা কারণ ঘটিয়াছিল তাহাতে গৌরীর প্রতি তাহার শেষ নিষ্ঠুরতাটা খুব সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গোড়া হইতে তাহাকে যেভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, তারপর দীর্ঘদিনের অপরিচয়ের অবকাশে যতটা পরিবর্ত্তন-সম্ভাবনার স্থান হয় তাহাতেও এই নিষ্ঠুরতাকে মনটা গ্রহণ করে না। চলন্ত ট্রেনে চুরি করিয়া যে হাত পাকাইয়াছে, শ্বশুরালয় হইতে স্ত্রীর গহনার বাক্স লইয়া বেমালুম উবিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইত না, সুতরাং ননীমাধবকে দিয়া চুরি করানোটা গ্রন্থকারের আসল উদ্দেশ্য নয় তাহা বুঝি, যদিও চুরি না করিয়া চলিয়া গেলেও চরিত্র-চিত্রণে ভুল হইত। বারম্বার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গৌরীকে তাহার স্বদেশের কাছাকাছি কোথাও ছাড়িয়া না গিয়া, দূরদেশে প্রায় জনহীন নৈশ প্রান্তরে সে যে পরিত্যাগ করিয়া গেল, ইহাতেই কি তাহার চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে? এমন অকারণ নির্ম্মমতা যে করিতে পারে, কৃতকর্ম্মের জন্য এত শীঘ্র কি আবার তার অনুশোচনা জাগে? আমার মনে হয়, পথে-পরিত্যাগের অধ্যায়টিকে ঔৎসুক্য জাগাইয়া রাখিবার লোভে গ্রন্থকার টানিয়া বুনিয়াছেন। তাঁহার মতো শক্তিমানের পক্ষে এ লোভ অনাবশ্যক এবং অশোভন।

"অতি ঘরন্তী না পায় ঘর" গল্পটিরও মাঝের দিক্‌টা কেমন এলাইয়া গিয়াছে। পুতুল লইয়া সুষমার বাড়াবাড়িটা একটু অত্যধিক হয় নাই কি? ধরিলাম না-হয় তাহার মাথা সত্যসত্যই এতটা খারাপ হইয়াছিল যে, দিনের পর দিন পুতুলকে খোকা কল্পনা করিয়া, তাহা লইয়া অনর্গল কথা বলিয়া তাহার চলিত। কিন্তু প্রকৃতিস্থ কোনও স্বামী সে-অবস্থায় তাহার পাগ্‌লামির এতটা প্রশ্রয় দিত না। অন্ততঃ এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক হইলেও অবস্থাটাকে অত্যধিক করুণ করিবার জন্য এতখানি ফলাও করা কর্ত্তব্য হয় নাই, ইহাতে রসের দানা বাঁধিতে বাঁধতে ছাড়িয়া গিয়াছে। শেষের দিকে সুষমা আত্ম-ঘাতিনী হইলে জানা গেল তাহার সঙ্গে আরও একটি প্রাণীর অনারব্ধ জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। এই অবধি হইয়া থামিলে কোনো গোল ছিল না, কিন্তু কি অশুভ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া শৈলজানন্দ সেই হতভাগ্যের পশ্চাতে একছত্র একটা বর্ণনা জুড়িয়া দিয়াছেন। রসশাস্ত্রের বিধানে বীভৎসতাও রস, সেকথা না-হয় না-ই তুলিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমানার বাহিরে ঐটুকু পা বাড়াইবার ফল কি যে ভীষণ মারাত্মক হইয়াছে, লেখক তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। বর্ণনা হইতে মনে হয়, বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ যে কাটিয়া গিয়াছে ইহা উপলব্ধি করিবার প্রচুর অবকাশ সুষমার জুটিয়াছিল, এবং ফলে এত সুন্দর গল্পটির ভিত্তির মাটিই খসিয়া যায়, যাহা কিছু লইয়া হৃদয়ের শিরায় টান পড়িতেছিল তাহার কিছুরই আর কোনো অর্থ থাকে না।

"চক্ষুদান" গল্পে বিপিন লাথি মারিয়া প্রতিমা ভাঙিতেছে, ইহা অসম্ভব কেবল নয়, অকল্পনীয়। দেব-বিগ্রহ সম্বন্ধে হিন্দুর বহু পুরুষ-পরম্পরায় অর্জ্জিত ভয়-ভক্তির সংস্কার পা তুলিবার কথাই তাহাকে মনে পড়িতে দিত না, হাত তুলিতেও দিত কিনা সন্দেহ। এই একটুখানি দোষ বাদ দিলে গল্পটি আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য। "মৃত্যুভয়" এবং "জনি ও টনি" দুটি গল্পই নিখুঁত নিটোল রসসৃষ্টি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

Parade of the Living—J. H. Bradley, (Routledge).

উর্নিশ শ' খৃষ্টাব্দের আরম্ভে ইউরোপে যখন যন্ত্রশিল্পের রাজ্য সুরু হয় ও সেখানকার লোকেরা পৃথিবীর অন্য জাতিদের জয় করিয়া নিজেদের সাচ্ছল্য বাড়াইবার ব্যবস্থা করেন, তখন স্বভাবতঃই তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের জাতি সেদিন যেখানে পৌছিয়াছিল, পূর্ব্বে কখনও কেহ সেখানে যাইতে পারে নাই, এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাদের এ শ্রেষ্ঠতা অটুট থাকিবে। এ মনোভাবের ছাপ, ঐ আমলের বিজ্ঞানের কল্পনা-জল্পনাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একশত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, এবং বিজ্ঞানের পুরাতন যুগের অবসান ও নূতন উষার সন্ধিক্ষণে চিন্তার অবসর পাইয়া, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা ও জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠতার অনিত্যতা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছেন। জীবরাজ্যে নিজেদের জাতির ও সভ্যতার উচ্চ স্থানসম্বন্ধে শেষপর্য্যন্ত যে অভিমান অবশিষ্ট ছিল, বিগত মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে নিজেদের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া, পশ্চিম-ইউরোপের জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকের মনে তাহা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। ফলে তাঁহারা জীবনের নিত্য স্রোতে মানুষের স্থান ও তাহার ভবিষ্যৎ এ-সম্বন্ধে, নূতন করিয়া, বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেন। অধ্যাপক ব্রাড্‌লির লেখা বইখানি এইরূপ সঙ্কল্পের ফলেই রচিত হইয়াছে।

কোন সুদূর যুগে, বিমানবিহারিণী কাহার আকর্ষণে সূর্য্যদেব বিশাল বাহু মেলিয়া আকাশরাজ্যে সৃষ্টির অগ্নিময়ধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন :—তাহার পর খণ্ডগ্রহের সংঘাত ও মিলনে কি করিয়া পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটিল ; ও ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি আমাদের জ্ঞাতরূপে ধরিত্রীবক্ষে স্ফুরিত হইল,—শাস্ত্রকার মহাশয় প্রথমে তাহারই কাহিনী দিয়াছেন ; ও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য কোন্ যোগসূত্রে গাঁথা, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মানুষ আহার ও জীবনধারণ করে, আশপাশের জীব ও উদ্ভিদের খরচায় ; প্রাণীমাত্রেই নিজেকে রক্ষা করে, অন্যকে গ্রাস করিয়া। দীপের আলোক উজ্জ্বল হয় ও জ্বলিতে থাকে, আশপাশের হাওয়া হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া। জীব ও উদ্ভিদের অণু (cell) গুলি বড় হয়, বিশেষ বিশেষ রূপ ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া। কোনো কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, এইসকল রূপের ও ক্রিয়ার হুবহু নকল দেখা যায়। অতএব চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিককে ভাবিতেই হয়, তাহা হইলে জীব ও জড়ের পার্থক্য কোথায় ? সে সীমারেখা প্রগতির পথে কোথায়ও টানা যায় কি ? পৃথিবীর প্রাচীন শিলালিপি পাঠ করিবার প্রয়াসে এমনই আরও অনেক কথা মনে উঠিতে থাকে ; ও কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। বহু শিল্পীর বহু যত্নফলে বহু ফলকের অনেক অংশই উদ্ধৃত হইয়াছে বটে ; কিন্তু যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ফিরিয়া পাইবার নয়, তাহার পরিমাণ অনেক বেশি। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক ব্রাড্‌লি দিয়াছেন ; অন্যত্র পথ নির্দ্দেশ করিয়া গত্যন্তর নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

* * * * *

দুর্ব্বলচিত্ত, মেরুদণ্ডহীন-অপবাদগ্রস্ত লোকে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পায় না ; কিন্তু বিশকোটী বৎসর পূর্ব্বে মেরুদণ্ডহীন ত্রিলম্বীই (trilobite) ছিল সাগরের সম্রাট

অস্থিসম্বলিত দেহসম্পন্ন জীব তখনও জন্মায় নাই ; এবং যখন জন্মাইল, তখন তাহারা সম্ভবতঃ ভয়ে ভয়ে পরাক্রান্ত অস্থিশূন্য জীবেদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া কোনোরূপে নিজেদের বংশরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এমন একদিন আসিল, যখন সে-আমলের ছোট লোকেরাই সাগর জয় করিল, ও পরিশেষে স্থলচরের সৃষ্টি সম্ভব হইল।

জলচর হইতে স্থলচর, ও জল ও স্থল উভয়চর কি করিয়া উৎপন্ন হইল ; তাহাদের কোন্ বংশ কিরূপে অতিকায় হইয়া পৃথিবীর বিভিন্নযুগে সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল ; ও পরিশেষে, নূতনের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া কালের স্রোতে লুপ্ত হইয়া গেল—এই ইতিহাস পড়িতে পড়িতে বারবারই দেখা যায় যে, আয়েস ও আরামে কেহ বড় হয় নাই। ঝঞ্ঝা ও মৃত্যুর ভিতর দিয়াই নূতনের সৃষ্টি হইয়াছে ; ও যখনই জীব সাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিত্য মনে করিয়া, তাহার সহিত নিজের দেহ ও জীবনের স্থায়ী ও ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, তখনই রুদ্র প্রলয়ে সে-মিলন ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে। শুধু তাহারাই যুগে যুগে বাঁচিতে পারিয়াছে, যাহারা নিত্য দুঃখের মধ্যে থাকিয়া দুঃখকেই বরণ করিয়া লইয়াছে ; কোনও আশ্রয়বিশেষকে সর্ব্বস্ব করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করে নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া বাঁচিবার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম পরিত্যাগ করে নাই।

এমনই কোনও ধারাবাহিক বংশানুক্রমে উৎপন্ন অর্দ্ধ মানব এসিয়ার মরুরাজ্যে আসিয়া বৃক্ষগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, মানুষ হইবার পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছিল। পৃথিবীর রাজত্ব ছিল তখন নখদন্তী হিংস্র জীবেদের। অস্ত্র হিসাবে, ইহাদের তুলনায় অর্দ্ধ মানবের কিছুই ছিল না ; আত্মরক্ষার উপায় ছিল, শুধু বুদ্ধিবৃত্তির আধারে। তাহারই সাহায্যে মানুষ আজ পৃথিবী জয় করিয়াছে। কিন্তু এ রাজ্য কতকালের জন্য, তাহা ভাবিবার বিষয়। মানব অধিকারের যে-যুগে যখনই যে-জাতি বড় হইয়াছে, তাহারা মনে করিয়াছে, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বুঝি তাহারাই ; অন্য কেহ কখনও তাহাদের সমকক্ষ হয় নাই, ও হইবে না। তাহাদের সাম্রাজ্য অক্ষয় হইবে।

আজিকার মানুষও এই কথাই ভাবিয়া থাকে। কিন্তু সে ভুলিয়া যায় যে, তাহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের বেশীর ভাগই তাহার পূর্ব্বতন জনকদের পুরাতন সংস্কার হইতে প্রসূত। তাহার মেরুদণ্ডের, স্নায়ুগ্রন্থির ও মগজের বেশার ভাগ অংশই, বহুকোটী বৎসর ধরিয়া প্রাচীন জীবের প্রাচীন স্নায়ুযন্ত্রে ধাপের পর ধাপ উঠিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিম যুগের আদিম ভাব তাহার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে।

তাই বলিয়া প্রকৃতই কি মানুষ ও পশুতে কোনও প্রভেদ নাই ? পশুর মত বাস্তবিক, আমরাও আহার সংগ্রহ করিবার জন্য অপরকে ও পরস্পরকে ধ্বংস করি ; দেহ পূর্ণ হইলে আমরাও যৌবনের আহ্বানে তাহাদেরই মত মিলনের সাড়া দিতে উদ্যত হই ; ভবিষ্যতে কি হইবে বিশেষ ভাবি না—। কিন্তু পার্থক্য এইখানেই ; ভবিষ্যতের কথা কিছু কিছু ভাবিতে আমরা শিখিয়াছি।

সত্য বটে, এ চিন্তা যাহারা করে ; অযথা বংশবৃদ্ধির বিপদ যাহারা নিবারণ করিতে চায় ; স্বজাতীয়ের অকালমরণ ও শক্তির অপচয় বন্ধ করিবার কথা যাহারা ভাবে, সংখ্যায় তাহারা অল্প। কিন্তু ইহারাই একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে বলিয়া আশা রাখিবার কারণ, যথেষ্ট না হইলেও, আছে। সভ্যদেশমাত্রেই মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, ও শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রচার সেই ভবিষ্যতেরই পূর্ব্বাভাস দিয়া থাকে।

কিন্তু সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের মূল প্রকৃতি কি পরিমাণে পরিবর্তিত হয়? অধ্যাপক মহাশয় মনে করেন যে, যতদিন মানুষের দেহে, দৈহিক মিলনের আনন্দকামনার রাজ্য অটুট রহিবে, ততদিন মানুষ তাহার জ্ঞানবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অভিসারের পথে চলিবে না। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিলে কামনার স্রোত নিতান্তই প্রাচীন পথে দেহের দ্বারে ঢালিয়া না দিয়া, অন্তরে রসসৃষ্টির পথে প্রেরণ করিতে পারে। মানুষের ভবিষ্যতের ভরসা সেইখানেই। যতদিন না সেই সুদূর ভবিষ্যৎ আসিয়া পৌছায়, —যখন বেশীর ভাগ মানুষ এই পথে চলিবে—ততদিন আমাদিগকে সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ সম্বল করিয়া, নিজের ও পরস্পরের হাতে ধ্বংস হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই অধ্যাপক ব্রাড্‌লীর শেষ কথা।

যৌনমিলনের আনন্দই সৃষ্টির আনন্দ। নব জীব সৃজন না করিয়া আমরা আনন্দের সন্ধানে, চিরপুরাতন পথে যদি শুধু দৈহিক অপচয়ই করি; নূতনের উদ্দেশে যদি সৃষ্টির ধারা ভিন্ন পথে প্রেরণ না করি; তাহা হইলে আমাদের শক্তি কোনও দিন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। যে জাতি বা জীবশ্রেণী এ বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিয়া পূর্ণতা অর্জ্জন করিবে, তাহারা যে আমাদিগকে প্রগতির পথে পিছনে ফেলিয়া ভবিষ্যতের রাজটীকা লাভ করিবে, একথা নিঃসন্দেহ। সে পূর্ণতা অর্জ্জন করিতে হইলে মানুষকে তাহার সৃষ্টি-শক্তির ও বুদ্ধির সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়সাধ্য কর্ম্মের সংযোগ সাধন করিতে হইবে; তবেই তাহার সমস্ত অঙ্গের প্রকৃত সমন্বয় ঘটিবে, ও নবীন সৃষ্টির পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে। তাহা হইলে অসামঞ্জস্য ও প্রাচীনতার বার্দ্ধক্যহেতু অন্য জীবের ন্যায়, মানবজাতির মৃত্যু হইবে না। এ সর্ব্বাঙ্গযোগ মানুষের শক্তির মধ্যেই: এ বিষয় লইয়া যুগে যুগে, কেহ না কেহ সাধনা করিয়াছে; ও নিজের উক্তিতে ও জীবনে ইহার সার্থকতার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু অন্য জীবের ন্যায় মানুষ আয়েসপ্রিয়; বহু পরিশ্রম ও সাধনা করিয়া অন্তরে নিত্য আনন্দলাভের অপেক্ষা, জ্ঞাত, সহজপ্রাপ্য, ক্ষণিক তৃপ্তিকেই বড় করিয়া দেখে। ভুলিয়া যায়, যে সে-আনন্দের পথের সীমায় নূতনের সন্ধান পাওয়া যায় না; ও নবীনতার সৃষ্টি না হইলে, জীবনের অবসান কেহ রোধ করিতে পারে না। অতএব সুখই যদি ভবিষ্যৎ মানুষের একমাত্র কাম্য হয়; বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ও অতিকায় উৎকর্ষ শুধু সেই দিকেই ঘটে; মানুষ ও মানুষের এবং জীব ও মানুষের দ্বন্দ্ব যদি কেবল বাড়িয়াই যায়; মানুষ যদি বিশ্বসৃষ্টির যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াও, নিজেকে তাহাতে যুক্ত করিতে না চায়; শুধু আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে চলিতে থাকে; তাহা হইলে মানুষের সাম্রাজ্য একদিন শেষ হইয়া সুদূর ভবিষ্যতে অন্য কোনও জাতির প্রত্নতত্ত্ববিদের কৌতূহল তৃপ্ত করিবে মাত্র। এ মরণ হইতে রক্ষার পথ,—কামান, গোলা, বন্দুক, সঙ্গীন, অথবা তীব্র গতিশীল ব্যোমযান নহে; সংসারের বিপদরাশি হইতে পলায়ন করিয়া নিভৃত বিহারও নহে। পৃথিবীর অতীত যুগে বহু জাতিই এই দুই পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বিশাল কলেবর সম্রাট টিরানোসোরাস ও জাইগাণ্টোসোরাস, বর্ম্মাবৃত এক্কাইলো-সোরাস ও ট্রিকেরাটপ্‌স্, ও অনুরূপ জলচর ও খেচররাজেরা বহুকাল হইতে শুধু কঙ্কাল সাক্ষ্যই রাখিয়াছে। আমাদের ভাগেও এই পরিণাম ঘটিবে কি না, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ পথের উপরেই নির্ভর করে।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নানা চর্চ্চা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, প্রকাশক কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা, দাম দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এ বইয়ে তাঁর লিখিত চোদ্দটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। প্রবন্ধগুলির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই কতকটা পরিচিত ছিলেন। তাঁরা এখন এ প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে একসঙ্গে পেয়ে এ'দের ভিতর যে যোগাযোগ আছে তা' আরও স্পষ্টভাবে ধরতে পারবেন। প্রমথবাবুর উৎসুক দৃষ্টি যে কত বিভিন্ন বিষয়ে নিবদ্ধ হয় তা'ও বুঝতে পারবেন।

এ বইয়ে এত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে তা'র একত্র সমালোচনা করা শক্ত। প্রথম দু'টী ও শেষের পাঁচটী বাদ দিলে বাকীগুলি সবই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। সেগুলি আবার কোন বিশেষ যুগের ইতিহাস নয়, তা'দের ভিতর ভারতের ইতিহাসের প্রায় সব যুগের কথাই কিছু না কিছু আছে। প্রাচীন যুগ অবলম্বনে তিনটী প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে। প্রথমটী "মহাভারত ও গীতা"। এ প্রবন্ধে প্রমথবাবু গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কিনা তাই বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তা'র পূর্ব্বে তিনি আলোচনা করেছেন সম্পূর্ণ মহাভারত এক হাতের রচনা কিনা। গীতা প্রক্ষিপ্ত কিনা সে সমস্যার সমাধান এ প্রবন্ধে না করা হ'লেও মহাভারত এক হাতের রচনা কিনা সে প্রশ্নের উত্তর প্রমথবাবু দিয়েছেন। সে উত্তর বেশি সহজ ব'লে আমাদের মনঃপূত না হ'লেও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, মহাভারত গোড়ায় ছিল কাব্য, আর নীলকণ্ঠের নজীর তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে, সে কাব্যের নাম ছিল জয়কাব্য। "এ কাব্যে ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথা। সুতরাং যুদ্ধজয়ের পরবর্ত্তী কোন বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা এতে ছিল না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে, মহাভারত হচ্ছে যুদ্ধপ্রধান গ্রন্থ, এবং ও কাব্যের প্রধান বিষয় যা, তা' শেষ হয়েছে সৌপ্তিক পর্ব্বে।" প্রমথবাবুর মতে স্ত্রীপর্ব্বকেও আদি মহাভারতের অঙ্গীভূত ব'লে স্বীকার করা যায়; কারণ "গান্ধারীর বিলাপ না থাক্‌লে ভারতকাব্যের অঙ্গহানি হয়।" "কাব্যকে আমরা ফুল বলি, আদিপর্ব্বে আছে যে, মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিকপর্ব্ব হচ্ছে—প্রসূন, আর শান্তিপর্ব্ব—মহাফল। ফুল যখন ফলে পরিণত হয় তখন তা' কাব্যের বহির্ভূত হ'য়ে পড়ে।" এই হিসাবেই প্রমথবাবু মনে করেন যে, শান্তিপর্ব্ব থেকে সুরু ক'রে বাকী মহাভারত আদি ভারতকাব্যের বহির্ভূত, আদিপর্ব্বও তাই। কারণ এগুলি ভারতকাব্যের ক্রম পর্য্যায়ে পড়ে না। মহাভারত যে এক হাতের রচনা একথা বেশিরভাগ পণ্ডিতেরাই বলেন না, আর তাঁদের কেহ কেহ মনে করেন যে, বিভিন্ন যুগে রচিত ভারত ও মহাভারত নামক দুই কাব্যের মিশ্রণে মহাভারতের উৎপত্তি। আদি ভারতকাব্য কি ছিল তা' নির্দ্ধারণ করবার জন্য নানা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে কেহই পৌঁছুতে পারেন নি। এ অবস্থায় প্রমথবাবুও একটী নূতন মত প্রকাশ ক'রে কিছু অন্যায় করেন নি। আদি ভারত যে কাব্য ছিল সে বিষয়ে সকলেই একমত। তবে প্রমথবাবুর মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠ্‌তে পারে সেই ভারতকাব্যের রূপ নিয়ে। পাণ্ডবদের যদি সে ভারতকাব্যের প্রধান নায়ক ধ'রে নেওয়া যায় তবে সে কাব্যের পরিসমাপ্তি যুদ্ধজয়ে কেন স্বর্গারোহণেও ধরা যেতে পারে।

প্রাচীনযুগ অবলম্বন করে প্রমথবাবুর আর দু'টী প্রবন্ধ হচ্ছে "বৌদ্ধধর্ম্ম" ও

"হর্ষ চরিত"। 'বৌদ্ধধর্ম্ম' প্রবন্ধ প্রথমে ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে প্রমথবাবু সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সাম্‌নে ধ'রে দিয়েছেন ও সে ধর্ম্ম ভারতের সভ্যতার ইতিহাসে কোন স্থান অধিকার করে তা' আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। "মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে উক্ত ধর্ম্মের রূপান্তর বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব। আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যু হয় নি। ও-ধর্ম্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ ক'রে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে—জ্ঞানের ধর্ম্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়েছে।" প্রমথবাবুর এ কথা যে আনুবর্ণিকভাবে সত্য তা'তে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা গভীরভাবে করলেই এ সত্য উপলব্ধি করা যায়। 'হর্ষচরিত' প্রবন্ধে প্রমথবাবু বাণভট্টের গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে সরস ভাষায় আমাদের হর্ষচরিত শুনিয়েছেন, ও সেই সঙ্গে রাধাকুমুদবাবুর প্রণীত "হর্ষ" শীর্ষক গ্রন্থেরও সমালোচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধের আর দু'টি প্রবন্ধ হচ্ছে মুসলমান যুগ অবলম্বনে। একটি প্রবন্ধে প্রমথবাবু পাঠান রাজকুমার বিজুলী খাঁর ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করেছেন ও অন্যটীতে আকবরের সভাসদ বীরবল সম্বন্ধে স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের লিখিত কতকগুলি মিথ্যাবাদ খণ্ডন করেছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পাঠান রাজকুমার বিজুলী খাঁর দেখা হয়। এ কথা চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায়। তিনি জাতিতে ছিলেন মুসলমান পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রমথবাবু দেখিয়েছেন যে, বিজুলী খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি,—তিনি কালীঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র। পরে কালীঞ্জর তিনি রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রী ক'রে চলে যান, খুব সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে। এ ঘটনা ঘটে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পর। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় খুব সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। 'বীরবল' প্রবন্ধে প্রমথবাবু দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, বীরবল আকবরের সভায় সুরসিক সভাসদ ছিলেন, শুধু এই পরিচয় দিলেই চলে না—তিনি একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক ও সত্যপ্রিয়। তাঁর প্রভাবেই যে আকবর এক নূতন ধর্ম্মস্থাপনে যত্নবান হ'ন্ এ কথা বীরবলের শত্রুপক্ষও স্বীকার ক'রে গিয়েছেন।

সমালোচনায় সব প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বইয়ের প্রথম দু'টী প্রবন্ধের কিছু পরিচয় না দিলে এ সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রমথবাবু অনু-হিন্দুস্থান বা যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপের কথা বলেছেন। রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে ঐ সব দ্বীপ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব উদ্ধার ক'রে তা'দের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের যোগাযোগ দেখিয়েছেন। বলীদ্বীপে এখনও যে হিন্দু সভ্যতা জীবন্ত রয়েছে তা'র খোঁজ আমাদের দেশের কম লোকেই রাখেন। প্রথম প্রবন্ধটী হচ্ছে "ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি" নিয়ে লেখা। এখনও বাংলা ভাষায় সত্যকার জিও-গ্রাফি লিখিত হয় নাই। যে সব পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলি শিশুদের মনে কৌতূহল উদ্দীপন না ক'রে বরং মুখস্থ করতেই প্রণোদিত করে। বাংলা ভাষায় শিশুপাঠ্য জিওগ্রাফি কিভাবে লেখা উচিত প্রমথবাবু তা'র একটি সরস নমুনা দিয়েছেন।

এ সব প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কারণ প্রমথবাবুর ষ্টাইলের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা সকলেই পরিচিত। বিষয় অবতারণা হিসাবে প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ; ও সেগুলিকে পুস্তকাকারে পেয়ে সকলেই যে উপকৃত হবেন তা' বলাই বাহুল্য।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

The Universe in the Light of Modern Physics—MAX PLANK, George Allen & Unwin Ltd.

The New Conceptions of Matter—C. G. DARWIN, G. Bell & Sons.

গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে যে-সব অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে সেগুলি বিজ্ঞানে যে-রকম উৎপাত সৃষ্টি করেছে সে-সমস্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা তার চেয়ে কম উপদ্রব সৃষ্টি করেন নি। এই সব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন হ'ল এই রকম একটা সংশয়ের উদয় হয়েছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিংটন্ তাঁর Nature of the Physical World-এ বলেছেন যে, বিজ্ঞান নিজেরই তৈরী একটা চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ, পরা-বিদ্যার অন্বেষণ এ চৌহদ্দীর বাইরে। সুবিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ রাসেল্ বলেছেন, ষোড়শ শতাব্দীর ক্যাথলিক্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের মত বিজ্ঞানের প্রভাব একদিন লোপ পাওয়া বিচিত্র না-ও হ'তে পারে। কেউ কেউ আরও এগিয়ে গিয়েছেন; প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রকাশিত ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে "পত্রাবলী"-তে তিনি লিখেছেন যে, শ্রীদিলীপকুমার রায়ের মতে "এখন ফিজিক্সের রাজ্যে হঠাৎ revolution হওয়ায় বিজ্ঞান সে-ক্ষেত্রে একদম উলটে পড়েছে, ফলে religion-এর অতঃপর জয় হয়েছে, কারণ তার বিরুদ্ধে লড়বার আর কেউ নেই।" বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিরোধ যাই থাকুক্, বিজ্ঞানরাজ্যে বিপ্লব হ'লেই ধর্ম্মরাজ্যের অভ্যুদয় সূচিত হয় না। শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয় "পত্রাবলী"-তেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিজ্ঞানের সম্বন্ধে এই যে সংশয় এর কারণ দুটি। প্রথম হচ্ছে বিজ্ঞান এতদিন যে-সব সত্তাকে চরম ও যথার্থ ব'লে প্রচার করেছিল, এখন আর বিজ্ঞান সেগুলিকে যথার্থতার মার্কা দেয় না, বলে সেগুলি বৈজ্ঞানিকের মনগড়া জিনিষ,—concepts,—প্রত্যয়। যথার্থ নয় বটে কিন্তু যথার্থের কাছাকাছি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানের নূতন সূত্র ও নূতন প্রত্যয় তার পুরাতন সূত্র ও প্রত্যয়ের বিরোধী। এখানে একটা কথা আছে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান গণিতের সাঙ্কেতিকে আবৃত। যখনই এই গণিতের সাঙ্কেতিক উন্মোচন ক'রে আধুনিক বিজ্ঞানকে সাধারণ ভাষা ও উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয় তখনই ভুল-ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞানের শৈশবে এতটা গোলযোগ ছিল না। নিউটনের সময় যখন জড়পিণ্ডে আকর্ষণ আরোপ করা হয়েছিল বা ম্যাক্স্‌ওয়েলের সময় যখন ঈথরে আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব ধার্য্য করা হয়েছিল তখন অপ্রত্যাশিত হ'লেও এ-সব ব্যাখ্যা কল্পনাবহির্ভূত ছিল না। কিন্তু নব্যবিজ্ঞানের কালের আপেক্ষিকতা, দেশ-কাল সমন্বয়, বিশ্বের চারটি বা ততোধিক

প্রসার, জড় ও শক্তির অভিন্নতা, নৈমিত্তিকত্বার পঙ্গুতা—ইত্যাদি বিধান সাধারণ অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে পরাস্ত করে। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক অনেকেই স্থূল হস্তাবলেপন ক'রে গোলযোগ খুবই বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উপরিউক্ত যে-ছুটি বই আমরা আজ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করলাম তাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, তারা বিজ্ঞানের প্রতি কোন সংশয় বাড়ায় নি। বেহিসেবী ব্যাখ্যা বা বিজ্ঞান-অনধিকৃত ক্ষেত্রে স্বাধিকার-প্রমত্ত স্বেচ্ছাভ্রমণ করে নি। আধুনিক বিজ্ঞানের মূলপরীক্ষা, সূত্র ও সমস্যাগুলির অকপট বিবরণ দিয়ে বই ছুটি বিজ্ঞানকে সাধারণের বোধ্য করেছে। বিশেষ ক'রে ডারউইনের বইটিতে পদার্থবিজ্ঞানের তথ্যগুলি নব্যবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিপাটি ক'রে বর্ণিত হয়েছে। আর এই সব তথ্যের তত্ত্বালোচনা অত্যন্ত সরসভাবে অথচ বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা বজায় রেখে উপস্থিত করা হয়েছে। যাঁরা পদার্থবিদ্যা আলোচনা করবার আগে পদার্থবিদ্যার মূল তথ্যগুলি জেনে নেবার অবকাশ রাখেন তাঁদের জন্য ইংরাজীতে লেখা এ-রকম বইয়ের সমতুল মেলা ভার। এঁর লেখা তরঙ্গতত্ত্ব, অণুপরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠন, আলোককণার আচরণ ও সংঘর্ষ, রামণ-প্রভা ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, পরীক্ষা ও গবেষণার সরল বিবরণ পড়ে মনে হয় যে, আরব্যোপন্যাসের রহস্যময় কাহিনীও এর মত সুরম্য ও উপভোগ্য নয়। আর এও মনে হয় যে, নব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা—সাধারণ পাঠক—যে-সব ভাসা ভাসা বার্ত্তা খবরের কাগজ ও বৈজ্ঞানিক বন্ধু মারফৎ শুনতাম তা সব কতই ফাঁকা, কতই ভ্রমপ্রদ।

প্লাঙ্ক বিশেষ ক'রে মামুলীবিজ্ঞান-বনাম-নব্যবিজ্ঞান-এর সমস্যাগুলিই আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যে "মাত্রাবাদ" আসার দরুণ নব্যবিজ্ঞান সুরু হ'ল প্লাঙ্ক সেই শক্তিমাত্রা পরিকল্পনার জন্মদাতা। এখানে আমরা Quantum-কে "মাত্রা" নামে অভিহিত করলাম। প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে ছ'একটি কথা বলে এখানে একটা মুখবন্ধ তৈরি করতে ইচ্ছা করি। "মাত্রাবাদ"-এর প্রতিপাদ্য এই যে, বিজ্ঞান জগতের অণুপ্রমাণ ব্যাপারে শক্তির আদান-প্রদান হয় মাত্রা হিসাবে। শক্তিমাত্রা জড়পদার্থের ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রোটনের মতই অবিভাজ্য; এর সাঙ্কেতিক "h", নাম প্লাঙ্কাঙ্ক। গত ১৯০০ অব্দে প্লাঙ্ক বিকিরণের কয়েকটি ব্যবহার পর্য্যালোচনার ফলে প্রচার করেন যে, বিকিরণে শক্তির অর্জ্জন বা বর্জ্জন হয় একটি ছুটি বা ততোধিক h-এর অভগ্ন সংখ্যার অনুপাতে, কিন্তু কিছুতেই h-এর কোন ভগ্নাংশ বা মিশ্রাঙ্ক অনুপাতে নয়। তারপর বিজ্ঞানজগতের বহুতর আণবিক ব্যাপারেই শক্তির এই মাত্রিক ব্যবহার প্রমাণিত হয়েছে। কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে যে, শক্তি অবিরাম নয়, শক্তি একটা সমূহ। প্লাঙ্ক তাঁর বইটিতে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ক'রে মাত্রাবাদের পর্য্যালোচনা থেকে নিজের আবিষ্কারের কথা বাদ দিয়েছেন। তৎপরিবর্ত্তে এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন যে, নব্যবিজ্ঞানে তাঁর স্বজাতীয় বৈজ্ঞানিকদের দান অনেক। আমরাও বোধহয় এই বলে শ্লাঘা করতে পারি যে, মাত্রাবাদের প্রতিষ্ঠায় আমাদের একজন স্বজাতীয়ের দান বিশ্ববৈজ্ঞানিকদের কাছে পরিকীর্ত্তিত। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আইনষ্টাইনের অনুমোদনে ইনি আলোকের ক্ষেত্রেও শক্তির আদান-প্রদান "h" মাত্রা অনুসারে সম্পাদিত হয়, এর একটি বিশুদ্ধ প্রমাণ দিয়ে মাত্রাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর পদ্ধতি হ'ল

এই যে, ব্যষ্টি থেকে যেমন সমষ্টির বিবরণ গড়পরতা হিসাবে দেওয়া যেতে পারে, শক্তিমাত্রা থেকেও তেমনি শক্তিসমূহের ব্যবহার গড়পরতা নিয়ম অনুসারে নির্দ্ধারিত হ'তে পারে। এই থেকে একটা নূতন গণিত—"সমষ্টি-গণিত", তৈরী হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে, শক্তিমাত্রা এর পর আপন ব্যক্তিত্বের বা ভোটের অধিকার লাভ করল। এদিকে স্বনামধন্য ডাচ্ বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর দেখিয়েছেন যে, ইলেক্‌ট্রণও প্লাঙ্কাঙ্ক অনুসারে শক্তি জয় বা ব্যয় করে। আমেরিকার নোবেল্ লরিয়েট্ কম্পটন্ দেখিয়েছেন যে, শক্তিকণা ও ইলেক্‌ট্রণের বা বস্তুকণার মধ্যে ছুটি বিলিয়ার্ড বলের মত সংঘর্ষ হতে পারে এবং এক্ষেত্রেও উভয়ের পক্ষেই মাত্রাবাদ অনুসারে শক্তির আদান-প্রদান হয়। এর মধ্যে বিশেষ কথা এই যে, মামুলী বিজ্ঞান অনুসারে ইলেক্‌ট্রণের পরিলক্ষিত আচরণ কিছুতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু এই মাত্রার পরিকল্পনা থেকেই তা সম্ভব হয়েছিল। এতেও কিন্তু শান্তি হ'ল না, কেননা ইলেক্‌ট্রণের আচরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অব্যাখ্যাত র'য়ে গেল। এমন সময় ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডি ব্রোগলি একটা নূতন প্রত্যয় দাঁড় করিয়ে দেখালেন যে, ইলেক্‌ট্রণকে বস্তু হিসাবে কল্পনা না ক'রে বস্তু-তরঙ্গ রূপে কল্পনা করতে হবে। এই থেকে তাঁর প্রদর্শিত পথে নূতন তরঙ্গগণিতের উদ্ভব হয়েছে। এই গণিত শুধু ইলেক্‌ট্রণের ব্যবহার নয় শক্তিমাত্রার ব্যবহারও নির্দ্দেশ ক'রে মাত্রা-গণিতকেও আপন অঙ্গীভূত করেছে। অত্যন্ত বিস্ময় ও আশার কথা এই যে, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জি, পি, টমসন্ কৌশলে ইলেক্‌ট্রণ-তরঙ্গের সংঘাত বাধিয়ে তার ফটো তুলে এর চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। ডারউইন তাঁর New Conceptions of Matter-এ এই ফটোর নকল দিয়ে বইখানিকে অসামান্য আভরণে অলঙ্কৃত করেছেন। ডি ব্রোগলির ইলেক্‌ট্রণ-তরঙ্গ কিন্তু একটিমাত্র তরঙ্গ নয়, তরঙ্গ-সমবায়। কেননা তরঙ্গের ধর্ম্মই হ'ল বিশ্বময় পরিব্যাপ্তি হওয়া, সুতরাং তরঙ্গের মধ্যে ইলেক্‌ট্রণের স্থান নির্দ্দেশ কি ক'রে সম্ভব? সম্ভব তরঙ্গের সমবায় দিয়ে। সমবায়ে সংঘাত হয়, সংঘাতের ফল এই যে, একের কুব্জপৃষ্ঠের সঙ্গে যদি অপরের কুব্জপৃষ্ঠ মেলে তবে আনুকূল্যে সে স্থান স্ফীত হয় কিন্তু একের কুব্জপৃষ্ঠ যদি অপরের ন্যুব্জপৃষ্ঠের সঙ্গে এসে মেলে তবে সেখানে প্রতিকূলতায় তরঙ্গ আন্দোলন থেমে যায়। যদি সমবায় এমন হয় যে, এইরকম আনুকূল্যের ফলে তরঙ্গের একস্থানে স্ফীতি হয় ও অপর সকল স্থানে প্রতিকূলতার ফলে বিনাশ হয় তবে স্ফীত স্থান দিয়ে ইলেক্‌ট্রণের অবস্থিতি কতকটা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের প্রথম বিপত্তি এইখানে, কেননা যদি বস্তুর বস্তুস্বভাবই গেল তাহলে ভৌতিক জগতের রইল কি? দ্বিতীয় বিপত্তি এই যে, তরঙ্গগণিত অনুসারে ইলেক্‌ট্রণের সংস্থান সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে না। এখানে তরঙ্গগণিত প্রফেসার বোর এর পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সে বৈজ্ঞানিক মতবাদের কি সার্থকতা যার গণিত অনিশ্চয়কে মূলগত ব'লে স্বীকার করে? ব্যাপারটা কি ইচ্ছা শক্তির খেলার মত দেখাচ্ছে না? প্লাঙ্ক এ ছুটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর আলোচনাটি তাঁর মনীষার তুল্যই জ্যোতিষ্মান হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের জগৎ কি যথার্থ—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, না, বৈজ্ঞানিক জগৎ বৈজ্ঞানিকেরই মনগড়া জিনিষ। আপন আভ্যন্তরিক সঙ্গতির উপর এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, পরীক্ষা ও

নিরীক্ষা দিয়ে এ জগৎ পরিশাসিত। এ ছাড়া আর দুটি জগৎ তিনি মেনে নিয়েছেন, সে হচ্ছে প্রত্যক্ষ জগৎ ও তার পিছনে যা' আত্মগোপন ক'রে রয়েছে সেই যথার্থতম জগৎ। ন্যায় দিয়ে যথার্থ জগৎ প্রমাণিত হয় না, কিন্তু তাঁর মতে, অপ্রমাণিতও হয় না। এখানে তিনি যুক্তির দ্বারস্থ হয়েছেন ও একটা উদাহরণ দিয়েছেন—যেমন কোন কিছুর দিকে পিছন ফিরলে তার অস্তিত্ব তর্ক দিয়ে প্রমাণিত হয় না কিন্তু যুক্তি দিয়ে হয়,—যথার্থ জগতের বেলাও তেমনি। বিজ্ঞান একদিকে এই যাথার্থ্যের সঙ্গে ও অন্যদিকে প্রত্যক্ষজগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এর লক্ষ্য একদিকে যাথার্থ্যকে যতদূর সম্ভব জানা, অপরদিকে প্রত্যক্ষ জগৎকে যতখানি সম্ভব জটিলতা বিমুক্ত করা। এ দুটির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই, আছে সহযোগীতা, কেননা যাথার্থ্যকে সরাসরি যেমন সর্ব্বতোভাবে জানা অসম্ভব তেমনি এ প্রশ্নের কোন সাধু জবাব নেই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলির প্রাঞ্জলতম ব্যাখ্যা কি। যাথার্থ্যের সন্ধান ও প্রতক্ষ্যের অধিকার বাড়ান বিজ্ঞানের এই দুই প্রচেষ্টাতেই বৈজ্ঞানিকরা মনোনিবেশ ক'রে এসেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের স্বকীয় যৌক্তিকতা ও শৃঙ্খলাসাধনের জন্যই তাঁরা বিশেষ ক'রে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। এর ফলে বিজ্ঞান কতক পরিমাণে সূত্রসন্ধানী হয়েছে এবং স্বতঃসিদ্ধের আশ্রয় নিয়েছে। আসলে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ-মূর্ত্ত থেকে অমূর্ত্তপন্থী হওয়ার প্রচেষ্টায় অর্থাৎ abstraction-এর ফলে তৈরী হয়েছে, আর প্লাঙ্কের মতে বিজ্ঞান যে পরিমাণে অমূর্ত্তপন্থী হয়েছে সেই পরিমাণে তা' যাথার্থ্যের নিকটতর হয়েছে। এ রকম মনে করার কারণ এই যে—abstraction—অমূর্ত্তসাধনাই আবার প্রতক্ষ্য-জগতের পরিসর বিস্তৃত করেছে। এমন একটিও অমূর্ত্তসাধনা সম্পাদিত হয় নি যার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অধিকার কোন না কোন উপায়ে সমৃদ্ধ না হয়েছে। কিন্তু abstraction-এর একটা মুস্কিল এই যে, বিজ্ঞানের সূত্রের সঙ্গে উপাধি আসে ও উপাধির পিছনে থাকে প্রতিমা। পরে এই সব উপাধির অর্থ-বিস্তৃতি করতে গেলে প্রতিমা পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়। বস্তুর বস্তুস্বভাব নিয়ে যে সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তা' এমনি ক'রেই। প্রাচীন চৈনিক ও ভারতীয় জ্যোতিষীরা ভূয়োদর্শনের ফলে গ্রহদের গতি, অবস্থান ও গ্রহণের তারিখ সুদূর ভবিষ্যতের জন্যও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন কিন্তু গ্যালিলিও গ্রহগতিকে সৌরকেন্দ্রীয় ব'লে সূত্রের প্রথম পত্তন করেন। তারপর কেপলার এই গতিকে বৃত্তাভাষ পথে ও শেষে নিউটন গ্রহদের ও সূর্য্যের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বা কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে সমস্ত গ্রহগতিকে একটিমাত্র সূত্রে নিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ প্রাচীনরা যাকে আলাদা স্থানে ও আলাদা কালে মূর্ত্তরূপে দেখতেন বিজ্ঞান তাকে মূর্ত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে সূত্রে প্রকাশ করল। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ একটা বল,—এই বলের পিছনে তার তারতম্য সাধনের জন্য এল mass—মান,—তার পিছনে এল মানের প্রতিভূ পদার্থ বা বস্তু। এই বস্তুর কল্পনা নিছক আমাদের চিন্তার সহায়ক, নতুবা সূত্রে বস্তুর প্রয়োজন নেই, আছে মানের। গত শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে প্রত্যেক সূত্রের পিছনে এই রকম প্রতিভূ দাঁড় করাতে গিয়ে বিজ্ঞান নিজেকে যন্ত্রচালিত প্রতিমা-সর্ব্বস্ব ক'রে ফেলেছিল। নব্য বিজ্ঞান অবান্তর প্রতিমাকে বাদ দিতে চাইছে,—মান বজায় রেখেছে, তার অবিনশ্বরতা বজায় রেখেছে কিন্তু তার বাস্তবতা অবান্তর ব'লে ত্যাগ করতে উদ্যত। নব্য বিজ্ঞান এমনি ক'রে "বল"-এর কল্পনাকে ত্যাগ করেছে, তার স্থান এখন অধিকার করেছে

"শক্তিক্ষেত্র"। এই রকম আপেক্ষিকতায় দেশ ও কালের সমন্বয় ক'রে বিজ্ঞানে ঠিক তাই সাধিত হয়েছে যা' গণিতে সঙ্কর সংখ্যা ($x + \sqrt{-1}y$) স্বীকার ক'রে করা হয়েছিল। দেশ ও কালের মধ্যে সেই সম্পর্ক যা আসল ও অলৌকিক সংখ্যা ($\sqrt{-1}y$) এর মধ্যে থাকতে পারে। প্লাঙ্ক বলেন এ সব বিজ্ঞানের বিরোধ বা পদস্খলন জ্ঞাপন করে না, কেননা, বিজ্ঞান বিবর্ত্তনের অধীন, আর শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে যে, বস্তুর বদলে বস্তুতরঙ্গের কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে বিজ্ঞান অমূর্ত্ত-সাধনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

তরঙ্গগণিতের যেটা দ্বিতীয় বিপত্তি সেটার নাম uncertainty principle বা 'অনিশ্চয় বিধি'। বোর দেখিয়েছিলেন যে হাইড্রোজনের বর্ণছত্রের সম্যক ব্যাখ্যা করতে গেলে অনুমান করতে হয় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সৌরজগতের মত, তার কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও প্রোটনের চারিদিকে একটা ইলেক্‌ট্রণ পরিভ্রমণ ক'রে বেড়ায়। কিন্তু গ্রহকক্ষা থেকে ইলেকট্রণ-কক্ষার একটু পার্থক্য আছে, সে হ'ল এই যে, ইলেক্‌ট্রণের পরিভ্রমণ মাত্র কয়েকটি বিশেষ কক্ষে সম্ভব। কিন্তু গ্রহদের বেলা এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আর এক কথা যে, কক্ষায় গ্রহদের কখন কোথায় অবস্থিতি তা' দেখা বা গণনা করা যেতে পারে, ইলেক্‌ট্রণের বেলা কিন্তু কক্ষায় তার সংস্থান গণনায় বা পরীক্ষায় নিরূপণ করা অসম্ভব। দাঁড়াচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান যাকে সত্তা দিচ্ছে তার অবস্থিতিই নির্দ্দেশ করতে পারছে না। ইলেক্‌ট্রণের এই আচরণ তরঙ্গগণিতের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। আর একটু বিশদ ক'রে বলতে গেলে ইলেক্‌ট্রণের শুধু অবস্থিতি নয় বেগভারও এই অনিশ্চিততার অধীন, এ দুটিকে সুনির্দ্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু একটা সমন্বয় করা যায়, একটিকে অপেক্ষাকৃত সুনির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাতে অপরটি হ'য়ে পড়ে তুলনায় বেশি ক'রে অনিশ্চিত। এর ব্যাখ্যাটি এইরকম—প্রথম ধরা যাক্ ইলেক্‌ট্রণ-কক্ষের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পথ। এখানে ইলেক্‌ট্রণ হ'ল তরঙ্গ, তরঙ্গের কিন্তু পদ আছে অতএব কক্ষপথে একবার পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে হ'লে তরঙ্গের পাদপূরণ ক'রে কক্ষপথ নির্ণয় করতে হবে। যেমন কবিতার কলিতে পদ অপূর্ণ থাকতে পারে না। অর্থাৎ কক্ষপথ-সংখ্যা অগণ্য নয়, পরিমিত। তার পর ধরা যাক্ ইলেক্‌ট্রণের অবস্থিতি। তরঙ্গগণিতের মতে তরঙ্গ সমবায়ের পূর্ব্ববর্ণিত স্ফীতি ইলেক্‌ট্রণের অবস্থান নির্দ্দেশ করে, কিন্তু বিন্দুবৎ-সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করতে পারে না। সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করতে হ'লে স্ফীতস্থান সঙ্কুচিত করতে হয়, তার উপায় হচ্ছে তরঙ্গ সমবায়ে বহুলপরিমাণে তরঙ্গ আনায়ন করা। কিন্তু তরঙ্গের সংখ্যাধিক্য হ'লে তাদের বেগভারও হবে বিচিত্রতর অর্থাৎ তার অনিশ্চিততার মাত্রা যাবে বেড়ে। ফলে, একটিকে অপেক্ষাকৃত সুনির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে, হয় অবস্থিতি নয় বেগভার। দুটিকে একসঙ্গে সুনির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে না, একটিকে নির্দ্দেশ করতে গেলেই অপরটির অনিশ্চিততা আসবে। এর মধ্যে ইচ্ছাশক্তির কোন খেলা আছে কিনা তা' এই থেকেই বোঝা যাবে যে, এ দুটি অনিশ্চিততার পরিমাণও একেবারে অনিয়ন্ত্রিত নয়, পরন্তু এ দুটি পরিমাণের গুণফল শক্তিমাত্রার সমপর্য্যায়ের। প্লাঙ্ক বলেন, এ অনিশ্চয় বিজ্ঞানের নৈমিত্তিকতার বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের বিরুদ্ধাচরণ করছে না। কেননা কোন অবস্থা বা পরিমাণ কোন মতবাদ অনুসারে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হ'তে পারে কিনা তা' সেই মতবাদের দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। প্রাচীন মত অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যবেক্ষণ করা

সম্ভব ছিল। কিন্তু আপেক্ষিকতা অনুসারে সেটা হ'ল অসম্ভব। এর প্রকৃত সমাধান পরীক্ষায়; পরীক্ষায় দেখা গেল আপেক্ষিকতারই জিত। তেমনি পরীক্ষাতেই স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ইলেকট্রণের সংস্থান ও বেগভার উভয়ে কখনই একসঙ্গে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হতে পারেনা। ব্যাপার এ নয় যে, ইলেকট্রণের অবস্থিতি নিমিত্তাতীত উপায়ে সংঘটিত হয়েছে, ব্যাপার এই যে, সে অবস্থান নির্দ্দেশ করতে যাওয়া ভুল,—ও প্রশ্নই অর্থহীন। যদি পরীক্ষা সাহায্যে বস্তু-তরঙ্গ ধরা সম্ভব হ'ত তাহলে ইলেকট্রণের প্রত্যেক তরঙ্গটি নির্ণয় ক'রে দেখান চলত, তাতে নৈমিত্তিকতারই জয়-জয়কার হ'ত,—কিন্তু তবু ইলেকট্রণের অনিশ্চিততা দূরীভূত হ'ত না। প্লাঙ্ক আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। মামুলী বিজ্ঞানে কোন বস্তুর এক সময়ের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ণয় করা দস্তুর ছিল; তরঙ্গগণিতে এই বিভিন্ন অবস্থা দুটি সম্যক জানা থাকলেও এদের আগের পরের বা মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নির্ণয় করার কোন অর্থসঙ্গতি নেই—কেননা এ সব অবস্থায় তরঙ্গগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। এর একটা চলনসই উপমা আমাদের মনে উদয় হয়েছে। একদল লোকের যদি দুই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সম্মেলন হয় তাহলে যেমন মধ্যবর্ত্তী সময়ে সেই সম্মেলনের অস্তিত্ব বরাবর বিদ্যমান থাকেনা যদিও লোকগুলি ব্যক্তিবিশেষ ভাবে বিদ্যমান থাকে—এও তেমনি। এখানে একটা কথা আছে,—নৈমিত্তিকতা বা কার্য্য-কারণের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—যা বিজ্ঞানে চিরকাল স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে, তার ভিতরকার কথাই এই যে, একটা অবস্থা হুবহু জানা থাকলে আগের বা পরের আর যে কোন অবস্থাও হুবহু বলা চলে। তবে কি নব্য বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে নৈমিত্তিকতা লুপ্ত হ'ল? প্লাঙ্ক বলেন, মামুলী বিজ্ঞানে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সংস্থানই ছিল নিশ্চিত, নব্য বিজ্ঞানে বস্তুতরঙ্গরাই নিশ্চিত, সংস্থান অর্থহীন। তা' ছাড়া মামুলী বিজ্ঞানের মূল-সূত্রগুলি—যথা mass-এর অবিনশ্বরতা, শক্তির অবিনশ্বরতা, আলোকের বেগ,—নৈমিত্তিকতার এ সকল উপাদান নব্যবিজ্ঞানেও অবিকৃত আছে। সুতরাং নৈমিত্তিকতার অবসান হয়নি। এ বিষয়ে অনেক কথা আছে, সে সবের জন্য প্লাঙ্কও ডারউইনের বই-ই পঠিতব্য। তবে একটা কথা বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। ইলেকট্রণের আচরণ যদিও তরঙ্গগণিতমতে ব্যাখ্যাত হয় তবু তার কণাস্বভাব এ মতে সুসম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। আলোকের ব্যাপারেও এই রকম একটা আচরণ লক্ষ্য হয়। প্রাচীন মতে আলোক ছিল আকাশ-তরঙ্গ, এ মতে আলোকের ব্যাপ্তি-ধর্ম্ম বর্ণছত্র উৎপাদন ইত্যাদি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হ'ত কিন্তু আলোকপাতে ধাতুগাত্র থেকে ইলেকট্রণের স্ফুরণ—আধুনিক সময়ের এই আবিষ্কার,—ব্যাখ্যাত হ'ত না। এ দিকে আলোক-মাত্রাবাদে এ আচরণ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হলো। আলোক, ইলেকট্রণ—উভয় ক্ষেত্রেই এ দ্বৈতভাব বিদ্যমান। অণু-পরমাণুতেও তাই। মনে হয় যেন এই দ্বৈতরূপই জগৎপরিচয়ের একটা প্রধান সঙ্কেত। অধুনা এই দুই মতের একটা সমন্বয় করবারও চেষ্টা হয়েছে অর্থাৎ এই রকম মনে করা হয় যে, ইলেকট্রণ আলোক ইত্যাদি তরঙ্গরূপে পরিব্যাপ্ত হয় কিন্তু শীর্ষে শীর্ষে মাত্রাকে বহন করে। শীর্ষেই মাত্রার প্রাধান্য বা বসতি, অন্যস্থানে নয়। সুতরাং এমনভাবে যদি পরীক্ষার ফাঁদ পাতা যায় যে, তাতে কণা বা মাত্রা ধরা পড়ে তাহলে ব্যাপারটাকে মনে হয় মাত্রা-রূপী; অথবা এমনভাবে যদি ফাঁদ পাতা যায় যে, তরঙ্গবৃত্তি ধরা পড়ে তাহলে ব্যাপারটাকে মনে হয় তরঙ্গরূপী। একত্র উভয়রূপে প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ প্লাঙ্ক ও ডারউইনের মতে বিজ্ঞানপরিচর্য্যার

ফলে ধরা পড়েছে যে তরঙ্গরূপে বিশ্বনিখিলে যা পরিব্যাপ্ত তাই আবার মাত্রা বা বস্তুকণারূপে সংখ্যা, স্থান ও আকার-বদ্ধ। স্থূল বা বৃহদায়তনের বেলা তরঙ্গরূপ অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন, দেখা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু পরমাণু ইলেকট্রণ ও জ্যোতিঃকণার বেলা তরঙ্গরূপ আর মৃদু-মন্দ নয়, সুতরাং তখন তরঙ্গরূপ ও বস্তুরূপ দুইই ধরা পড়ে। এতে বিরোধ নেই—সবকিছুকে বস্তুময় ভাবলেই বিরোধ। এখানে অবশ্য অ-বাস্তবতা আধ্যাত্মিক অর্থে ধর্ত্তব্য নয়।

প্লাঙ্ক বলেন, আসল কথা বিজ্ঞানে দুরকম নিয়মের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে; এক হচ্ছে ব্যষ্টি-বিধ যাতে সব সময়েই নিয়ম হুবহু মেলে আর এক হচ্ছে সমষ্টি-বিধ যাতে নিয়ম গড়পড়তায় মেলে কিন্তু ব্যষ্টিহিসেবে ইতরবিশেষ হয়। হয়ত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রায় সবই সমষ্টিহিসেবে ঠিক, ব্যষ্টিহিসেবে নয়। কিন্তু,—তাঁর মতে,—ব্যষ্টি-বিধ নিয়মই আদর্শ নিয়ম যার মাপকাঠি দিয়ে সমষ্টি-বিধ নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি মাপা যায়। আর ব্যষ্টি-বিধ নিয়মের আবিষ্কারেই বিজ্ঞানের বিশেষ ক'রে ব্যাপৃত থাকা উচিত কেননা এ নিয়ম বিজ্ঞানকে গন্তব্যের দিকে যতখানি এগিয়ে দেয় সমষ্টি-বিধ নিয়ম ততখানি পারে না।

প্লাঙ্কের মতে যাথার্থ্যের সন্ধানে বিজ্ঞানকে চির-ব্যাপৃত থাকতে হবে কিন্তু কিছুতেই তার অবধি মিল্‌বে না;—এতেই মানুষের কল্যাণ। তাঁর শেষ কথাগুলি উদ্ধৃত করা গেল—

"Scientists have learned that the starting point of their investigations does not lie solely in the perception of the senses, and that science cannot exist without some small portion of metaphysics. Modern physics impresses us particularly with the truth of the old doctrine which teaches that there are realities existing apart from our sense perception, and that there are problems and conflicts where these realities are of greater value for us than the richest treasures of the world of experience."

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Cosmic Problems,—An Essay in Speculative Philosophy—J. S. Mackenzie (Macmillan & Co., Ltd.).

মেকেঞ্জি মহোদয় দার্শনিক জগতে সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিবিধ গ্রন্থনিচয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তাঁহার আধুনিকতম চিন্তাধারাকে "বিশ্ব-জাগতিক সমস্যাসংগ্রহ" এই আখ্যা দিয়া তিনি উপরিলিখিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের মুখবন্ধে যথারীতি পুস্তকটীর জন্মপরিচয় ও ইতিবৃত্ত নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে স্বীয় গোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"আমি এখনও নিজেকে ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদ চিন্তাধারার একজন অনুগত সেবক হিসাবে দেখিয়া থাকি ও তৎসম্পর্কে আমার প্রথম শিক্ষাগুরু এডওয়ার্ড কেয়ার্ডকেই সর্ব্বোত্তম পথনির্দ্দেশক মনে করি।"

সমালোচনার কষ্টিপাথরে এই পুস্তকখানির মূল্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিলে হয়ত দেখা যহিবে যে, ইহা ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। তত্ত্ববিদ্যার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া দেখিলে বিশ্বরহস্যের এই সব জটিল সমস্যার আলোচনা সমস্যাপূরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয় বলিয়া মনে হয় না। তবে একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, দর্শনের প্রাণগতি সমস্যাপূর্ত্তিতে নয়, সমস্যাস্ফূর্ত্তিতে। সেজন্য এই গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাগুলির ব্যাপকতার অনুমাপে ইহাদের সমাধানের গভীরতার অভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইলেও, ইহার সার্থকতা তাহার উপর নির্ভর করিবে না। অবহিতদৃষ্টিতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার যে দশটি অধ্যায়ে এই বিশ্ব-সমস্যাপূরণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক অধ্যায়ই এক এক জিজ্ঞাসার চিহ্নে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের কোনও এক সুরসিক পরলোকগত বন্ধু তত্ত্ববিদ্যার পরীক্ষার পূর্ব্বে কোনও এক পরীক্ষার্থীকে বলিয়াছিলেন, "ও নিয়ে অত ভাব্‌ছ কেন? সব প্রশ্নের উত্তরেই কিছুটা লিখে তার পর 'এ্যা-ও হয়' 'অ-ও হয়' এই দিয়ে শেষ করবে।" এক্ষেত্রেও যেন অনেকটা সেই সুরই ধ্বনিত হয়।

শুনিতে স্বতোবিরুদ্ধ হইলেও একদিক দিয়া দেখিলে ঠিকই মনে হয় যে, অনধ্যবসায় বা অজ্ঞেয় রহস্যবাদেই দার্শনিক দৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ পরিণতি বা চরম উৎকর্ষ। অন্ততঃপক্ষে গ্রন্থকারের দৃষ্টি তাহাই প্রতিপন্ন করে। এ বিষয়ে বোধ হয় তাঁহার সমসাময়িক ও সমরসরসিক ব্রাড্‌লি অগ্রদূত। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Appearance and Reality"-নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে এক জায়গায় বলিয়াছেন, "যখন মানুষের মন রহস্যময় মায়ালোকের সূক্ষ্মানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া আর যথেচ্ছবিহার বা অজানার উদ্দেশে তার প্রেমের নৈবেদ্য উৎসর্গ করে না, যখন সংক্ষেপতঃ, জ্ঞানের স্তিমিতালোক মানুষের মনকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না তখনই শুধু তত্ত্বজ্ঞান নিরর্থক হইয়া উঠে।" আবার উপসংহারে এই সত্যের প্রতিপাদন হিসাবে মন্তব্য করিয়াছেন—"যে সংশয়বাদ জ্ঞানানুকূল—যাহার দৃষ্টিতে সমস্ত জ্ঞানসম্ভার এক রকম মদান্ধতারই নামান্তর—যাহার অনুভূতিতে মানুষের জ্ঞান এই বিশ্বজগতের সম্পদের অনুপাতে অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—আমি তাহারই সমর্থন করি। মানুষের যে সহজ বিস্ময় এই জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত জগতের বাহিরে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় এবং জানা অজানা নানান্ রাজ্যের পথে ভ্রাম্যমাণ করে আমি সেই বিস্ময়ের সার্থকতা আছে মনে করি।" সমস্ত জানার মর্ম্মস্থলে যে অজানার নিভৃতলোক বর্ত্তমান তাহার সন্ধান যে তত্ত্বজ্ঞানার্থী না পায় সে যথার্থ ই 'প্রকৃতিকৃপণ'।

অতএব এদিক দিয়া দেখিলে গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টাকে মোটেই ব্যর্থপ্রয়াস বলা যায় না। ইহার প্রতি সুবিচার করা হইবে যদি সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টার উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, সমাধানের সাফল্যের উপর নহে। এবিষয়ে গ্রন্থখানির উপসংহারে মেকেঞ্জি মহোদয় যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন তাহাই সমালোচকের প্রধান উপজীব্য। তিনি লিখিয়াছেন (১১৯ পৃঃ) "এই পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জীবনের মূলীভূত কতকগুলি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও তৎসমাধানের পক্ষে যে সব অন্তরায় সুবিদিত সেগুলির অপসারণ। এটা কখনও আমার কল্পনায় উদিতও হয় নাই যে, এই সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়াছে। তবে আমার বিশ্বাস যে, আমি কিছুই গোপন করি নাই।"

গ্রন্থখানি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত :—

(1) The Present Outlook in Speculative Philosophy; (2) A General Theory of Value; (3) The Ideas of the Absolute and God; (4) The Problem of Creation; (5) The Spatio-Temporal System; (6) The Conception of Evolution; (7) The Problem of Freedom; (8) The Problem of Immortality; (9) The Conception of Deity; (10) The Present Outlook in Religion.

এই দশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি এইরূপে নির্দ্দেশ করা যায় :— এই নামরূপাত্মক জগতের মূলীভূত কারণস্বরূপ এক সর্ব্বগত স্রষ্টা পুরুষের কল্পনা অপরিহার্য্য। মানব-শিল্পীর সমস্ত সৃষ্টি যেরূপ কল্পনাপ্রসূত, সেরূপ বিশ্বসৃষ্টিও বিশ্বশিল্পীর কোন আগন্তুক সংকল্পপ্রসূত। সেই সৃষ্টিক্রিয়ার চরম লক্ষ্য মনে করা যাইতে পারে এক মানবসমাজের উদ্ভাবন যাহাতে প্রত্যেকেই পরস্পর নিরপেক্ষ, স্বাধীন, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার ব্যাপকাভিপ্রায়-নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট। যেমনতর কোন নাটকে বিভিন্ন পাত্রগণ নাটকপ্রবন্ধানুসারে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া থাকে। ঈদৃশ ব্যক্তিদিগের স্বপক্ষে অমরত্বের দাবী যুক্তিসম্মত (৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থকার তাঁহার নিবন্ধের প্রতিপাদনে যে বিচারনৈপুণ্য ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসার্হ। তাঁহার চিন্তাধারার মূলসূত্র বিজ্ঞানপ্রসূত না হইলেও বিজ্ঞানসম্মত। নতুবা এই বৈজ্ঞানিক যুগে কোনও স্বকপোলকল্পিত উদ্ভট সৃষ্টিতত্ত্ব আমল পাইত না। তাঁহার সৃষ্টিপরিকল্পনার সব উপাদানই বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে আহৃত এবং এবিষয়ে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কিন্তু ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনসম্বন্ধে তিনি যে দু-একটি মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে ইউরোপীয় লেখকদিগের স্বভাবসিদ্ধ উন্নীত ভ্রূবন্ধ বা নাসিকাকুঞ্চন বা ঘৃণাব্যঞ্জক অন্য কোনও নবোদ্ভাবিত অঙ্গভঙ্গি অবশ্য নাই তথাপি তাহা আমরা মানিয়া লইতে পারিনা। কারণ, এগুলি অবজ্ঞা-প্রণোদিত না হইলেও অজ্ঞতাপ্রসূত। একথা তিনি বিনয়সহকারে স্বীকারই করিয়াছেন যে তিনি বেদান্তদর্শন-বিশেষজ্ঞ নহেন। তথাপি এমন একটা মন্তব্য করিয়াছেন যাহা এই বিশেষজ্ঞতার দাবির মতই শোনায়। 'ব্রহ্ম-ও ঈশ্বর-তত্ত্ব' প্রসঙ্গে (৩৩ পৃঃ) তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রাড্‌লির অধ্যাত্মবাদের সহিত বেদান্তদর্শনের মূলগত ঐক্য আছে বলিয়া অনেক সময় শোনা যায় কিন্তু আমার মনে হয় যে, ব্রাড্‌লির দর্শনের প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যে সত্য ও সত্তার তারতম্যবাদ (Degrees of Truth and Reality) ব্রাড্‌লির দর্শনের মূলতত্ত্ব তাহার অস্তিত্ব বেদান্তদর্শনে না থাকাতে উভয়ই একান্ত বিভিন্ন।" কিন্তু বেদান্তদর্শনের অন্যান্য ব্যাখ্যা দূরে থাকুক শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যেই (ব্র সূ ১-১-১১) দেখিতে পাই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রহিয়াছে—"যদ্যপ্যেক আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু গূঢ়ঃ তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষতারতম্যাদাত্মনঃ কূটস্থনিত্যস্যৈকরূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবিষ্কৃতস্য তারতম্যমৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষৈঃ শ্রূয়তে"। এই অধিকারিভেদতত্ত্ব শাঙ্কর দর্শনের অঙ্গীভূত এবং অতি পরিস্ফুটভাবে ইহার উল্লেখ তদীয় ভাষ্যে পাই। ইহার প্রসিদ্ধি সম্পর্কে বিচারের অবতারণা না করিয়া শঙ্করাচার্য্য শুধু এক কথায় মানিয়া লইয়াছেন "প্রসিদ্ধশ্চার্থিত্বসামর্থ্যাদিকৃতমধিকারিতারতম্যম্ (ব্র সূ ভা ১-১-৪)। এই সম্পর্কে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রাড্‌লির দর্শনের সহিত শাঙ্কর দর্শনের ভাবগত ঐক্য এবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়েও রহিয়াছে। ব্রাড্‌লি যেমন বলিয়াছেন

যে, "The Absolute itself has no degrees ; for there is no more or less in perfection" ঠিক্ তাহারই যেন পূর্ব্বাভাস শঙ্করের উক্তিতে পাই "অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য" (ব্র সূ ভা ১-১-৪)।

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রসঙ্গেই মেকেঞ্জি মহোদয় বলিয়াছেন যে, "বেদান্তদর্শনে (বিশেষতঃ শঙ্করভাষ্যে) ব্রহ্মের কূটস্থনিত্যত্ব ও সংসারের অনিত্যত্ব যেরূপ একান্তবিবিক্ত তাহাতে সংসারের আপাতপ্রতীয়মানরূপও উপপন্ন হয় না। এই চিরপ্রবহমান সংসারের একমাত্র যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহা ইহাকে নিত্যকূটস্থ ব্রহ্মের লীলারূপে দেখা। কিন্তু এটাকে শুধু একটা লীলা-খেলা হিসাবে দেখা চলে না ; এর মধ্যে একটা গুরুত্ব উপলব্ধিরও প্রয়োজন আছে। আমার যতদূর মনে হয়, বেদান্তদর্শনে এই গুরুত্ব-উপলব্ধির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।" (৩৩-৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অথচ এই লীলাতত্ত্বের ভিতর দিয়া সৃষ্টিসমস্যার সমাধান বেদান্তদর্শনের এক অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। এক্ষেত্রে সমগ্র তত্ত্বের অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্ভব। কেবল শঙ্করভাষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, একদিকে যেমন ব্রহ্মের আপ্তকামত্ব এবং প্রয়োজনপূর্ব্বিকা সৃষ্টির অসম্ভাবনা দেখান হইয়াছে, অপরদিকে যে বিশ্বসৃষ্টিতে প্রাণিকর্ম্মের অপেক্ষা রহিয়াছে তাহাও সুসমঞ্জসভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সৃষ্টিকে লৌকিক লীলার সহিত তুলনা করিয়া একদিকে যেমন "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" বলিয়া সূত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অপরদিকে 'কর্ম্মসাপেক্ষত্বের মধ্যে তাহার গুরুত্বের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। এই লীলাবাদের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের মধ্যে এবং আত্মপ্রকাশই আনন্দের স্বরূপ। এইজন্যই বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী-টীকায় ব্রহ্মের 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'বুদ্ধেত্যপরাধীনপ্রকাশমানন্দাত্মানং দর্শয়তি' এবং ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলার তাৎপর্য্য তাঁহার অপরাধীন প্রকাশত্ব বা স্বয়ং প্রকাশত্ব স্বীকার করা ; কারণ আনন্দ ও তাহার প্রকাশ অভিন্নাত্মক ("আনন্দপ্রকাশয়োরভেদাৎ")।

শ্রীসরোজকুমার দাস

The Man Who Died—D. H. LAWRENCE (Secker).
The Waves—VIRGINIA WOOLF (Hogarth Press).

লরেন্স্-এর অকাল মৃত্যুর পরে তাঁর যে-উপাখ্যান দুখানি প্রকাশ হয়েছে, তা প'ড়ে ভাবুকমাত্রেই শোক অনুভব করবেন। লরেন্স্-এর মতো প্রতিভা সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালেই দুর্লভ ; উপরন্তু সংস্কারপ্রধান ইংলণ্ডে ও-রকমের অনুসন্ধিৎসা গত দু শ বছরের মধ্যে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। লরেন্স্-এর পিতা ছিলেন কয়লাখনির মজুর, এবং তাঁর মায়ের জন্ম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে। এমন দুটি বিসম্বাদী প্রাণীর দাম্পত্যজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব অবশ্যম্ভাবী। এই অন্তর্বিরোধের মধ্যে প্রসূত হয়ে লরেন্স্ স্বভাবতই সমাজের প্রচলিত মূল্যগুলোকে সংশয়ের চক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু আজীবন অস্বাস্থ্যের ফলে তাঁর সংস্কারকবৃত্তি কর্ম্মস্রোতে যোগ দিতে পারলে না,

সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ প্রণালীতেই আটক থাকিতে বাধ্য হলো। এই কারণে তাঁর সাহিত্য-সাধনায় বিলাসিতার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া শক্ত ; এমন-কি আসলে হয়তো তিনি সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টাই করেন নি, আবিষ্কার করেছেন একটা নতুন তত্ত্বদর্শন, একটা অভিনব মুক্তিমার্গ। আজকের দিনে সাহিত্যিকেরা যখন সাহিত্যের স্বায়ত্তশাসন, সাহিত্যের নির্নিমিত্ত বিশুদ্ধতা প্রমাণে বদ্ধপরিকর, তখন সাহিত্যের লৌকিক আদর্শকে মনে রাখতে পারাই হয়তো যথেষ্ট কৃতিত্ব। তার উপরে যিনি কবিপ্রতিভায় ও লিপিচাতুর্য্যে লরেন্স্-এর সমকক্ষ হয়েও, আপাতখ্যাতির পথ ছেড়ে, তাঁর মতো, সত্যের অপ্রিয় অন্বেষণে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন, তিনি অবশ্যই আমাদের নমস্য।

উপরন্তু তাঁর দার্শনিক মতামত নেহাৎ নগণ্য নয়। জীবন প্রত্যুষেই লরেন্স্ আবিষ্কার করেন যে, তাঁর পিতামাতার মধ্যে কোনো দেহাতীত আকর্ষণ তো নেইই, এমন-কি প্রণয়ব্যাপারে তাঁর নিজের বিতৃষ্ণা ও বৈকল্যের ইতিহাস জেনে মনে হয়, যে-স্নেহবন্ধনে তিনি ও তাঁর মা অত নিবিড় ভাবে বিজড়িত ছিলেন, আধুনিক মনস্তত্ত্বে তারই নাম জননীগ্রন্থী। অতএব নিজের জীবনের শোকাবহ দুর্গতি থেকে লরেন্স এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে মানবীয় সম্বন্ধের মূলসূত্র হচ্ছে দেহ ; এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহকে অস্বীকার ক'রে মানুষ জগৎকে দুঃস্থ দুর্নিতিময় ক'রে তুলেছে। এ-বিশ্বাসে উপনীত হবার পরে ক্রিশ্চানিটির মতো আত্মাপ্রবণ ধর্ম্মকে ও ক্রাইষ্টের মতো অতনু দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিলো না। এবং পাশ্চাত্য সমাজ প্রকাশত বিষয়াসক্ত হলেও, তার অন্তরাত্মা যেহেতু এই বৈদেহী ভাবে আবিষ্ট, তাই কালে লরেন্স্-এর বৈনাশিক দিকটাই স্ফুটতর হয়ে ওঠে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাঁদের আস্থা আছে, তাঁরাই লরেন্স্-এর সমর্থন করবেন। কিন্তু ওয়াট্‌সন্, পাভ্‌লোভ্ ইত্যাদিকে উদ্‌ভ্রান্ত ব'লে ভাবলেও লরেন্স্ আমাদের প্রণম্য। সংসার দেহপ্রধানই হোক্ আর আত্মাপ্রধানই হোক্, দুই নৌকোয় পা দিয়ে জীবননদী পেরুনো, সকলের মতেই অসম্ভব। এ-সত্যকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্য্যত একাগ্র নিষ্ঠা আজ আমাদের হাস্য উদ্রেক করে ; শতমুখী, সহস্রাক্ষ হয়ে ওঠাই বর্ত্তমানের আদর্শ। এই নৈরাজ্যের যুগে, এই বিক্ষোভের মধ্যে অখণ্ডতা-ও অবৈকল্য-সম্বন্ধে সচেতন হতে পারাই এত বড় কথা যে, লরেন্স-এর দেহবাদকে উপেক্ষা করলেও তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে মুগ্ধ হতে হয়। তবে অবৈকল্যের আদর্শ শুধু জীবনে প্রয়োগ করাই যথেষ্ট নয়, সাহিত্যও সেই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তব্য ও উক্তির মধ্যে দ্বৈধ থেকে গেলে, সাহিত্যসৃষ্টি তো অসম্পূর্ণ বটেই, এমন-কি তাতে বক্তৃতাও ব্যর্থ হ তে বাধ্য

যুদ্ধের পরে লরেন্স্ যে-বইগুলি বার করেন, তার অধিকাংশ প'ড়েই মনে হয়, তিনি সাহিত্যের প্রাক্তন সংস্কারটিকে ভুলে গেছেন। তাঁর ইদানিকার পুস্তকে আবেগের অভাব নেই, ভাবুকতার প্রমাণও তাতে প্রচুর ; কিন্তু উক্ত বইগুলির রূপ-পরিকল্পনার কোনো সার্থকতা পাঠকের কাছে ধরা দেয় না ব'লেই আমার বিশ্বাস। কাজেই যিনি নিছক আখ্যানবস্তুর লোভে লরেন্স্-এর বই পড়তে গেছেন, তর্কের বাহুল্যে তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে ; এবং পবিত্র হিতৈষণার প্রত্যাশায় যিনি লরেন্স্-এর শরণ নিয়েছেন, গল্পের অলিগলিতে ঘুরে, তাঁর শিক্ষানুরাগ অচিরেই তর্কের সূত্রটিকে হারিয়ে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও যে লরেন্স্ অপাঠ্য হয়ে

ওঠেন নি, সেজন্যে তাঁর অত্যদ্ভুত লিপিদক্ষতা ও সহজ কবিপ্রতিভাই দায়ী।
তাঁর উপন্যাস, এমন-কি কবিতা নামধেয় উচ্চণ্ড ভর্ৎসনার মাঝে মাঝে এই অনিকাম
কাব্যানুপ্রেরণাগুলি গোবি-সাহারার বক্ষে স্বসমুখ মরুদ্যানের মতো; একবার সেখানে
গিয়ে পৌছালে, পথকষ্ট তো বিস্মৃত হতেই হয়, উপরন্তু এগুলে আবার তেমন ভূস্বর্গের
সাক্ষাৎ মিলতে পারে, এই মরীচিকার মোহে সেইখানে যাত্রাশেষ করাও দুঃসাধ্য।

কিন্তু তাহলেও সম্প্রতি লরেন্স্-সম্বন্ধে আমার মনে একটা ক্লান্তি জেগেছিলো।
তাঁর লেখা থেকে আমার রূপপিপাসা মেটাবার আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলুম,
এমন সময় হঠাৎ "দি ভর্জিন্ এণ্ড্ দি জিপ্সী'-র আবির্ভাব হলো; এবং সঙ্গে সঙ্গে
অনুভব করলুম যে, লরেন্স্-এর আর যাই অধঃপতন ঘটে থাকুক, রসসৃষ্টির শক্তিতে
ভাঁটা লাগেনি। সে তো দূরের কথা, বরং মৃত্যুকে সন্নিকট জেনে তাঁর প্রাথমিক
প্রতিভা এই ছোট বইখানির পাতায় পাতায় স্বীয় অমরত্ব দ্বিগুণ বিদ্রোহে ঘোষণা
ক'রে গেছে। "দি ম্যান্ হু ডাইড্" আরো পরের বই; কিন্তু এতেও পূর্ব্বোক্ত
ক্ষমতার অণুমাত্র হ্রাস লক্ষিত হয় না। ফলে লরেন্স্-সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আবার
অসীমের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

লরেন্স্ এই বই দুখানিকে কোনো কষ্টে শেষ করেছিলেন মাত্র, ও-দুটিকে
ঘষে মেজে প্রকাশোপযোগী করার অবসর পান নি। তাই থেকে আমার ধারণা
হয়েছে যে স্বভাবত তিনি মহাকবি ছিলেন; কিন্তু মানবের মঙ্গল তাঁর কাছে এত
মূল্যবান মনে হতো যে জনহিতার্থে তিনি সেই প্রাকৃত উৎকর্ষকে জলাঞ্জলি দিতে
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। আমি মনে করি যে স্বাভাবিক পথে চললে লরেন্স্
ইংরেজি কাব্যের নবগ্রহের অন্যতম হতে পারতেন। তা না-হ'য়ে তিনি যে কেবল
উদ্দীপ্ত উল্কা হয়ে থেকে গেছেন, তার কারণ তিনি মৌল প্রেরণাকে অবদমন ক'রে
আপনাকে সামাজিক কল্যাণের যূপে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আশা ছিলো সেই
আত্মবলিদানের ফলে সংসার আবার সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। এই আশা দুরাশা
কিনা বিচার করার সময় এখনো আসে নি; কিন্তু এত বড় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত
দেখে মিড্ল্টন্ মারি যদি তাঁকে ক্রাইষ্টের সঙ্গে তুলনা ক'রে থাকেন, তবে সে-তুলনা
নিশ্চয়ই সার্থক, তাতে অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নেই।

লরেন্স্-এর শেষ বই-দুখানিকে রূপসৃষ্টি-হিসেবে আমি তাঁর অন্যান্য বইয়ের
উপরে স্থান দিচ্ছি ব'লে, এ-দুটি কেবল গল্প, এমন বিশ্বাস অমূলক হবে। গল্প বাস্তবপন্থী
হওয়া দরকার কিনা, সে-প্রসঙ্গ এখনো তর্কাধীন; কিন্তু রূপসৃষ্টি আর রূপকথা যে
এক নয়, তাও বোধ হয় নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো বিশুদ্ধ চৈতন্যের মতোই দুর্লভ;
অন্ততপক্ষে প্রত্যেক প্রকৃত আর্টিষ্টই চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টিতে একটা শিল্পোত্তর
অর্থ, একটা রূপাতীত সঙ্গতি, একটা অনির্ব্বচনীয় সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে।
কেবল মোনালিজার মুখভঙ্গীই রহস্যময় নয়, অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর
হাসিও সমস্যামূলক। "দি ভর্জিন্ এণ্ড্ দি জিপ্সী" ও "দি ম্যান্ হু ডাইড্" বই
দুখানিতেও কথকতাই লরেন্সের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হলেও, তাঁর আসল অভিপ্রায় হচ্ছে
সমস্যার সমাধান। এ-মত যে আমার কপোলকল্পিত নয়, তার প্রমাণ কাহিনী-
দুটিকে বিশ্লেষণ করলেই মিলবে।

বই দুখানির আখ্যান বস্তু অত্যন্ত নির্ভার, এত বাহুল্যবর্জ্জিত, এত স্বচ্ছ যে

তাকে সংক্ষেপ করা অসাধ্য। প্রথমটি এক পরিমার্জ্জিত কুমারীর ইতিহাস। সভ্যতা-
শিষ্টতার চাপে তার উদ্ভিন্ন জীবন যখন শুকিয়ে ঝ'রে যাবার দাখিল হয়েছে। এমন
সময় এক অনাহূত জিপ্সীর আরণ্যিক আকর্ষণ তাকে মুক্তির খবর এনে দিলে।
কিন্তু এমনি সঙ্কীর্ণ আমাদের সমাজ, এত বদ্ধমূল আমাদের কুসংস্কার যে, মোক্ষের পথ
উদ্ঘাট দেখেও আমরা উধাও হতে পারি না। সে-মেয়েটিও, আমাদের সকলের মতো,
তার মনের সঙ্কোচকে মূর্ত্ত ক'রে, নিজের গারদে নিজেই রক্ষী হয়ে বসলো। তবে
তার অদৃষ্ট ছিলো ভালো, তাই আমাদের কপালে যা ঘটে না, তার কপালে তাই
সম্ভব হলো। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী একদিন সংহারমূর্ত্তি ধ'রে, তার পন্থা অবার ক'রে
দিলেন। শীতের বরফ গ'লে, তাদের গ্রামের গোষ্পদ নদীতে একদিন প্রলয়বন্যা
ডাক্লো। ভেসে গেলো তার পৈতৃক ভিটা, ডুবে ম'লো তার কাকভুষণ্ডি পিতামহী,
তলিয়ে গেলো তার বাপের ফাঁকা হিতোপদেশ; সেই উদ্দাম বসন্তবন্যার মুক্তিস্নানে
সনাতন মানবধর্ম্মে তার দীক্ষা শেষ হলো। চতুর্দ্দিক জলমগ্ন হলো; কেবল জেগে
রইলো তার শয়নকক্ষ; সেখানে আয়োজনহীন বাসরে জিপ্সীর তারক আলিঙ্গনে
আত্মসমর্পণ ক'রে, সে তার দেহকে চরম পরম ব'লে চিনলে।

"দি ম্যান্ হু ডাইড্"-বইখানির প্রতিপাদ্যও সমান; তবে এবারে জোর
দেওয়া হয়েছে পুরুষের দিক্টায়। লরেন্স্-এর শেষ বইখানির নায়ক স্বয়ং ক্রাইষ্ট,
যিনি দেহকে সহজে গ্রহণ করলে সত্যসত্যই স্বর্গের সিঁড়ি র'চে যেতেন, কিন্তু দেহকে
প্রত্যাখ্যান ক'রে, আমাদের নরকের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন। এই আখ্যায়িকায়
ক্রাইষ্ট কেবল উজ্জীবিত হয়ে জগতে ফিরলেন না, সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের
ভ্রান্তি-সম্বন্ধে পরিপূর্ণ চেতনা নিয়ে এলেন। কিন্তু তখন পৃথিবী-পরিত্রাণের অমৃতযোগ
অতীত হয়ে গেছে, তখন তিনি তাঁর ধনপিপাসু আশ্রয়দাতার গলগ্রহ, মেরি মড্লিন্-
এর সন্দেহভাজন, শিষ্যদের কাছে অনর্থের উপসর্গ মাত্র; তখন তাঁর সামনে আশা নেই,
এবং পশ্চাতে কেবল সুমেরুপ্রমাণ ভুল। ক্রাইষ্ট বুঝলেন যে স্বদেশে তাঁর স্থান হবেনা,
তাই তিনি মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন, যেখানে মানুষ তার দেহকে অসম্মান করেনি,
যেখানে মানুষ প্রাক্পৌরাণিক প্রকৃতিকে ভক্তির রহস্যে মহিয়ান ক'রে রেখেছে। যাবার
সময় মেরি-মড্লিন্-দত্ত স্বর্ণমুদ্রার বাকি কটার বিনিময়ে তাঁর আশ্রয়দাতার কাছ থেকে
শৃঙ্খলিত মোরগাটির মুক্তি ক্রয় করে তিনি অজ্ঞাত-বাসী হলেন। তাঁর যাত্রা ব্যর্থ
হলোনা; মিসরের এক অখ্যাত জনপদে আইসিস্-এর কুমারী হোত্রী বিতাড়িত
নরনারায়ণকে স্বাধিকার ফিরিয়ে দিলে; এবং যিনি সারা পশ্চিমে মরুর ঊষরতা বিস্তার
করেছিলেন, সেই কুমারীর দৈহিক সঙ্গমে তিনি হয়ে উঠলেন উর্ব্বরতার দেবতা,
কৃষির অধিষ্ঠাতা, আইসিস্-এর স্বামী ওসাইরিস্।

সমগ্রতা থেকে ছিন্ন ক'রে দেখলে, গল্প-দুটিকে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলক রূপক ব'লে
মনে হবে। এখানেও লরেন্স্-এর প্রতিপাদ্য নীতি হচ্ছে সেই পুরাতন অভিমত যে,
দেহকে অঙ্গীকার না-করলে জীবন নিরর্থ বিড়ম্বনা। কিন্তু সম্পূর্ণ বই-দুখানির
শিল্পকৌশল এমনি চতুর, আখ্যানভাগ এমনি মর্ম্মস্পর্শী। চরিত্রচিত্রণ এত সজীব, এত
অসন্দিগ্ধ, আবেগ এমন গভীর, এমন অথল, যে প্রচারপ্রবৃত্তি অনায়াসেই কাব্যে
পর্য্যবসিত হয়েছে। কথকতার স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা তর্কের আলোড়নে কোথাও আবিল
হয়ে ওঠেনি, লেখার মধ্যে পাঠককে ধর্ম্মান্তরিত করবার কোনো চেষ্টাই নেই; সেইজন্যেই

বোধহয় বই-ছখানি বন্ধ করার অনেক আঁগেই অনুভব করি লেখক আমাদের কায়মনবাক্য জুড়ে বসেছেন। একটি লাইনেও গুরুগিরির চোখরাঙানি ধরা পড়েনা, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ সমধর্ম্মীর, সমব্যথার আবেদনে মুখর, তাই আমাদের বুদ্ধি লরেন্স্-এর সমর্থন করুক বা না-করুক, আমাদের নিষ্ঠা নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। এমনি ক'রে অনুমোদনের অপেক্ষা না-রেখে অন্তরের তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে পারে এক কাব্য, এবং এই মন্ত্রসিদ্ধির পরিচয় লরেন্স্-এর রচনায় বারবার পাই। আজকের দিনে উক্ত প্রতিভা অত্যন্ত দুর্লভ। গল্প তো দূরের কথা, এমন-কি কবিতাও আজ বিচারপন্থী হয়ে উঠছে। অতএব ঠিক এই দুর্দ্দিনে লরেন্স্‌কে হারানো শুধু ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য নয়, তাতে সারা জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত।

* * * * * *

আমি শ্রীমতী ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর একজন ভক্ত। কিন্তু যে-কারণে লরেন্স্-এর অধিকাংশ উপাখ্যানকে আমি উপন্যাস-হিসেবে বর্দ্দাস্ত করতে পারিনা, ঠিক সেই কারণেই শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর শেষ পুস্তক "দি ওয়েভ্‌স্" আমার শ্রদ্ধা-উদ্রেকে অক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ এখানির রূপায়ণের সার্থকতা আমার বুদ্ধির অতীত। প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির এমনতর পার্থক্য শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর লেখায় আর কখনো দেখা যায়নি।

অবশ্য সুরু থেকেই শ্রীমতী উল্‌ফ্ উপন্যাস-রচনায় বিধর্ম্মী; কিন্তু তাই ব'লেই তিনি "রূপকারী বিবেকে" বঞ্চিত নন। কথকতার ধ্রুপদী প্রণালী ছিলো একটা সুনির্দ্দিষ্ট একটা পূর্ব্বকল্পিত চরিত্রকে বিভিন্ন ঘটনা-সমাবেশের সাহায্যে স্ফুটতর ক'রে তোলা। উদাহরণ-হিসেবে "ভ্যানিটি ফেয়ার্"-এর নায়িকাকে ধরা যেতে পারে। বেকি শার্প্-এর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাব নেই; কিন্তু উক্ত ঘটনাগুলি ঘটবার বহু আগেই পাঠক নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারে বেকির উপরে ওগুলির প্রতিক্রিয়া কি রকম হবে। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত হয়তো অন্যায় নয় যে দৃশ্যগুলি পাঠকের সঙ্গে নায়িকার পরিচয় নিবিড় করার জন্যে অঙ্কিত হয়নি, পরিকল্পিত হয়েছে বেকির নিকষে অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের কষে দেখবার উদ্দেশ্যে। আমাদের দিক্ থেকে, বেকি স্কুল ছাড়ার পরে তার সম্বন্ধে আর কোনো সংশয়ই থাকে না। পটভূমির সাহায্য না-নিয়ে এমনি একটা সুনিশ্চিত ছবি ফুটিয়ে তোলা অতিবড় শিল্পের পরিচায়ক। কিন্তু তাহলেও শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর চিত্রপদ্ধতিতে নেহাৎ কম প্রতিভা নেই। তাঁর শিল্প পোঁয়াতিলিস্‌ৎদের ছবির মতো। তার মধ্যে রেখার নিশ্চয়তা নেই, আংশিকভাবে দেখ্‌লে মনে হয়, তাতে বর্ণের অপচয়ও অমার্জ্জনীয়; কিন্তু শেষ বিন্দুটি যেই পটে স্বস্থান দখল ক'রে, অমনি একটা নবতর, একটা পরিপূর্ণতর সঙ্গতিতে দর্শক অবাক হয়ে যায়।

এর ফলে শ্রীমতী উল্‌ফ্ হয়তো ঔপন্যাসিক আকাদেমিতে আসন পাবেন না। কিন্তু তাহলেও বেপরোয়া তরুণদের মজলিসে মর্য্যাদায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম। আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসে শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর অপ্রতিহত প্রভাবকে তরুণিমার আতিশয্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু এটা ভুললে অন্যায় হবে যে নিছক ফাঁকির উপরে সার্ব্বভৌম গুরুগিরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মানুষ সাধারণত পরিবর্ত্তনশীল; ঘটনাকে আয়ত্তে আনা তার সাধ্যে তো কুলায় নাই, এমন-কি সমপর্য্যায়ের দুটো ঘটনার প্রতিঘাতও তার অন্তরে সমান নয়। অতএব নভেলকে যদি এই বিস্ময়ময় মনোজগতেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তবে পাত্রপাত্রীর সংকল্পনা অনমনীয় ও নির্ব্বিকল্প না-হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে তাদের

সায়ত্তশাসনে সম্মতি দেওয়াই সঙ্গত। এই মহামূল্য আবিষ্কারের জন্যে শ্রীমতী উল্‌ফ্ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং এই জন্যই আজকে তাঁর শিষ্যের এত প্রাদুর্ভাব।

বলাই বাহুল্য, অন্যান্য পন্থার মতো, এ-পন্থার পথিকরাও কিছু সকলে গন্তব্যে পৌঁছায় না। অনেকেই মাঝরাস্তায় লুটিয়ে পড়ে, কেউ কেউ, ঘন বনে পথ হারিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, অপরে হয়তো স্বর্গের এলেকায় এসেও পেটুকতার অপরাধে প্রাণে মরে; কিন্তু নরক ঘুরেই হোক, আর যেমন করেই হোক, যে শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্যে এসে থামে, তাকে অনুসরণ করায় শুধু পুণ্য নয়, প্রসাদও মিলে প্রচুর। "মিসেস্ ডালোয়ে" প'ড়ে একটা এমনি পরিতৃপ্তি পেয়েছিলুম। নায়িকা সমাপ্তির সীমায় এসে না-দাঁড়ানো পর্য্যন্ত তাকে ধর্‌তে ছুঁতে পা নি বটে, কিন্তু বই বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আমাতে যে-নিবিড় সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়েছিলো, তা কেবল তাদের মধ্যেই সম্ভব যারা জন্মাবধি পাশাপাশি মানুষ হয়ে, শেষকালে একদিন একসঙ্গে বার্দ্ধক্যের আরাম-কেদারায় গা ছড়িয়ে বস্‌তে পায়। তখন সুরু হয় বিশ্রম্ভালাপের পালা, জীবনের যে ঘটনা এক সময়ে দুরূহ লেগে ছিলো, যে-আচরণ এক সময়ে ব্যথা দিয়েছিলো, তখন সে-সব সরল, সহজ, কৌতুকপ্রদ হয়ে আসে। শুধু তাই নয়, এই যে-পরিসমাপ্তি, এটাও সার্থক হয়ে ওঠে। তখনি বুঝিএই যে-আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসা, তা ক্লান্তিজনিত নয়; দিনের অবসানই এই বিরামের কারণ, আর যাওয়ার পথ নেই ব'লেই থামা, আর বুদ্ধির অবকাশ নেই ব'লেই ক্ষান্তি।

কিন্তু এই পদ্ধতির একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ হচ্ছে এর সঙ্কীর্ণতা। চৈতন্যধারাকে আতলস্বচ্ছ রাখতে হলে, তাতে খাল কেটে বাইরের জল আনা চলেনা। উদ্বেল প্লাবন তার ঊষর উপকূলকে শুধুই কর্দ্দমাক্ত ক'রে যায়, দু পাশে উর্ব্বরতা ছড়াতে পারে না। এই প্রণালীর সাহায্যে যদি লেখককে পাঠকের সমুদ্র-সঙ্গমে ছুটতে হয়, তবে অবৈকল্য ও একনিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এ-ধরণের উপন্যাসে চারিত্র্যের বাহুল্যও যেমন ভয়াবহ, দৃশ্যের অপর্য্যাপ্তিও তদ্রূপ। কথাটাকে জয়েস্ হৃদয়াঙ্গম করেন নি ব'লেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান "য়ুলিসিস্" সিদ্ধির সীমায় পৌঁছেও, কেবল ঔৎসুক্যময় পরীক্ষাতেই আবদ্ধ থেকে গেছে; এবং এই ধ্রুবতারাকে প্রণাম ক'রে প্রুস্‌ৎ নিরুদ্দেশযাত্রায় বেরিয়েছিলেন ব'লেই পাতাল স্পর্শ ক'রেও, তিনি অবশেষে অমরাবতীতে উপনীত হয়েছেন।

"মিসেস্ ডালোয়ে" পড়ার পরে আমার বিশ্বাস জন্মেছিলো যে শ্রীমতী উল্‌ফ্ একাগ্রতার ও আবশ্যিকতা-সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু "দি ওয়েভ্‌স্" শেষ ক'রে, বুঝেছি সে-ধারণা ভ্রান্ত। শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর সকল বইয়ের মতো এখানিকেও ভাষান্তরে বর্ণনা করা অসাধ্য। তবে "দি ওয়েভ্‌স্"-এর প্রসঙ্গ মোটের উপরে হচ্ছে তিন জোড়া স্ত্রী-পুরুষের ইতিহাস। তারা বেড়ে উঠেছিলো এক-সঙ্গে, ভালোবেসে ছিলো একলোককে, এবং জীবনের মর্জ্জিতে তাদের একযাত্রার ফল সম্পূর্ণ পৃথক হলেও, তারা তাদের স্ব স্ব মণ্ডলাকার অয়নে আমরণ আটকে ছিলো কেবল পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণে। কিন্তু এই পর্য্যন্তই; এই সওয়া-তিন-শ পাতার বইখানি থেকে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো খবর সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। অথচ আত্মপ্রকাশই তাদের কাজ, কারণ এই বিরাট্ বইখানির আগাগোড়ায় কোনো ঘটনা নেই, কোনো পরিবর্ত্তন নেই, ছয়টি বাধাবিহীন স্বগতোক্তির ধারা সমান বেগে পাশাপাশি ছুটে চলেছে। এই অনিবার, অবিকার, অনন্ত বাক্যস্রোতের মধ্যে বৈচিত্র্যের একমাত্র আভাস পাওয়া যায় পাত্রপাত্রীদের পটভূমি থেকে। এই পটভূমি হচ্ছে উন্মুক্ত

সমুদ্র এবং উষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনের হ্রাসবৃদ্ধিশীল আলোক। মানবচৈতন্যের ও মানবজীবনের প্রতীক-হিসেবে পটভূমি খুবই সার্থক। কিন্তু এই অবিরাম শব্দতরঙ্গের ফলে পাঠকের মানসকর্ণে যে-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে, সেটা প্রথমত সমুদ্রগর্জ্জনের মতোই শ্রবণসুভগ হলেও, অল্প পরেই নিরর্থ অনুলাপে পরিণত হয়। বইখানিতে স্বরবৈচিত্র্যের এতই অভাব যে বক্তৃতাগুলির শিরোনামায় বক্তার উপাধি লেখা না-থাকলে, তাদের আলাদা ব'লে চেনার কোনোই উপায় থাকে না, মনে হয় সমুদ্রই তাদের যথার্থ উপমান; জলের মতো, এই চৈতন্যসিন্ধুতেও একবিন্দুর সঙ্গে আরেকবিন্দুর কোনো প্রভেদ নেই।

সমালোচনার বহর দেখে বোঝা যাবে যে পুস্তকটিকে অসুন্দর বা অপাঠ্য বলা আমার অভিপ্রেত নয়। বইখানির স্থানে স্থানে এমন বাক্যবিন্যাস, এমন বর্ণনাচাতুর্য্য, এমন অন্তর্দৃষ্টির ইসারা আছে, যা শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর শ্রেষ্ঠ রচনায় তো অনায়াসে স্থান পেতে পারেই; উপরন্তু যার সংস্পর্শে অতিবড় কবিও গৌরব বোধ করবেন। কিন্তু বইটির প্রেরণা এপিক্ নয়, লিরিক্, অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর কবিতা লেখা যেতো, কিন্তু কোনো উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচা যায় না। বিশেষ ক'রে এমন উপন্যাস যার উদ্দেশ্য মানবীয় সম্বন্ধ-বন্ধনকে বিশ্লেষণ করা। এই ধরণের উপন্যাসে বিষয়ীর চেয়ে বিষয়েরই প্রাধান্য বেশি, কর্ত্তার চেয়ে কর্ম্মই বড়, অব্যয় ছেড়ে, অন্বয়কে নির্ভুল করাই প্রথম প্রয়োজন। কারণ প্রবর্ত্তনার বিচার যদিই বা কোনো লোকোত্তর জগতে সম্ভব হয়, তবু সংসারে মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে আচরণ, কর্ম্ম। বিড়ালতপস্বী কেবল সাহিত্যে নয়, ভূভারতেও নিন্দনীয়; এবং যিনি মনে মনে চুরি করার পক্ষপাতী হয়েও, কার্য্যত পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ বিবেচনা করেন, সমাজে চিরদিন তিনি সাধু ব'লেই খ্যাত থাকবেন। সুতরাং যখন একজনকে দশের পরিবেষ্টনে দেখার দরকার হয়, তখন চুলচেরা মনোবিকলন নিতান্ত বৃথা, তখন দ্রষ্টব্য হচ্ছে তার ব্যবহার। ব্যবহারকে বাদ দিয়ে কেবল মুখের কথায় একটা মানবসমষ্টির আভ্যন্তরিক সহযোগ ব্যক্ত করা কখনো সম্ভব নয়। অবশ্য আচরণ-বর্ণনা সাবেকি পন্থা; কিন্তু গন্তব্যই যদি একমাত্র কাম্য হয়, তবে পথের প্রাচীনতায় আপত্তি করলে চলবে না; এক্ষেত্রে বরং পুরাতনেরই আদর বেশি, কেননা সেটাতেই আমরা অভ্যস্ত, দিশারীর দেখাও সেটাতেই মিলে। একথা মনে করলে খুবই অন্যায় হবে যে, পৃথিবীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিকেরা উদ্ভাবনাশক্তির অভাবেই বাঁধা পথে চলেছিলেন। নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করা টলষ্টয়ের পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন হতোনা। তবুও যে তিনি সনাতন পথে চলতে দ্বিধা করেননি, তার কারণ এই যে, আর গত্যন্তর ছিলোনা, সেই পথই ছিলো অনন্যপথ।

অবশ্য "এ রুম্ অফ্ ওয়ান্‌স্ ওন্" যিনি লিখেছেন তাঁকে এ-উপদেশ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। হয়তো ছয়টি প্রাণীর সম্বন্ধসূত্রকে আবিষ্কার করা "দি ওয়েভ্‌স্"-এর লক্ষ্যই নয়, তার লক্ষ্য ছয়টি বিভিন্ন চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় ঐক্য নির্দ্দেশ করা। কিন্তু তাও যদি হয়, তবু বইখানিকে অবশ্যম্ভাবী মনে করা শক্ত। যিনি নিছক পরস্মৈপদের সাহায্যে "দি ওয়েভ্‌স্"-এর একমাত্র জীবন্ত চরিত্র, পর্সিভ্যাল্‌কে, অমর সত্তা দিতে সমর্থ, চৈতন্যরূপ সূক্ষ্ম ব্যাপারে তাঁর এই-রকম স্থূল বক্তৃতার দরকার হয়েছিলো, এমন বিশ্বাস নিশ্চয়ই অনুচিত। শ্রীমতী ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্ এত বড় আর্টিষ্ট যে তাঁর কাছ থেকে কেবল সৌখিনি শিল্প নিতে আমরা সব সময়েই নারাজ।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়

সঞ্চয়িতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

রবীন্দ্রকাব্যের পরিসর এতই বিস্তৃত যে, তাহাকে সমগ্রভাবে জানিবার মত উৎসাহী পাঠক চিরদিনই বিরল থাকিবে। তাই কাব্যামোদীগণের জন্য পরিচায়ক চয়ন-গ্রন্থের প্রয়োজন বহু পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছে। নির্ব্বাচকের রুচি ও মতানুযায়ী বিভিন্ন ধরণের চয়নিকাও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া রবীন্দ্রকাব্য প্রচারে সহায়তা করিয়াছে। 'সঞ্চয়িতা'র বিশেষত্ব এই যে, এ-ক্ষেত্রে সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন স্বয়ং কবি। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, "এই সঙ্কলন উপলক্ষ্যে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা ক'রে একাজে হাত দিয়েচি। যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেকদিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করচি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেচে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌছায় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অত্যাচার।...সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।" তাই সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলিতেছে, একে তিনি বলেন কালাতিক্রমণ দোষ। "ঐ তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তাছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেচে।"

"যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমায় দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না।" এই "স্বীকৃত" কবিতাগুলি একত্রে সংগ্রথনের উদ্দেশ্যে কবি সঞ্চয়িতা প্রণয়নে হাত দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যের প্রভাব প্রথমাবস্থায় এমনই প্রবল ছিল যে, মানসীর "ভালোবাসা ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি যে সুখেই থাক", এই সুন্দর কবিতাটিকে নির্ম্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু মনে হয়, পরে কবি সঞ্চয়ন অপেক্ষা সঙ্কলনের দিকে বেশী ঝুকিয়া পড়িয়াছেন—বাদ দেবার চেয়ে জড়ো করার দিকেই তাঁহার আগ্রহ বেশী। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ এই সকল রচনা তাঁহার আদর্শ অনুসারে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; আর তাহাদের মধ্যে ভালো কবিতারও সংখ্যার ইয়ত্তা করা সহজ নহে। এ অবস্থায় সর্ব্বজন-সমাদৃত নির্ব্বাচনে অনেক বিপদ। কবি নিজেই স্বীকার করিতেছেন—"এরকম সঙ্কলন কখনই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচার না হয়ে যায় না।" তাছাড়া "এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছে করেচি তার অনেকগুলিই দেওয়া হোলো না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসর হ'তে হ'তে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীত মনে আত্মসংবরণ করেচি।"

এই প্রসঙ্গে আমরা কবির নিকট—বঙ্গভাষার পাঠকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে—দুটি নিবেদন জানাইতেছি। এক: তাঁহার অনুমোদিত সমস্ত সুনিশ্চিত কবিতার সুলভ সংস্করণ প্রকাশ। কারণ, কোনো চয়নিকাতেই তাঁহার বিশাল কবিপ্রতিভার সম্যক পরিচয় সম্ভব নহে। দুই: আর একখানি চয়ন-গ্রন্থের প্রণয়ন, যাহাতে থাকিবে শুদ্ধ সেই কবিতাগুলি যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়। আমরা অপত্য-

স্নেহের অপক্ষপাতিত্বে এমনই বিশ্বাসবান নহি যে মনে করিতে পারি যে কবির নিকট তাঁহার সমস্ত কবিতারই সমান দর বা সমান আদর। এইরূপ একশত কি দেড়শত কবিতার সঙ্কলন বাঙ্গালী পাঠক সমাজে মহাসমাদরে গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে কবির মনের একটি দিকের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন সঞ্চয়িতার বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথের এতগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার একত্র সমাবেশ আর কোনো সঙ্কলনে হয় নাই। কবিতাগুলি সময়ক্রমে সজ্জিত হওয়ায় কবির সৃজনী-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি মাত্র ত্রুটি, মুদ্রাঙ্কন প্রমাদ। বোধ হয় জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশের তাড়া তাহার জন্য দায়ী। আশা করা যাক, দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা বিদূরিত হইবে। আর মূল্য? সাহিত্যিক মূল্যের কথা বাদ দিয়াও স্বধু গ্রন্থের আয়তন ও শোভন সংগঠনের কথা মনে রাখিলে মূল্য সম্বন্ধে কোনো নালিশের কারণ থাকে না।

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ রায়

বাস্তবিকা—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা

বিদেশের সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে realism-এর আবহাওয়া আনতে গিয়ে তরুণ সাহিত্যিকেরা কি রকম আবর্জ্জনার সৃষ্টি করেছেন, সেই দেখিয়ে দেওয়াই এই ব্যঙ্গ-রচনার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য: একবার বসে কিন্তু বইখানি আদ্যন্ত পড়া যায় না, একঘেঁয়ে রসিকতায় মন পীড়িত হয় আর মনে হয় অপরাধের তুলনায় শাস্তি কিছু গুরুতর হ'য়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় ব্যক্তিগত কটাক্ষের আভাস পেয়ে ক্ষুণ্ণ হতে হয়। আইন বাঁচিয়ে "জবাবদিহি" দিয়েছেন বটে কিন্তু সেটাও যেন বিগ্রহগৃহের কদলীভক্ষকের সাফাই।

বইখানির ভাষার সুখ্যাতি করতেই হবে। ছাপা বাঁধাইও ভাল।

মানস সরোবর ও কৈলাস—শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও বসুমতী সাহিত্যমন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে লেখা একখানি ভ্রমণ-কাহিনী। ঐ দুর্গম তীর্থের যাত্রীদের খুবই দরকারে আসতে পারে। "রাবণ হ্রদের" বর্ণনা মনোরম কিন্তু ঐ জায়গাটুকু ছাড়া বইখানির মধ্যে আর কোথাও লেখকের সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

চৈতালী ঘূর্ণি—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখে কষ্টে, জমীদারের অত্যাচারে নাস্তানবুদ হ'য়ে, স্ত্রীর হাত ধরে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসে গোষ্ঠ শেষে এক কারখানায় কুলির কাজ নিলে। সেখানকার নিদারুণ অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে "বাবুদের" কথা শুনে কতকগুলি কুলির সঙ্গে সে ধর্ম্মঘট করলে। শেষ পর্য্যন্ত পেটের দায়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে হাতুড়ীর ঘায়ে গোষ্ঠ প্রাণ হারালে। "বাবুদের" দ্বারা Self-consciousness জাগাবার চেষ্টা, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি করা আপাততঃ "চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণীর মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী" হ'লেও লেখকের বিশ্বাস "চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণী, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।"

বইখানি দরদ দিয়ে লেখা। কুলি-বস্তির ছবি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

পাঠকগোষ্ঠী

পরিচয়-
যে গুরুতর

["পরিচয়ে" প্রকাশিত প্রবন্ধাদি-সম্বন্ধে পাঠকগোষ্ঠীর মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই এই পরিচ্ছেদের সূচনা। সমালোচনা পত্রাকারে ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।]

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু—

"পরিচয়ে"র "পাঠকগোষ্ঠী"তে "পরিচয়" সম্বন্ধে পাঠকদের মতামত প্রকাশ করিতে আহ্বান করা হইয়াছে জানিয়া দুই একটা কথা বলিতে সাহসী হইতেছি।

বাঙ্গলা উচ্চশ্রেণীর সাময়িক মাত্রেরই প্রত্নতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রবন্ধে অনেকগুলি পাতা ভরান বহুদিন হইতেই আভিজাত্যের একটা লক্ষণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহার সবগুলিতেই পদার্থ থাকে কিনা বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে তাহার বেশীর ভাগই যে অপাঠ্য আর সেগুলিতে ঠেকিলে তাঁহারা পাতা উল্টাইয়াই যান, একথা জোর করিয়াই বলা যায়। মাননীয় যোগেশচন্দ্র রায়ের "বাড়বাগ্নি" বা গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের "সত্য, রজঃ, তমঃ" জাতীয় প্রবন্ধ কদাচিৎই মিলে। সেগুলি অপাঠ্যও হয় না। কিন্তু বেশির ভাগ এ কোঠায় পড়ে কি? যাহা হউক, আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরের কথা যখন অনধিকারচর্চ্চা তখন তাঁহারা না হয় মাথায়ই থাকুন। কিন্তু অন্য পাতাগুলিতে, অন্ততঃ বোধ হয় নূতন কাগজের কাছে, বাঙ্গালী পাঠক আরও কিছু দাবী করিতে পারে। উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গলা কাগজ খাঁটি সাহিত্যে আপনার বৈশিষ্ট্য রাখিবার উচ্চাশা লইয়াই শুধু আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু "সাধনা" বা "সবুজপত্রে"র মত জোর কপাল নহিলে তাহা কিছু পূর্ণ হইবার নয়। কারণ এক একটা রবীন্দ্রনাথ কোন সাময়িকপত্রের ফরমাস বা তাগাদামত জন্মান নি। কাজেই ঐ সব উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাগজকেও অবিলম্বেই সাধারণের কোঠাতেই নামিয়া আসিতে দেখা যায়। আর সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ই বাঙ্গালী পাঠকের অদৃষ্টে জুটিতে থাকে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কাগজ যদি কেবল খাঁটি সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকারের দুরাশা ছাড়িয়া আরও নানা বিষয়ে দৃষ্টি দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাও মিটিতে পারে, পাঠকেরাও উপকৃত হয়। যেমন "পরিচয়" বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় দিবার ভার লইয়া খুবই আবশ্যকীয় কাজে হাত দিয়াছেন এবং একটা অভাব মিটাইতেছেন। এই পাঠকগোষ্ঠীও বাঙ্গলা কাগজে অনেকটা নূতন জিনিষ। তেমনি যে সব ঘটনা, সমস্যা, চিন্তা জগতের এবং আমাদেরও মনের দুয়ারে আসিয়া পড়ে, সে সকল বিষয়ের সুচিন্তিত তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ উচ্চশ্রেণীর কাগজেরই কাজ। যেমন এখন টাকার বাজার, বর্ত্তমানে পৃথিবীর আর্থিক দুরবস্থা, আমাদের দেশই বা সেজন্য কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এ সম্বন্ধে নব্যতম পরিকল্পনাই বা কি ইত্যাদি, অর্থনীতি সম্বন্ধে দক্ষ, জ্ঞাতব্যবিষয়পূর্ণ অথচ সাধারণের বোধগম্য সুলিখিত প্রবন্ধ ইহাতে থাকা উচিত। তেমনি মাঞ্চুরিয়া লইয়া চীনজাপানে কেনই বা টানাছেঁড়া চলিতেছে, সেখানকার আভ্যন্তরীন অবস্থাদি এই সময়ে জানাইতে হয়। সামাজিক, নৈতিক, যৌন ও মঙ্গলকর্ম্মাদি বিষয়ক এত যে নূতন চিন্তাদর্শ এখন আসিতেছে বাঙ্গলা উচ্চশ্রেণীর কাগজ ত প্রায় তাহা অস্পৃশ্য

স্নেহের অপক ...য়াছেন। সাপ্তাহিক এবং নিচুদরের মাসিকেই মাত্র এ সব বিষয়ের তাঁহার সমস্ত ...তি খেলোভাবে হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর মাসিকে ঘটনার ফিরিস্তিই কবিতার ...খা যায়। ইহারও আবশ্যকতা আছে; কিন্তু কেবল সংবাদ ও সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া এক একটী বিষয়ের বিশদ তথ্যও সাধারণকে জানান ও সে সম্বন্ধে শিক্ষাদান দরকার। ইহাতে কাগজের বৈচিত্র্য, চিত্তাকর্ষকত্বও অনেক বাড়িতে পারে। এবং নির্জ্জলা সাহিত্যিকতার মোহে যে সকল রদি মাল দিয়া তাঁহাদের কাগজ ভরাইতে হয় তাহার আবশ্যকতাও অন্ততঃ কমে। বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর লেখা প্রচলিত না হওয়ায় ইহার লেখকও তেমন নাই বলিয়া বোধ হয়। কয়েকটী বিশিষ্ট সাহিত্যিকের পরই বাঙ্গলা লেখকের সাধারণ স্তর অনেক নিচে পড়িয়া যায়। রূপসাহিত্যের প্রেরণা বা সেদিকে আপনাদের প্রেরণা আছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই প্রধানতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন। তা' ছাড়া অন্য চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকে এখনও ইহাতে তেমন হাত দেন নাই। নূতন ভাল কাগজগুলি যদি ইহাদের লেখায় প্রবৃত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে চিন্তাজগতের নানা বিভাগেই বাঙ্গলা সাহিত্যও পুষ্টিলাভ করিতে পায়। পাশ্চাত্য বিশিষ্ট পত্রগুলির এবিষয়ে যথেষ্টই মনোযোগ দেখা যায়। কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কোন কাজ ও চিন্তায় নিযুক্ত অনেকের মত সংগ্রহ করিয়া উহাতে প্রকাশ করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে বাদানুবাদ, আলোচনার বন্দোবস্তও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। অবশ্য অন্য শিক্ষাসাধ্য বিষয়ে পণ্ডিতলোকেরা যেমন বলিতে পারেন, সামাজিক নৈতিকাদি বিষয় যাহা মেয়েদের স্পর্শ করে, তাহাতে তাঁহাদের মতামত সুবিধার না হওয়াই সম্ভব। তবু এসব সম্বন্ধে খেলো আলোচনা ত চলিতেছেই, উঁহাদের সকলের মতামত প্রকাশ পাইলে যাঁহাদের সে বিষয়ে আগ্রহ আছে, তাঁহারা তাহার উত্তর দিতেও প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

* * * * * *

পরিচয় সম্পাদকেষু—

গত সংখ্যার পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" প্রবন্ধে রূপসাগরে গানটির যে মাত্রা বিভাগ (scansion) করেছেন তা এই :—

২	১	১	১	১	২	১	১	১	১	ইত্যাদি ।*
রূ	প্সা	গ	রে	-	ডু	ব্দি	য়ে	ছি	-	(৩৮৮ পৃষ্ঠা)

লিখেছেন :—"এম্‌নি ক'রে আগা গোড়া তিনমাত্রা জমে উঠ্‌ল।" (৩৮৯ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে এ গানটির ছন্দ কাওয়ালির ছন্দ নয়—একতালারই ছন্দ। তাঁর এ মাত্রাবিভাগটি আমি ঠিক্ বুঝতে পারি নি ব'লেই এ-প্রশ্ন করছি আপনাদের পত্র-মারফৎ মোহিতলাল, বুদ্ধদেব, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কালিদাস রায়কে। ওটি কি এই ছন্দেই পড়েন তাঁরা? না প্রকৃত চতুর্মাত্রিক্ ছন্দে (প্রবোধবাবুর ভাষায় স্বরবৃত্ত ছন্দে)? আমার সংশয়ের কারণ সংক্ষেপে এই :—

রূপসাগরেরর ছন্দ প্রাকৃত (স্বরবৃত্ত) বাংলায় এত বেশি প্রচলিত যে পড়তে গেলেই চতুর্মাত্রিক ঝোঁক মাথার মধ্যে গুণ্‌ গুণিয়ে ওঠে। অন্ততঃ আমার তো ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত—তাই অন্য ছন্দোবিদ্‌দের জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—আশা করি পরিচয়-সম্পাদক তাঁদের জবাব ছাপবেন শ্রাবণের পরিচয়ে। কারণ এ প্রশ্নটি যে গুরুতর তা' তিনি বুঝবেন—এটি একটি অত্যন্ত চেনা ছন্দ ব'লে।

রূপসাগরেকে আমি তো স্বরবৃত্ত (চতুর্মাত্রিক) ছন্দের অন্তর্ভুক্ত ক'রেই পড়ি, যথা—

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
রূপ্	সা	গ	রে	ডুব	দি	য়ে	ছি	অ	রূপ্	র	তন্	আ	শা	ক	রি
ঘা	টে	ঘা	টে	ফির্	ব	না	আর্	ভা	সিয়ে	আ	মার্	জীর্	ণ	ত	রী
স	ময়	যে	ন	হয়্	রে	এ	বার্	ঢেউ	খা	ওয়া	সব্	চু	কিয়ে	দে	বার্
সু	ধায়্	এ	বার্	ত	লিয়ে	গি	য়ে	অ	মর	হ'	য়ে	র	ব	ম	রি

ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এ নিখুঁত চতুর্মাত্রিক ছন্দকে কেন ত্রৈমাত্রিক ক'রে টেনে টেনে পড়েন বুঝতে পারলাম না। বহু কবির এ ছন্দে লেখা মাত্রাবিভাগ চতুর্মাত্রিক মনে করার গুরুতর কারণ আছে। কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত এই—

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	
প্র	সাদ্	ব	লে	ভ	বার্	ণ	বে	ব	সে	আ	ছি	ভা	সিয়ে	ভে	লা	†
মার্	কি	ছু	নাই	শ্যা	মা	তো	মার্	কে	বল্	দু	টি	চ	রণ্	রা	ঙা	‡

গভীর রাত্রী— সহযাত্রী— কোথা তারা?—কেহ নাই—
শ্রান্তপদে অন্ধকারে একা বাড়ি ফিরে যাই— } দ্বিজেন্দ্রলাল (ত্রিবেণী)

তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
কুলজনমে;—ছিলাম যখন পাপড়ি ঘেরা সিংহাসনে } সত্যেন্দ্রনাথ (কুহু ও কেকা)

এ সব ক্ষেত্রেই যে রচয়িতারা চতুর্মাত্রিক ছন্দের ঝোঁকেই লাইনগুলি লিখেছিলেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট নয় কি? এবং এ কয় ছন্দের সঙ্গে "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি"-র জাতির ভেদ আছে কি? কথা উঠ্‌তে পারে

১	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	
প্র	সা	দ	ব	লে	-	ভ	বা	র	ণ	বে	-	প্রভৃতি এভাবে টেনে

টেনে ত্রৈমাত্রিক ক'রেও পড়া যায়, কিন্তু এভাবে টেনে টেনে পড়বার ছন্দ তো এরা নয়। বিশেষ দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ যে এ ছন্দকে চতুর্মাত্রিক মনে করতেন তা তাঁদের লাইনকটির কমা সেমিকোলন ও ড্যাশ রূপ যতিচিহ্নেই প্রতীয়মান হয় না কি?

* মাত্রা বিভাগে আমি যুক্তাক্ষরের আগের অক্ষরে দুমাত্রা ধ'রেছি—যুক্তাক্ষরকে না দিয়ে। কারণ আমার মনে হয়, সেই রকমই বেশি স্বচ্ছ। সচরাচর যুক্তাক্ষরকেই দুই মাত্রা ধরা হয়, কিন্তু আসলে যুক্তাক্ষরের আগের স্বরবর্ণই প্লুত ক'রে পড়ি আমরা স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত তথা সংস্কৃত ছন্দে।

† রামপ্রসাদ ‡ কমলাকান্ত

তাছাড়া এ ছন্দকে বিকল্পেও ত্রৈমাত্রিক করা চলে কি? রবীন্দ্রনাথের নিজেরি কবিত
উদ্ধৃত করি (ক্ষণিকা)—

পর জন্ম | সত্য হ'লে | কি ঘটে মোর | সে টা জানি
আবার আমায় | টান্‌বে ধ'রে | বাং লা দেশের | এ রাজ ধানী।
গন্থ পন্থ | লিখ্‌তু ফেঁদে | ইত্যাদি।

এখানেও কি রবীন্দ্রনাথ—

১ ১ ১ | ২ ১ | ২ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১ | ১ ১ ১
প র - | জ ন্ম | স ত্য | হ' লে - | কি ঘ টে | মো র - | সে টা - | জা নি -

এইভাবে পড়বার পক্ষপাতী? যদি বা বলেন এ ছন্দ একটু আলাদা, কি
এই কবিতারই আর একটা লাইন নিন—

কলম ক'সে | ব'সে ব'সে | প্রতি বাদের | প্রতি বচন
আমায় হয়ত | করতে হবে | আমার লেখা | সমা লোচন
আরো যেসব | লিখ্‌ব কথা | ভাব্‌তে মনে | বাজ্‌ছে ব্যথা

এসব অত্যন্ত স্পষ্ট চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্ত নয় কি? ("ভাব্‌তে মনে বাজ্
ব্যথা"-র যুক্তাক্ষর সংস্থান ঠিক্ "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি"'র মতন)।

ছন্দোবিৎদের মত জানার ইচ্ছা। কবি যদি নিজে সংশয় ভঞ্জন করতে অবতী
হ'ন তবে তো কথাই নেই—তবে এ প্রশ্ন তাঁকে ক'রে জবাব পাইনি বলেই 'পরিচয়ের
সম্পাদকের শরণাপন্ন হ'লাম। কারণ কবি যদি সত্যিই এ ছন্দটাকে এভাবে পড়ে
তবে সেটাও আমাদের জানা ভাল বই কি।

ইতি—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

ত্রৈমাসিকে স্থানাভাব সনাতন; পরন্তু তিনমাস অপেক্ষার ফলে তর্কের সূত্র হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেই সূত্রে দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের অনুরোধমতো বাঙালী কবিদের এ-আলোচনায় নিমন্ত্রণ করতে পারলুমনা—পঃ সঃ।

প্রকাশক শ্রীজগবন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
দি মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগবন্ধু দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।